ধর্ম্মসাধনার মধুচক্র

সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাধনাশ্রম
২১০।৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা

সাধনাশ্রম হীরকজয়ন্তী গ্রন্থমালা

সাধনাশ্রমে নিবেদিত উপদেশাবলী

মাঘ ১৩৫৯

মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক শ্রীননীভূষণ দাসগুপ্ত
২১১।৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

ব্রাহ্মসমাজ ও সাধনাশ্রম

ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মভাবের ম্লানতা অনুভব করে ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য কর্ম্মীর অভাব দেখে ১৮৯২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে সাধনাশ্রম স্থাপন করেন। এই আশ্রম নানা প্রণালীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বলবৃদ্ধি করেছেন। সাধনাশ্রম ইহার কর্ম্মক্ষেত্রকে অনেক প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন, অনেকগুলি স্থায়ী ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন, অনেকগুলি বিশ্বাসী ও উৎসাহী মানুষকে ইহার প্রচারক ও সেবকরূপে ইহার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ করেছেন।

কিন্তু সাধনাশ্রমের উদ্দেশ্য কেবল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্য এবং অন্যান্য কার্য্যকে বলশালী করা নয়। ইহা ব্রাহ্মসমাজে কেন আছে ও কেন থাকবে, ইহার উদ্দেশ্য কি, তা' শাস্ত্রী মহাশয় নানা ভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তথাপি ব্রাহ্মসমাজের নিকটে সাধনাশ্রমের বিশেষ ভাবটি নিবেদন করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের নব শতাব্দীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেকটি অঙ্গের পক্ষে নিজ ভবিষ্যৎ লক্ষ্যকে আবার ভাল ক'রে উপলব্ধি করা প্রয়োজন হয়েছে।

রান্নাঘর

শাস্ত্রী মহাশয় অনেকগুলি তুলনার সাহায্যে সাধনাশ্রমের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চেষ্টা করতেন। তাঁর একটি তুলনা এই ছিল যে, সাধনাশ্রম হবে ব্রাহ্মসমাজের রান্নাঘর। ব্রাহ্মসমাজ দয়াময়ী বিশ্বজননীর দয়ার অন্ন,

প্রেমের অন্ন সংসারের দুঃখী তাপীকে পরিবেশন করবেন। সেই দয়ার অন্ন, প্রেমের অন্ন প্রস্তুত হবে কোথায়? সকল বাড়ীতেই দেখা যায় যে, রান্না করবার জন্য আলাদা একখানি ঘর থাকে। কর্ম্মালয় ও রন্ধনালয় কেহ এক করে না। যেখান দিয়ে লোকজন সর্ব্বদা যাতায়াত করে, যেখানে কাজকর্ম্ম করে, যেখানে নানা কোলাহল বিশৃঙ্খলা ও ধূলি,—সেখান থেকে কিছু আড়ালে রান্নাঘর নির্ম্মাণ করে। জুতা নিয়ে সহজে সেই ঘরে কেহ প্রবেশ করে না। যে-বাড়ীতে রান্নাঘর নাই, সে বাড়ী বাড়ীই নয়। ধর্ম্মসমাজেও তেমনি রান্নাঘরের প্রয়োজন হয়। ধর্ম্মসমাজের নানা কর্ম্মোদ্যোগ এবং তা' হ'তে উত্থিত নানা তর্কবিতর্ক, উত্তাপ ও কোলাহল, এ সকল থেকে কিছু পরিমাণে নির্লিপ্ত এমন একটি স্থান থাকা দরকার হয়, যেখানকার হাওয়াতে কেবল দয়ালের নাম, কেবল দয়ালের দয়ার প্রসঙ্গ ও সাধুভক্তদের চরিত্রের প্রসঙ্গ, কেবল মানুষের ধর্ম্মজীবনের ব্যাকুলতা,—এই সকল সঞ্চিত ও ঘনীভূত হবে। কেহ যখন কাহাকেও খাওয়াতে বসায়, সে কত সাবধান হয় যেন ভোজনকারীর খাদ্যে একটুও ধূলা না পড়ে। ব্রাহ্মসমাজ দেশবাসীকে আত্মার অন্ন পরিবেশন করবেন। সে কাজে যাতে দয়ালের দয়ার অমৃতের সঙ্গে, সাধুভক্তদের চরিত্রের ও ভক্তির অমৃতের সঙ্গে আমাদের কর্ম্মোদ্যোগ হতে ধূলি একটুও মিশতে না পায়, তার জন্য একটা স্বতন্ত্র রান্নাঘর থাকা দরকার। সাধনাশ্রমকে শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সেই রান্নাঘর বলতেন।

কিন্তু আমরা এই রান্নাঘরের কাজের কত যে অযোগ্য, তা' মনে করে মন ক্লেশে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কত বাড়ীতে দেখা যায় রাঁধবার আলাদা লোক থাকে না। বাসন মাজবার চাকরকে দিয়েই রান্নার কাজ কোন রকমে চালিয়ে নেওয়া হয়। হয়তো তার হাতে সব

জিনিস বিস্বাদ হয়ে যায়। আমাদের হাতেও মায়ের দয়ার অন্ন, প্রেমের অন্ন ঠিক রান্না হচ্ছে না। আমরা ঐ কাজের যোগ্য নই, ওর চেয়ে নীচু কাজেরই যোগ্য।

অগ্নিকুণ্ড

তারপর, ব্রাহ্মসমাজ যে একটি আধ্যাত্মিক সাধকমণ্ডলী, এই সত্যটিকে প্রকাশ করবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় বলতেন, ব্রাহ্মসমাজে একটি অগ্নিকুণ্ড থাকা চাই, আর সাধনাশ্রম হবে ব্রাহ্মসমাজের সেই অগ্নিকুণ্ড। য়ুরোপ প্রভৃতি শীতের দেশে চারিদিকে যখন তুষার পড়ে, তখন যেখানে আগুন থাকে মানুষ সেখানেই ছুটে যায়। আগুনের চারিদিকে সকলে ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘিরে বসে। তেমনি জনসমাজে যখন ধর্ম্মাগ্নির তাপ নাই, যখন সাংসারিকতার শীতল বায়ু চারিদিকে প্রবাহিত, তখন এমন একটি স্থান থাকা দরকার হয় যেখানে গিয়ে মানুষ তপ্ত হবে, ধর্ম্মাগ্নি যাঁদের মধ্যে আছে এমন ব্যাকুলাত্মাদের সংস্পর্শ পাবে এবং ঈশ্বরকে নিয়ে ঘনিষ্ঠ দল হয়ে বসবার পবিত্র আস্বাদনটি লাভ করবে। শাস্ত্রী মহাশয় বলতেন, সাধনাশ্রম হবে ব্রাহ্মসমাজের সেই অগ্নিকুণ্ড।

মধুচক্র

ব্রাহ্মসমাজ যে একটি ধর্ম্মসাধকমণ্ডলী, এ সত্যটিকে প্রকাশ করবার জন্য আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা যায়। সাধনাশ্রমকে বলা যায়, ব্রাহ্মসমাজের মধুচক্র। প্রজাপতিও মধু খায়, মৌমাছিও মধু খায়। কিন্তু প্রজাপতিদের মধ্যে দলবদ্ধ জীবন নাই এবং তাদের একটা মধু সঞ্চয় ও প্রস্তুত করবার স্থান থাকে না। প্রজাপতিরা দেখতে সুন্দর। তারা

উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে মধু খেয়ে বেড়ায়, কিন্তু চাক বাঁধে না। ধৰ্ম্মজীবনের দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায়, ব্রাহ্মসমাজটা প্রজাপতির সমাজ হওয়া উচিত নয়, মৌমাছিদের সমাজই হওয়া উচিত। ধৰ্ম্মরাজ্যে, তত্ত্বরাজ্যে, সাধনরাজ্যে কত দেশে দেশে, কত কালে কালে কত ফুল ফুটেছে, ফুটচে, ভবিষ্যতেও ফুটবে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও ভক্তিশাস্ত্র, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও শিখধৰ্ম্ম, নানা আকারের ভক্তিধৰ্ম্ম,—ভারতের এই সকল ধৰ্ম্মান্দোলন এবং ভারতের বাহিরে পারসীক, ইহুদী, খ্রীষ্টিয় ও মহম্মদীয় প্রভৃতি নানা ধৰ্ম্মবিধান,—এ সকলই যেন ঈশ্বরের উদ্যানে প্রস্ফুটিত নানা জাতির ফুল। সে সকল ফুলে কত সৌন্দর্য্য, কত মধু! কত ভাবুক, কত কবি, কত পণ্ডিত, কত জ্ঞানী তাদের মধ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্চেন। সে ফুলের দৃশ্য আর সে প্রজাপতি ওড়ার দৃশ্য দেখলেও মন মুগ্ধ হয়। কিন্তু ব্রাহ্ম শুধু ফুলের রস চেখে চেখে উড়ে বেড়াবেন না। ব্রাহ্মসমাজ হবে এমন এক মধুচক্র, যাতে পূৰ্ব্ব ও পশ্চিমের, অতীত ও বৰ্ত্তমানের সব ফুল হতেই বিন্দু বিন্দু রস এনে সঞ্চিত করা হবে। আবার, সে রস এখানে শুধু সঞ্চিতই হবে না, কিন্তু মধুচক্রে যেমন ফুলের রস ক্রমশঃ মধুতে পরিণত হয়, তেমনি ধৰ্ম্মরাজ্যের সকল ফুলের রস এখানে সুমধুর ব্রাহ্মধৰ্ম্মে ও মধুময় ব্রাহ্ম-জীবনে পরিণত হবে। তার মধ্যে যদি কিছু অম্ল, তিক্ত, কটু, কষায় রস থাকে, তা' ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়ে মধুময় ব্রাহ্মধৰ্ম্মরসে পরিণত হবে। ধৰ্ম্মজগতের যে-কোন ধৰ্ম্মের মধ্যে যে-কোন ফুল ফুটেছে, সকলের রস এখানে নিয়ে আসতে হবে। কোনটির রস না নিয়ে আসা, কোনটির রস আপনাতে সঞ্চয় না করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে নিষিদ্ধ। শুধু অতীত হতে নয়, বৰ্ত্তমান হতেও রস সংগ্রহ করতে হবে;

শুধু ধর্ম্মজগৎ হতে নয়, মানুষের সকল মহান্ প্রয়াস হতেই রস সংগ্রহ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নববিধানী ভাইয়ের সাধনা থেকে আমরা বঞ্চিত হব কেন? বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের ও আর্য্যসমাজের সাধনা হতে আমরা বঞ্চিত হব কেন? বাহাই ধর্ম্মের সাধনা হতে আমরা বঞ্চিত হব কেন? আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-মন্দিরে ও কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে ও 'বৃহত্তর ভারত-পরিষদে' যে উন্নত অনুপ্রাণনসকল রয়েছে, তা হতেই বা আমরা বঞ্চিত হব কেন?—সবই এখানে সঞ্চয় করতে হবে এবং সব বস্তুকেই মধুময় ব্রাহ্মধর্ম্মে ও ব্রাহ্মজীবনে পরিণত করতে হবে। যেমন মধু সঞ্চয় করে ব'লে ও প্রস্তুত করে ব'লে পতঙ্গরাজ্যে মৌমাছির জাত আলাদা, ধাত্ আলাদা, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যে ব্রাহ্মের জাত আলাদা, ধাত্ আলাদা; কারণ, ব্রাহ্মেরা সব সঞ্চয় ক'রে আনে, আবার সাধনার দ্বারা সব বস্তুকে মধুময় ধর্ম্মজীবনে পরিণত করে। এ কাজের জন্য ব্রাহ্মসমাজে একটা মধুচক্র থাকা প্রয়োজন। যাতে ব্রাহ্মসমাজ শুধু ভাবুকের, কবির, জ্ঞানীর, পণ্ডিতের সমাজমাত্র না হয়, সাধকের সমাজ হয়, এবং যাতে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মজীবন-রস হতে জগতের কোনও শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, প্রয়াস, চিন্তা, বা ভাব বাদ পড়ে না যায় তার জন্য এতে একটা মধুচক্র চাই-ই চাই। সাধনাশ্রম হবে ব্রাহ্মসমাজের সেই মধুচক্র।

আমরা প্রজাপতি হব না। লোকে দেখুক, জানুক, এ ইচ্ছা আমরা করব না। পরিশ্রমী মধুমক্ষিকার মত নীরবে, লোকচক্ষুর প্রায় অগোচরে থেকে ব্রাহ্মসমাজের কাজেও খেটে যাব, আর, আমাদের নিজ নিজ জীবনে আমাদের চক্রটিতে মধু সঞ্চয় ও মধু প্রস্তুত করে যাব, এই আমাদের আদর্শ হোক।

মণ্ডলীত্ব

অগ্নিকুণ্ড ও মধুচক্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মসমাজে দল বাঁধবার, জোট বাঁধবার একটি বিশেষ ধারা আমরা দেখতে চাই। প্রত্যেক crystal-এর দানা বাঁধবার একটি বিশেষ ধারা আছে। প্রত্যেক element-এর নিজের পরমাণুর সঙ্গে এবং অন্যান্য element-এর পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হবার একটি বিশেষ ধারা আছে; তাই দিয়েই সেই elementকে চেনা যায়। ভারতের খনিতে কিংবা ব্রাজিলের খনিতে, যেখানেই থাকুক, এই লক্ষণ দিয়ে সোনাকে সোনা বলে চেনা যায়। তেমনি মানুষও মানুষের সঙ্গে নানা ভাবে দল বাঁধে। দলবদ্ধ হয়ে তারা ক্লাব, আমোদগোষ্ঠী, পাঠগোষ্ঠী সৃষ্টি করে, এবং আর্ত্তসেবা, রাজনীতি, সমাজসংস্কার প্রভৃতি কত কি কাজ করে। ব্রাহ্মরাও এ সকল ভাবে মিলিত হয়, দল বাঁধে। এ সকল বিষয়ে সংসারের আর সব লোক যেমন, ব্রাহ্মও তেমনই। কিন্তু ব্রাহ্মদের মধ্যে দল বাঁধবার এ সকল সাধারণ মানবীয় ধারার অতিরিক্ত আর একটি বিশেষ ধারা থাকা উচিত। তা এই যে, এরা ধর্ম্মসাধনমণ্ডলীর ভাবে মিলিত না হয়ে থাকতে পারে না; যেখানে তিনটি ব্রাহ্ম, সেখানেই তারা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করতে, দয়ালের নাম গান করতে জোট বাঁধে। ব্রাহ্মরা অন্য অনেক রকমে জোট বাঁধে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম নিয়ে জোট বাঁধাটাই এদের বিশেষত্ব, ধর্ম্ম নিয়ে জোট বাঁধতেই এরা সব চেয়ে বেশী ভালবাসে। ব্রাহ্মদের crystallization-এর এই ধারা হওয়া উচিত; ব্রাহ্মের chemical characteristic এইরূপ হওয়া উচিত যেন তিনটী ব্রাহ্ম একত্র হলেই automatically সেখানে একটি ধর্ম্মমণ্ডলী হয়।

ব্রাহ্মসমাজকে যদি এ দেশে ধর্ম্মসমাজরূপে জীবিত থাকতে হয়, তবে প্রতি ব্রাহ্মের স্বভাবের অণু পরমাণুতে এই ধারাটি সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক; নতুবা তাহা অসম্ভব। যদি দেখা যায় যে, ব্রাহ্মরা যে-যে সহরে যায়, সেখানে গিয়ে তারা সৃষ্টি করে শুধু আমোদের দল, কি শিল্প-সাহিত্যের দল, কি সমাজ-সংস্কারের দল, কি অন্য অন্য কাজের দল, অর্থাৎ ধর্ম্মের দল ছাড়া আর যে-কোনও রকমের দল,—যদি দেখা যায় যে, ব্রাহ্মরা ধর্ম্ম নিয়ে ঘনিষ্ঠ মণ্ডলী হচ্ছে না, ব্রাহ্মদের স্বভাবের অণু পরমাণুতে এই আধ্যাত্মিক মণ্ডলীত্বের ভাবটি সঞ্চারিত হচ্ছে না, তবে বলি, প্রচারকেরা গিয়ে সেই সহরে ব্রাহ্মসমাজের কথা যতই প্রচার করে আসুন তাতে কিছু ফল হবে না। সে নিষ্ফল অভিনয় ব্রাহ্মসমাজকে ঠেকা দিয়ে রাখতে পারবে না। হয় ব্রাহ্মসমাজকে ধর্ম্মমণ্ডলীরূপে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, নয়, ব্রাহ্মসমাজের আশা ছেড়ে দিতে হবে। যদি মনে হয় যে, দেশের সামনে ব্রাহ্মসমাজকে সমাজ-সংস্কারের, কি জন-সেবার, কি স্বাধীনতা-প্রচারের একটি প্রবল উদ্যোগরূপে দণ্ডায়মান করে রাখলেই ইহা তেজস্বী জীবনে জীবিত থাকবে, তবে ভুল হবে; এমন কি, যদি ব্রাহ্মসমাজকে উদার ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম প্রচার করবার একটা উদ্যোগরূপে দণ্ডায়মান রাখা যায়, তাতেও ব্রাহ্মসমাজ জীবিত থাকবে না। এ সকলের কোনটিই ব্রাহ্মসমাজের আসল কাজ নয়; কোনটিই এর আসল লক্ষণ নয়। হয় ধর্ম্মমণ্ডলীরূপে জীবিত থাকা, নয় মৃত্যু; এর আর মধ্যপথ নাই। ব্রাহ্মসমাজে এই ধর্ম্মমণ্ডলীত্বের লক্ষণটি বাঁচিয়ে রাখবার জন্য নানারূপ সতেজ আয়োজন থাকা দরকার। সাধনাশ্রম তার একটু আয়োজন।

কৃষিক্ষেত্র

তার পরে, ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মব্যবস্থার ও কর্ম্মী প্রস্তুত করবার আয়োজনের কথা ভাবা যাক। অনেকে বলেন, 'ব্রাহ্মসমাজে কর্ম্মী প্রস্তুত করা হচ্চে না, কর্ম্মী প্রস্তুত করবার একটা ভাল কারখানা চাই।' কারখানার তুলনাটি ঠিক নয়। ব্রাহ্মসমাজের যা প্রয়োজন, তাকে কারখানার সঙ্গে নয়, বরং কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বর্ত্তমান যুগে, কর্ম্ম এবং কর্ম্মব্যবস্থা (organisation),—এই দুই বস্তু জনসাধারণের মনকে বড় বেশী পরিমাণে অধিকার করে রয়েছে। মানুষ যে এ সকলের চেয়ে বড় এবং জীবন ও চরিত্রই যে কল্যাণের ও কল্যাণ-কর্ম্মের মূল উৎস, অনেক সময়ই লোকে তা ভুলে যাচ্চে। কোন এক দেশে এক বছরের ফসল কাটা হয়ে গেল। সেই শস্য হাজার লোকের হাত দিয়ে বেচা হল, কেনা হল। তা নিয়ে নানা দোকান বাজার বসে গেল। ধান-ছাঁটা, গম-পেষা, নানা কল-কারখানার সৃষ্টি হল। রেল, ষ্টীমার, নৌকাতে ঐ শস্য নানা দিকে চল্‌ল। এই দোকান-পাট, কল-কারখানা, রেল-ষ্টীমার দেখ্‌তে মস্ত ব্যাপার। কিন্তু মূলে তো সেই ফসল। সেই ফসল প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয় কি করে? এক বছরের ফসল থেকে তো আর-এক বছরের ফসল সৃষ্টি হতে পারে না। তার জন্য চাই জমির ভাল রকম উর্ব্বরতা, চাই জমির ভাল রকম চাষ। তেম্‌নি, এক যুগের তেজস্বী কর্ম্ম হতেই অন্য যুগের তেজস্বী কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। অন্য সকল ব্যাপারে যাই হোক, ধর্ম্মসমাজের সম্বন্ধে এই কথা সত্য যে, কর্ম্মী হতে কর্ম্মী প্রসূত হয় না, কর্ম্ম হতে কর্ম্ম প্রসূত হয় না। জীবন হতেই কর্ম্মীর জন্ম হয়, জীবন হতেই কর্ম্মের জন্ম হয়। ধর্ম্মসমাজের মানুষগুলির মধ্যে সারবান চরিত্র

ও ধর্ম্মজীবন হল জমি ; এক এক যুগের তেজস্বী কর্ম্ম হল তার ফসল। সহরের লোকেরা জমি ও তার চাষের ব্যাপারটি চোখে দেখে না, অনেক সময়ে তাকে মনেও রাখে না। কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, এ বৎসরে দোকানগুলি কেন শূন্য ? বাণিজ্য-তরীগুলি কেন চল্‌চে না ? কল কেন ঘুরচে না ? তবে তার উত্তর দিতে হয় যে, জমিতে উৎপাদিকা-শক্তি নাই। তেমনি ব্রাহ্মসমাজে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "এখানে "তেজস্বী কর্ম্মী কেন নাই ? তেজস্বী কর্ম্মপ্রবাহ কেন নাই ?" উত্তর,—জমিতে সার নাই। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের জমিতে সার দেওয়া প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজে এত মানুষ, এতগুলি গৃহ, এতগুলি পরিবার। কোন্ গৃহ হতে ভগবানের ভবিষ্যৎ তেজস্বী সেবক আবির্ভূত হবেন, কে জানে ? সব পরিবারেই সেই সার সঞ্চার করতে হবে, যেন ব্রাহ্মসমাজ-জমি হতে আগামী যুগে আবার সোনার ফসল উৎপন্ন হতে পারে।

'কাজ' 'কাজ' করলেই ব্রাহ্মসমাজের কাজ অগ্রসর হবে না। কাজের ভাল ব্যবস্থা (organisation) করলেও ব্রাহ্মসমাজের কাজ অগ্রসর হবে না। ব্রাহ্মসমাজে কাজের মানুষ আমরা কি দেখে নির্ব্বাচন করব ? ব্রাহ্মসমাজের কাজে আমরা কি-রকম মানুষকে চাইব ? বক্তৃতায়, প্রচারে, প্রতিবাদীর মতখণ্ডনে, বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায়, নানা কাজের ব্যবস্থাবিধানে (organisationএ) পরিপক্ক মানুষ অন্বেষণ করব ? না, মানুষটা কেমন, তার personalityটা কেমন, তাই দেখব ? তাকে মানুষের মধ্যে রাখলে সে অপরের মধ্যে কি-রকম ভাব, কি-রকম প্রভাব বিস্তার করে, তার চরিত্র হতে জীবন হতে আচরণ হতে ব্যবহার হতে আর-সকলে কি পায়, তাই দেখব ? এই শেষোক্ত বস্তুটিই হল personality। কিন্তু এ বস্তুটি ধীরে ধীরে জন্মে। কৃষিক্ষেত্রে সব কাজ কত ধীরে ধীরে হয় ! তেমনি, মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে ধীরে ও

নিঃশব্দে ; মানুষের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ মধুর ও তেজস্বী personality ফুটে ওঠে ধীরে ও নিঃশব্দে। বিধাতার এই ধীর, নিঃশব্দ, অদৃশ্য, নিগূঢ় প্রণালীতে বিশ্বাস ক'রে, ইহারই উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর রেখে, মণ্ডলীতে-মণ্ডলীতে ও পরিবারে-পরিবারে মানব-জমিন্ চাষ করা চাই। মহৎ আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত আত্মোৎসর্গশীল মহাপ্রাণ মানুষ প্রস্তুত করা চাই। মানুষই যেখানে শুষ্ক, শীর্ণ, ক্ষুদ্র, সেখানে কাজ তেজস্বী কি-করে হবে? আগে মানুষ তৈরী করবার কৃষিক্ষেত্র, তার পরে কর্ম্মকেন্দ্র। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে একটি মানুষ তৈরী করবার বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে। তার জন্য বহু আয়োজন চাই। সাধনাশ্রম এ কাজের একটি ক্ষুদ্র আয়োজন।

রাজার দাবী, না কাঙ্গালের ভিক্ষা ?

ব্রাহ্মসমাজে একটি বিশেষ বড় প্রশ্ন এই যে, এখানে ধর্ম্মের দাবী, ধর্ম্মের আহ্বান অনুকূল কর্ণে গিয়ে পড়ে, না, বধির কর্ণে গিয়ে পড়ে? এখানে ধর্ম্ম ও সংসার, এ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধটি কিরূপ? ব্রাহ্মসমাজে আমরা বিশ্বাস করি না যে, ধর্ম্ম ও সংসারের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন, অথবা উভয়ের মধ্যে কোনও মৌলিক বিরোধ আছে। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কে প্রভু ও কে ভৃত্য, কে রাজা ও কে প্রজা, কার উপরে কার দাবী, প্রভুত্ব ও জোর খাটবে, কে কার কাছে যোড়-হাতে থাকবে,—ধর্ম্ম-সমাজে এ সকল প্রশ্নের কেবল এক প্রকার উত্তর সম্ভব। ধর্ম্মই সংসারের উপরে রাজা ও প্রভু এবং সংসারের উপরে ধর্ম্মের দাবী, ধর্ম্মের ক্ষমতা ও ধর্ম্মের অধিকার অতি স্পষ্ট ভাবে ঘোষিত ও স্বীকৃত হয়,—এ লক্ষণ যে-মানুষের দলে নাই, সেরূপ একটি দল আর যা কিছু হোক, তা ধর্ম্মসমাজ কখনও নয়। রাজার রাজত্ব ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি

সে-রাজ্যের লোকেরা তাদের ধন ও জনের উপরে রাজার দাবী স্বীকার না করে, যদি রাজা লড়বার জন্য সৈনিক না পান, রাজ্য চালাবার জন্য রাজস্ব না পান। প্রত্যেক রাজ্যে রাজার দাবীটা ঘোষণা করবার ও আদায় করবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি আয়োজন থাকে। ধর্ম্মেরও তেমনি অশেষ দাবী আছে মানব-সমাজের উপরে। মানব-সমাজ সেই দাবী না মানলে, তার বাধ্যতা স্বীকার না করলে, সংসারে ধর্ম্মের রাজত্ব বজায় থাকে না। সেই রাজরাজেশ্বরের নাম নিয়ে ধর্ম্ম মানবসমাজে এসে এই দাবী করেন, "আমার কাজে তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে দিতে হবে। Give me your best, ablest, noblest, sweetest, deepest men and women. তোমার মানুষগুলির মধ্যে যারা সব চেয়ে প্রতিভাবান, সব চেয়ে শক্তিমান, সব চেয়ে উদারমনা, সব চেয়ে মধুর স্বভাব, সব চেয়ে গভীরপ্রকৃতিসম্পন্ন, তাদের আমি আমার জন্য চাই। এটা আমার **ভিক্ষা** নয়, এটা আমার **দাবী**।" কেন ব্রাহ্ম-সমাজ ধর্ম্মের এ দাবীটা আজও প্রবল কণ্ঠে তার সংসারী মানুষদের কাছে বলতে পারচেন না? ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম আজও কেন সংসারের কাছে ভিক্ষুকের বেশে দাঁড়িয়ে আছেন? ব্রাহ্মসমাজ তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে ধর্ম্মের কাজে দিতে কি বাধ্য নন, দায়ী নন? ব্রাহ্মসমাজ তার তৃতীয় শ্রেণীর মানুষগুলিকে ধর্ম্মের কাজে অবতীর্ণ করবেন, ও অনুগ্রহ করে তাদের কোন রকমে তনু রক্ষার আয়োজন করবেন, এই কি ধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের মনের ভাব (attitude) হওয়া উচিত? শাস্ত্রী মহাশয় এক সময়ে সাধনাশ্রমের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের কাছে ধর্ম্মের এই দাবীটি তেজের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন। নব শতাব্দীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, বল ব্রাহ্মসমাজ, তোমার ধর্ম্মকে কি সংসারের দ্বারে ভিক্ষুকের বেশে ও দীনসাজেই চিরকাল দণ্ডায়মান রাখবে?

ব্রাহ্মসমাজে সাহসপূর্ণ কর্ম্মকল্পনা নাই কেন ?—বৃহৎ কর্ম্মোদ্যোগ নাই কেন ?—সকল সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ধর্ম্মটাই যে তাদের রাজা, তাদের প্রভু! তাদের ধর্ম্মই সব গৃহীদের, চাকুরে কি ডাক্তার কি উকীল কি বণিক, যে কেহ হোক, সকলেরই তন্ মন্ ধনের মালিক। তারা জানে ধর্ম্মের কাজের জন্য যে দাবী আসবে, তা দিতেই হবে। ধর্ম্মের কাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে নামাতেই হবে। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ নিজ ব্যবসা বাণিজ্যের চেয়েও অধিক আর্থিক সচ্ছলতার অবস্থায় রাখতেই হবে। তাদের মধ্যে ধর্ম্মের কাছে সংসার যোড়-হাতে দণ্ডায়মান। টাকা খসাবার জন্য বা খেটে দেবার জন্য কোন আহ্বান ধর্ম্মের দিক থেকে এলে তাঁরা তাতে নিজেদের ধন্য বলে অনুভব করে। তাদের কাছে ধার্ম্মিক জনের প্রসন্নতা লাভ সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের চেয়েও বেশী মূল্যবান।—আর, ব্রাহ্মের কাছে তার ধর্ম্মটা তার পায়ের তলার অনুগ্রহপ্রার্থী ভিখারীর মত। দয়া করে এক টাকা চাঁদা দিই, তাই ঢের, এই যেন ব্রাহ্মের ভাব। ছি ছি! ধিক্ ধিক্! ধর্ম্মের সংশ্রবে 'চাঁদা' কথাটি উচ্চারিত হতে শুনলেও মন গ্লানিতে পূর্ণ হয়। 'চাঁদা' আবার কি কথা? ধর্ম্মকে কি তোমার দ্বারে উপস্থিত দয়ার পাত্র ভিখারীর মতন মনে কর, যে, ধর্ম্মের সংশ্রবে 'চাঁদা' কথাটির উল্লেখ কর? তোমার সর্ব্বস্বের উপরে যার অধিকার, তাকে তুমি 'ভিক্ষা' বা 'চাঁদা' দেবার স্পর্দ্ধা কর? যেখানে অধিকাংশ মানুষের মনের ভাব এইরূপ, ধর্ম্ম যেখানে সংসারের দ্বারে হাত যোড় করে ভয়ভীত মুষ্টিভিক্ষার কাঙ্গালের মত দাঁড়িয়ে থাকেন, সে সম্প্রদায়ের কর্ম্মকল্পনায় সাহসই বা কোথা হতে আসবে, কর্ম্মোদ্যোগ বৃহৎই বা কি করে হবে? হে ব্রাহ্ম, তুমি কি চাও যে আগামী যুগে ব্রাহ্মসমাজের কাজ বিশাল ও তেজস্বী হোক? তবে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম হতে এই ভিক্ষুকের অবস্থাটি

ঘুচাও। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মকে রাজার সম্মান, রাজার অধিকার দাও। যে-সকল সম্প্রদায়কে অবজ্ঞার চক্ষে দেখচ, তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে শিক্ষা লও। ব্রাহ্মসমাজে তাদের তুলনায় ধন, জন, শিক্ষা, প্রতিভা, শক্তি সবই অধিক আছে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের দাবী কারও উপরে খাটে না, তাই ব্রাহ্মসমাজ এত দরিদ্র ও দুর্ব্বল; ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম ভিক্ষুক, সংসারই প্রভু ও রাজা, তাই ব্রাহ্মসমাজের এই অবস্থা। ছি ছি! সে-সমাজের কি কখনও কল্যাণ হতে পারে, যেখানে ধর্ম্ম সংসারের কাছে রাজার বেশে আসতে পান না, অনুগ্রহপ্রার্থী ভিখারীর বেশে সংসারের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন? আগামী যুগে যদি ব্রাহ্মসমাজকে অধঃপতন হতে রক্ষা করতে হয়, তবে এই স্রোত ফিরাতেই হবে। সেই রাজরাজেশ্বরের দাবীটা নিজে স্বীকার করবার ও সংসারকে স্বীকার করাবার জন্য এক দল মানুষকে দাঁড়াতেই হবে। কে সেই মানুষ হবে, বল! নিয়ে এস জীবন, শ্রেষ্ঠ জীবন, কর্ম্মঠ জীবন, সংসার যার খুব বেশী বেশী দাম দেয়, এমন সব জীবন। এমন জীবন দাও, এমন জীবন টেনে আনো। অজস্র ভাল ভাল মানুষ এবং অজস্র টাকা চান সেই রাজরাজেশ্বর নিজের কাজের জন্য! তাঁর সেই দাবী ব্রাহ্মসমাজে ঘোষণা করবার জন্য ও আদায় করবার জন্য অনেক আয়োজন চাই। সাধনাশ্রম সেইরূপ একটি আয়োজন।

ধর্ম্মসমাজে ধার্ম্মিকের প্রাধান্য

ধর্ম্ম ও সংসার—এ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ঠিক রাখতে হলে আরও একটি কথা ভাববার দরকার হয়। যখন কোনও ধর্ম্মসমাজে মসতার অবস্থা থাকে, তখন স্বভাবতঃ তার ধর্ম্মপ্রাণ ও চরিত্রবান্ মানুষগুলির প্রভাব ও প্রতিপত্তিই তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল থাকে। ব্রাহ্মসমাজের

সঙ্গে যাঁদের সম্বন্ধ একান্ত ভাবে ধর্ম্মেরই সম্বন্ধ,—যাঁদের জীবন উপাসনার হাওয়ায়, আত্মপরীক্ষা, আত্মদৃষ্টি, অনুতাপ ও ব্যাকুলতার হাওয়ায় গঠিত, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে যাঁদের মনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দরদ, তাঁরাই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পুরুষ হবেন, ইহাই স্বাভাবিক। ধনী নন, পদস্থ মানুষ নন, পণ্ডিত নন, বাগ্মী নন, দেশের সম্মুখে যিনি নাম করেছেন তিনি নন, যিনি খুব ভাল করে কাজের ব্যবস্থা করতে কি দল বাঁধতে পারেন, তিনিও নন,—কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ, চরিত্রবান, আত্মোৎসর্গশীল ও ব্যাকুলাত্মা মানুষেরাই ব্রাহ্মসমাজে প্রাধান্য লাভ করবেন, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাবশে নানা কারণে মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। সময় সময় ব্রাহ্মসমাজকে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়তে হয়; তখন এর যোদ্ধৃপ্রকৃতির মানুষগুলি ইহার প্রথম পংক্তিতে গিয়ে সজ্জিত হন। কখনও প্রতিবাদীর উত্তর দিবার প্রয়োজন হয়, তখন এর তার্কিক ও বাগ্মীরা সেই কাজের প্রধান ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু কোনও সুস্থ ধর্ম্মসমাজ অধিক দিন এ অবস্থায় থাকতে পারে না। অচিরে তাকে আবার নিজের শক্তিসকলকে সাম্যাবস্থায় নিয়ে আসতে হয়; নিজের forces re-adjust করতে হয়; ধর্ম্মপ্রাণ মানুষদের আবার প্রথম পংক্তিতে নিয়ে বসাতে হয়।

মানুষের শরীরে কখনও হাত দু'খানি বেশী খাটে, কখনও পা দু'টি বেশী খাটে, কখনও মাথা বেশী খাটে, কখনও বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেশী হয়। এই সকল কাজের দরুণ শরীরের রস-রক্ত ক্ষণকালের জন্য সেই সেই অঙ্গে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হ'য়ে যায়, অথবা সেই সেই পেশী অধিক শ্রান্ত হ'য়ে ওঠে। এই অসমতার অবস্থা দূর করে সমগ্র শরীরের রসরক্তকে আবার সমতার অবস্থায় আনতে সাহায্য করে শরীরের কতকগুলি glands। তেমনি সকল প্রকার সাময়িক আন্দোলন ও

উত্তেজনার পরে ধর্ম্মসমাজকে নিজের সমতার অবস্থায় দ্রুত ফিরিয়ে আনবার জন্য তাদের মধ্যে নানা আয়োজন বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়।

সাধারণ অবস্থায় ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের প্রাধান্য এবং সাময়িক পরিবর্ত্তনের পরে সেই প্রাধান্যের দ্রুত পুনরাবর্ত্তন, ইহাই ধর্ম্মসমাজের স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। ঈশ্বরের শক্তি ব্রাহ্মসমাজে কাজ করচে কি না, তার একটি বড় পরীক্ষা এখানে যে, এতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও প্রধান কারা হয়ে ওঠে। ধর্ম্মই সংসারকে অনুপ্রাণিত করবেন, সাংসারিকতা ধর্ম্মপ্রাণতার উপরে প্রভুত্ব করবে না,—ইহাই ধর্ম্মসমাজের সুস্থ অবস্থা। সাংসারিকতা যদি কখনও ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হয়ে দাঁড়ায়, সংসারে ধর্ম্মের ও নীতির স্থান যে সর্ব্বোচ্চে, ইহা যদি সংসারের মানুষ কোনও দিন স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়, তখন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই বাধা অপসারিত করবার জন্য, প্রয়োজন হলে তাকে চূর্ণ করবার জন্য, ধর্ম্মসমাজে একটি প্রবল শক্তি থাকা আবশ্যক হয়। যে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ রাজভক্ত, সে দেশেও যেমন সৈনিকের ও দুর্গের প্রয়োজন থাকে, ধর্ম্মসমাজের এই প্রয়োজনটিও সেইরূপ। ব্রাহ্মসমাজের এই প্রয়োজন সাধনের নানা আয়োজনের মধ্যে সাধনাশ্রম একটি আয়োজন।

আগামী যুগে আমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মমণ্ডলীর ভাবটিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে হবে ও সকল সাধনাদর্শকে আরও ভাল করে একত্র করতে হবে। ধর্ম্মজীবনের ও উন্নত চরিত্রের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের জমিতে সেই উর্ব্বরতা ভাল করে সঞ্চার করতে হবে, যাতে কালে কালে এখানে তেজস্বী কর্ম্মীর ও সতেজ কর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। ব্রাহ্মসমাজের ধন জন ও প্রতিভার উপরে রাজরাজেশ্বরের দাবী ঘোষণা করে এবং সে দাবী আদায় করে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মকল্পনাকে ও কর্ম্মোদ্যোগকে শতগুণ

বর্দ্ধিত করতে হবে। ব্রাহ্মসমাজে যাতে ধর্ম্মের পক্ষটি সর্ব্বদা প্রবলতম থাকে, তার জন্য এখানে নানা শক্তিকেন্দ্র সৃষ্টি করতে হবে। এই সমুদয় কার্য্যেই সাধনাশ্রমের গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে। ভগবান অতীত যুগে একে দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের যে কাজ করিয়েছেন, তিনি তাঁর যে অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করে এর মধ্য দিয়ে এতগুলি জীবনকে তাঁর সেবাতে টেনে এনেছেন, আমরা তাঁর সেই করুণা স্মরণ করে আশাপূর্ণ অন্তরে ভবিষ্যতের দিকে তাকাই।

১২ই মাঘ, ১৩৩৪

প্রেমের সেবা

"If I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I am become as sounding brass, or a clanging cymbal. And if I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge ; and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. And if I bestow all my goods to feed the poor, and if I give my body to be burned, but have not love, it profiteth me nothing." (I. Cor. 13, 1-3. (Revised Version).

মনুষ্যগণের এবং দেবদূতগণের ভাষায় যত শক্তি ও যত চমৎকারিত্ব আছে, সব যদি আমার রসনায় থাকে, কিন্তু যদি আমাতে প্রেম না থাকে, তবে আমি একটি শব্দায়মান কাংস্যপাত্র কিংবা করতাল মাত্র হইয়া দাঁড়াই। যদি আমাতে ভবিষ্যদ্‌বাণীর শক্তি থাকে, সকল গূঢ়তত্ত্ব ও সমুদয় জ্ঞান যদি আমার অধিগত হইয়া থাকে, এবং যদি আমাতে সেই বিশ্বাস-বল থাকে যাহাতে পর্ব্বতকেও অপসারিত করিতে পারা যায়, কিন্তু যদি আমাতে প্রেম না থাকে, তবে আমি কিছুই নহি। যদি আমি আমার সমুদয় সম্পত্তি দরিদ্রদিগকে দান করি, যদি ধর্ম্মের জন্য আমি আমার দেহকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে দিই, অথচ যদি আমাতে প্রেম না থাকে, তবে এ সকল (ত্যাগেও) আমার কোন ফল নাই।—(পলের উক্তি)

সেবার জীবনের অন্তরতম বিষয়গুলিতে গৃহী ও ত্যাগী-সেবক এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, কি

গৃহ-পরিবার, কি ধর্ম্মসমাজের বা দেশের সেবাক্ষেত্রে, ঈশ্বর মানব-মনকে একই ভাবে অনুপ্রাণিত করেন এবং প্রেমের ব্যবহারের একই বিমল আদর্শ উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশিত করেন। কোনও সেবাই প্রেম বিনা সার্থক হয় না। বিশেষতঃ ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রেম বিনা সেবা একেবারে নিষ্ফল।

প্রেমে আত্মোৎসর্গ

প্রেমের সেবার বিষয়ে ভাবিতে গেলে প্রথমেই আত্মোৎসর্গের কথা মনে আসে। মানুষের জীবনে প্রথম যেদিন এইরূপ একটি আকাঙ্খার উদয় হয় যে এখন হইতে আমি আর আমার জন্য জীবন ধারণ করিব না, জীবন ধারণ করিব আর একজনের জন্য, সে দিনটি তাহার কি নবজীবনের দিন! শিশুটি ছোট বেলায় খেলা-ধূলা লইয়াই মত্ত থাকে, মনে হয় যেন তখন সে শুধু আপনাকে লইয়াই আছে। প্রথম যেদিন তাহার হৃদয়কোরক ফুটিয়া উঠে ও তাহার ইচ্ছা হয় যে আমি এখন হইতে খেলা ধূলা ছাড়িয়া মার জন্য, বাবার জন্য, দাদা দিদির জন্য, বা কোন বন্ধুর জন্য জীবন ধারণ করিব, তাঁহাদের খুশী করিয়া আমি সুখী হইব, যেদিন তাহার ক্ষুদ্র জীবনটুকু আর কেবল আত্মমুখীন থাকে না, অন্য একজনকে কেন্দ্র করিয়া অন্য একজনের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়ায়, সেদিনটি তাহার পক্ষে কি শুভদিন! হয়তো তখনও তাহার অন্তরে প্রেমের গভীরতা কিছুই আসে নাই। হয়তো তাহার তখনকার মনের অবস্থাটা 'প্রেম' বা 'ভক্তি' নামের যোগ্যই নয়। তথাপি, তাহার ক্ষুদ্র আমিত্বের উপরে ভাগ বসাইবার জন্য তাহার প্রাণের কোণে একটি নূতন বস্তু দেখা দিল। তাহার আমিকে ঢাকিয়া ফেলিবার, ছাইয়া ফেলিবার জন্য তাহার জীবনে নূতন একজন মানুষের

আবির্ভাব হইল। হউক না সে নিজে অতি তুচ্ছ, হউক না তাহার নূতন মানুষটি অতি তুচ্ছ, তথাপি এই ব্যাপারটি অতি পবিত্র; মানব-সংসারে ইহার স্থান অতি উচ্চে।

ইহার পরে, যখন ক্রমে মানুষের জীবনে আপনাকে ভুলিবার, আপনাকে হারাইবার ব্যাপারটি প্রেমের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন তাহা কি পবিত্র, কি সুন্দর আকার ধারণ করে! প্রেমে চালিত হইয়া একজন মানুষ যখন আর একজন মানুষের কাছে আত্মদান করে, জগৎ-ব্যাপারের মধ্যে তাহা কি পবিত্র ও মহৎ! আবার, মানুষ যখন প্রেমেতে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ঈশ্বরের হাতে নিজ জীবন অর্পণ করে, তখন তাহা আরও কত পবিত্র ও সুন্দর!

১৮৯২ সালে ভাই প্রকাশ দেবজী ও ভাই সুন্দর সিংহজী কলিকাতায় আসিয়া সাধনাশ্রমে যোগদান করেন। ঈশ্বরসেবাতে আত্মসমর্পণের উন্মাদনায় পরিপূর্ণ কতকগুলি সঙ্গীত তাঁহারা পঞ্জাব হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি সঙ্গীত কুমারী প্রেমদেবীর ভগবচ্চরণে আত্মাহুতি দানের অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত ও গীত হইয়াছিল। তাহার একটি কলি এই :—"তুম্‌রে দর্ পর্ ভেঁট ধরা হয়্ তন্ মন্ ধন্ অওর্ সারী জওয়ানী" অর্থাৎ "আমার তনু মন ধন ও সমগ্র যৌবন তোমার দ্বারে উপহারস্বরূপ ধরিতেছি।"—ধরাতলে স্বর্গ কোথায় দেখা যায়? যেখানে এক জন মানুষ আর এক জনের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করে, সেখানেই স্বর্গ; তাহা দরিদ্র পল্লীর আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধময় ময়লা গলিতেই হউক, কি উচ্চ রাজপ্রাসাদেই হউক; তাহা একজন বেতনভোগী ভৃত্যের জীবনেই হউক, কি একজন সর্ব্বত্যাগী ভক্ত কর্ম্মীর জীবনেই হউক।

প্রেমে আমিত্ব বিলোপ

প্রেমের জীবনের প্রধান কথা, আমিত্ব বিলোপ। আত্মোৎসর্গ হইতেই কি আমিত্ব বিলোপ আসে না? প্রেমে চালিত হইয়া আত্মোৎসর্গ করিলেই কি সঙ্গে সঙ্গে আমিত্ব বিলোপের সাধনটিও আয়ত্ত হইয়া যায় না? না, তাহা হয় না। আত্মোৎসর্গ ও আমিত্ব বিলোপ দুইটি এক বস্তু নয়। সংসারে পুরুষ ও নারীর যে ভালবাসা, তাহার সার্থকতা কখন হয়? চিন্তাবিহীন লোকে মনে করে যে যখন তাহারা পরস্পরের কাছে আত্মদান করিয়া পরিণীত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই প্রণয়ের সার্থকতা। কিন্তু তাহা নহে। সংসারে সার্থক বিবাহ যেমন দেখা যায়, ব্যর্থ বিবাহও তেমনি অনেক দেখা যায়। একটি পুরুষ ও একটি নারী প্রণয়ের আবেগে চালিত হইয়া পরস্পরকে গ্রহণ করিল। বিবাহ অনুষ্ঠানটি একটি সুন্দর অনুপ্রাণনময় অনুষ্ঠান হইল, সকলের প্রাণকে অপূর্ব্বভাবে পূর্ণ করিয়া দিল। সংসার সেই দম্পতীর কাছে কত প্রত্যাশা করিতে লাগিল। মনে করিতে লাগিল যে ইহাদের দাম্পত্য-জীবন অতি পবিত্র সুখ শান্তি ও সৌন্দর্য্যের আধার হইবে। কিন্তু হায়, ক্রমে দেখা গেল যে সেই বিবাহ তাহাদের দুই জনের পরবর্ত্তী জীবনকে মহৎ ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া দিতে পারিল না; কারণ, নিরন্তর আত্মবিলোপের সাধনায় তাহারা মনোযোগী হয় নাই। সেই প্রথম দিনের আত্মোৎসর্গের আবেগ তাহাদের জীবনকে কয়েক দিন সরস রাখিল বটে। কিন্তু ক্রমে তাহারা তাহাদের দৈনিক জীবনে নিজের নিজের জন্য সুখ দাবী করিতে লাগিল, আরাম দাবী করিতে লাগিল, আদর দাবী করিতে লাগিল। সেই দাবীর ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়া দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে তাহাদের মধ্যে পরস্পরের জন্য আত্মোৎসর্গের ভাবটিকে ম্লান করিয়া

ফেলিতে লাগিল। অথবা তাহারা অর্থোপার্জ্জন, মানসম্ভ্রম, প্রতিপত্তি প্রভৃতিকে জীবনে এমন মুখ্য বিষয় করিয়া তুলিল যে, "আমি তোমার জন্য জীবন ধারণ করিয়া সুখী, খাটিয়া সুখী, আমি তোমাকে হৃদয়ের পূজা, জীবনের পূজা দিয়া সুখী,"– পরস্পরের প্রতি এই যে ভাবটি, তাহা তাহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল; চর্চ্চার অভাবে এই ভাবটি একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল। আত্মহারা প্রেমের পবিত্র শোভাটি তাহাদের পরিবারে আর ফুটিতে পাইল না। আত্মোৎসর্গ এক দিনে করা যায়, কিন্তু আত্মবিলোপ সারা জীবনে সাধন করিতে হয়। কবি বলিয়াছেন, "প্রভবতি শুচি বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ, অর্থাৎ কোন কোন মানুষের মন যেন স্বচ্ছ মণির ন্যায়, গুরুর উপদেশের আলোর চমৎকার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে, আবার কাহারও মন যেন মাটির ডেলার মত, তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়েই না।" আমাদের গার্হস্থ জীবনে আমরা কি স্বচ্ছ মণি হইয়া আছি, না মাটির ডেলা হইয়া আছি? আমাদের জীবনে কি সেই প্রেমময় পরম গুরুর প্রেমের জ্যোতির প্রতিবিম্ব ভাল করিয়া খেলে? প্রতিদিনের আমিত্ববিলোপই সেই সাধন, যাহার দ্বারা মাটির ডেলাও ধীরে ধীরে স্বচ্ছ মণিতে পরিণত হইতে থাকে।

সেবকের জীবনেও ইহার অনুরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। যেদিন চাকরী ছাড়িয়া আসিয়া ঈশ্বরের সেবায় আপনাকে অর্পণ করি, অথবা জীবনের আরম্ভেই যেদিন "চাকরীর পথে যাইব না," এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরচরণে আত্মোৎসর্গ করি, সেদিনের সে ব্যাপারটি কি পবিত্র, কি অনুপ্রাণনময়! ইহাও যেন একটি পবিত্র বিবাহানুষ্ঠান; যেন ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে বিবাহ, যেন জনসমাজ ও তাহার একজন ব্যক্তির মধ্যে পবিত্র পরিণয়! কিন্তু শুধু সেইদিনের এই আত্মোৎসর্গ

জীবনকে অধিক দূর অগ্রসর করিয়া দিতে পারে না। যদি সারা জীবন ধরিয়া তিল তিল করিয়া আপনাকে মুছিয়া ফেলিবার সাধনাটি না করা যায়, যদি মনের গোপনে এই বিচার এই হিসাব একটুও স্থান পায় যে "আমায় কে কত ভাল বলিতেছে, আমার দলে কয় জন লোক আসিতেছে, কে আমাকে কোন দিন উপযুক্ত আদর সম্মান দিয়াছে বা দেয় নাই",—তবে সেবাতে উৎসর্গীকৃত সেই জীবনের ছবিও ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যর্থ বিবাহের ছবির অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

ধর্ম্মসমাজের সেবাক্ষেত্রে ব্যর্থ সেবাব্রতের ব্যাপার যত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারক্ষেত্রে ব্যর্থ বিবাহের ব্যাপার বোধহয় তত অধিক ঘটে না। উভয়ের তুলনা করিলে এই তারতম্য কেন লক্ষ্য করা যায়? তাহার কারণ এই যে, সংসারে পিতৃস্নেহ, মাতৃস্নেহ, দাম্পত্যপ্রীতি প্রভৃতি বস্তুকে আমরা যেরূপ উচ্চ স্থানে রাখি এবং প্রেমের খাতিরে আমিত্ব বিলোপকে আমরা যেরূপ মূল্যবান মনে করি, ধর্ম্মসমাজের সেবাক্ষেত্রে সাধারণতঃ তাহা করি না। সেই ক্ষেত্রে অনেক সময়ে এই ভুল করি যে সেবকের উজ্জ্বল জ্ঞানই বুঝি তাহার শক্তি, প্রবল কর্ম্মোৎসাহই বুঝি তাহার যোগ্যতা। সেবকের জীবনে আমাদের চক্ষে বিশ্বাস বৈরাগ্য প্রভৃতির স্থান যত প্রধান, প্রেমের স্থান তত প্রধান নয়। তাই ধর্ম্মসমাজের সেবাক্ষেত্রে আমিত্ব বিলোপের সাধনাটি অনেক স্থলে সফল হইয়া উঠে না। তাই ধর্ম্মরাজ্যে এত ব্যর্থ সেবাব্রতের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সেবকের কর্ত্তব্য যে, ধর্ম্ম এবং সংসার,—এই উভয় ক্ষেত্রের আত্মবিলোপের দৃষ্টান্তসকল তিনি শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করেন এবং এই উভয় ক্ষেত্র হইতেই তিনি অবনত মস্তকে এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

হে সেবাব্রতী, তুমি বিজ্ঞান-দর্শন আয়ত্ত করিয়াছ, বাগ্মিতাশক্তি

অর্জ্জন করিয়াছ, সুকণ্ঠ লাভ করিয়াছ, কর্ম্মশক্তি অধিগত করিয়াছ বলিয়া এ সকলের দ্বারাই কি তুমি ঈশ্বরের কাজের জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছ? অথবা, তুমি কি মনে কর যে সেবাক্ষেত্রে তাহারাই তোমার গুরু, যাঁহারা তোমাকে ভাল করিয়া এই সকল শিক্ষা দিতে পারেন? না তাহা নয়, কখনও তাহা নয়। জীবনের আদিতে মধ্যে ও অন্তে একটি মাত্র সাধনা আছে, তাহা ভালবাসার দ্বারা আপনাকে মুছিয়া ফেলা। এ সাধনা যাঁহার হইয়াছে, তিনিই ঠিক প্রস্তুত; নতুবা অপর সকল প্রস্তুতি পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি এখনও অপ্রস্তুত। এই আত্মবিলোপের শিক্ষা যিনি দিতে পারেন, জীবনে তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু।

আমার জীবনে ভগবান্ বহুবার যেন চক্ষে আঙ্গুল দিয়া আমার ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সেবার ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে করিতে যখন শুষ্ক, নিরুৎসাহ, ও অনুপ্রাণনবিহীন অবস্থা আসিয়াছে, তখন আমি মনে করিয়াছি, "ব্রাহ্মসমাজের কাজের বিষয়ে উপদেশ করিবার জন্য কোনও অভিজ্ঞ মানুষের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিলে ভাল হইত, উদ্দীপনা সঞ্চার করিবার জন্য কোনও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত নেতার সঙ্গ পাইলে ভাল হইত। কিন্তু হায়, তাহা আমি কোথা হইতে পাই?" মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন ভগবান্ আমাকে সংসারের মানুষের কাছে লইয়া গিয়া, তাহাদের আমিত্ব বিলোপের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমার মন ভাল করিয়া দিয়াছেন। বাঁকিপুরে আমাদের স্কুলে লছমন্ নামে একটি দরোয়ান ছিল। তাহার স্ত্রী কিছুদিন অসুখে ভুগিয়া মারা গেল। আমি নিজেই লছমন্‌কে ডাকিয়া সাত দিনের ছুটি দিলাম। কিন্তু তৃতীয় দিনের প্রভাতেই দেখি, সে আসিয়া কাজ করিতেছে। আমি স্নেহভরে তাহাকে নিষেধ করিলাম। সে নিষেধ মানিল না;

দেখিলাম, দর দর ধারে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। সে নিরক্ষর, হীন জাতির মানুষ। কিন্তু তাহার পত্নীবৎসলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এই উভয় ভাবের এই পরিচয় পাইয়া আমার মন মুগ্ধ হইয়া গেল। বাঁকিপুরে ঐ সময়ে আমি বড় শুষ্কতার মধ্য দিয়া চলিতেছিলাম; ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গের অভাবে মনে তখন বড়ই কষ্ট। ভগবান যেন আমাকে বলিলেন, "এই মানুষটি তাহার মনের কত ক্লেশ, তাহার হৃদয়ের কত শূন্যতা লইয়াও নিজ কর্ত্তব্য করিতে আসিয়াছে। ইহাকে দেখিয়া কি তোমার চিত্ত সরস হইবে না, অন্তর অনুপ্রাণনে ভরিয়া উঠিবে না?" আমি বলিলাম, "ঠিক, ঠিক, প্রভু! আমি গুরু চিনিতে পারি না, তাই এত একাকী হইয়া, এত বন্ধুহীন হইয়া, এত অনুপ্রাণনহীন হইয়া পড়িয়া থাকি।" সেই লছমনের কথা মনে করিয়া আমি এখনও কত উপকার পাই! স্কুলের বারান্দায় ঝাঁটা হাতে সজলনয়নে দণ্ডায়মান তাহার মূর্ত্তিটি আজও আমার মনে কত পবিত্র ভাবের সঞ্চার করে!

আমি অন্যের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাকে তো ভগবান্ বার বার আত্মবিলোপের শিক্ষাটি গ্রহণ করিবার জন্য সংসারের দ্বারে পাঠাইয়া দেন। তিনি যেন আমাকে বলেন, "তুমি মনে করিতেছ, তোমার হাতে কত গুরু ভার পড়িয়াছে, অতএব সংসার হইতে তাহার জন্য সুবিধাটুকু তোমার সর্ব্বাগ্রে পাওয়া চাই। অথবা, তোমার মনে কত শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাব আসিতেছে, সেগুলি যাহাতে অনতিবিলম্বে লিপিবদ্ধ হয় তাহার ব্যবস্থাটি আগে হওয়া চাই। তাহা নয়। ঐ সকল যত বড়ই হউক না কেন, তাহার দাবীটা সর্ব্বাগ্রে নয়। তোমার জন্য কতখানি আপনাকে ভুলিতে হইবে, ইহাই আগেকার কথা। আগে চারিদিক হইতে আত্মবিলোপের শিক্ষাটি লও, তাহার পরে কাজের সুব্যবস্থা। তোমার মেজাজ এত পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট,—

তোমার পত্নী তোমার এই সকল চঞ্চলতা মাথায় করিয়া লইয়া নিত্য এক ভাবে তোমার সেবা করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার কাছে নত হইয়া তুমি আত্মবিলোপের শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমার ছেলেটিকে তুমি আধ ঘণ্টা আগে তাহার দোষের জন্য বকিয়াছ, মারিয়াছ। সে ইহারই মধ্যে নিজের মন হইতে তোমার কঠোরতার চিহ্নটি মুছিয়া ফেলিয়া তোমার কাছে আসিয়াছে, সরল মনে আদর করিয়া আবার তোমাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেছে; তুমি ইহার নিকটে আত্মবিলোপের শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমার চাকরটি, তোমার নিকটে কত অযথা ভর্ৎসনা পাইয়াও তাহার মনুষ্যত্বের কত অবমাননা সহ্য করিয়াও হাসিমুখে তোমার সেবা করিতেছে, তাহার কাছে তুমি আত্মবিলোপের শিক্ষা গ্রহণ কর।"

হে সেবক, তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় গুরু হয়তো তোমার অধীন মনুষ্যেরা। হয়তো তোমার ছাত্র, তোমার পুত্র কন্যা, তোমার দাস দাসী, যাহারা মুখ বুজিয়া খাটিয়া যাইতেছে, যাহারা পদে পদে আপনাদিগকে মুছিয়া ফেলিতেছে। যাহাকে তুমি শিক্ষা দিয়া তুলিয়া ধরিবে মনে করিয়াছিলে, সে-ই হয়তো তোমার গুরু। তাহারই পায়ে মাথা রাখ। জগৎকে উদ্ধার করিবার স্পর্দ্ধা লইয়া সেবাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইও না। তোমার চারিদিকে প্রেমে আত্মবিলোপের অজস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সে বিষয়ে তুমি সংসারকেই গুরু বলিয়া বরণ কর। সংসার হয়তো তোমাকে বেদ, পুরাণ, দর্শন, বিজ্ঞান শিখাইতে পারিবে না; কিন্তু সেবার 'ক' 'খ' যে আত্মবিলোপ, তাহা তোমাকে শিখাইতে পারিবে। সংসার হয়তো তোমাকে ধনত্যাগ চাকরীত্যাগ শিখাইতে পারিবে না; কিন্তু তাহা অপেক্ষা বড় ত্যাগ যে 'আমিত্ব' ত্যাগ, তাহা তোমাকে শিখাইতে পারিবে।

প্রেমের স্নিগ্ধতা

যেখানে প্রেম, সেখানে স্নিগ্ধতা। প্রেম যে-হাওয়াতে বাঁচে, স্নিগ্ধতা তাহার একটি প্রধান গুণ। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে প্রেমের স্নিগ্ধতা রক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী হই না। গৃহী ও সেবক উভয়েরই পক্ষে সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে, তাহার দৈনিক কার্য্যতালিকার মধ্যে যেন এমন কাজের অবসর থাকে, যাহা তাহার হৃদয়কে সরস ও সজীব রাখিবে, তাহার স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তির স্নিগ্ধতাকে বাঁচাইয়া রাখিবে। কি সংসারে, কি সেবাক্ষেত্রে, কতকগুলি কাজ প্রয়োজনীয় কাজ। সেগুলি না করিলে সংসার চলে না এবং লোকহিত-সাধন হয় না। আবার কতকগুলি এমন কাজও আছে, কার্য্য হিসাবে যাহার প্রয়োজন অত্যল্প, কিন্তু স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তির চর্চ্চার জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন। যে-মানুষ এমন সকল কাজের জন্য দৈনিক জীবনে একটুও অবসর রাখে না, তাহার জীবন সরস থাকিতে পারে না। দেখা যায়, এক এক জন মানুষ সারাদিন সংসারের নানা কাজে যেন চরকীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি একবার গিয়া ঠাকুরঘরে পূজার জন্যও বসেন বটে, কিন্তু সে পূজা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া বাগানে গিয়া সাজি ভরিয়া সেই পূজার জন্য ফুল তুলিয়া আনেন। এমন মানুষকে দেখিয়া আমার অনেক সময়ে মনে হইয়াছে যে সারাদিনের সব ব্যস্ততার মধ্যে প্রভাতের ঐ ফুল-তোলাটুকুই হয়তো উঁহার হৃদয়কে বাঁচাইয়া রাখিতেছে, উঁহার জীবনে স্নিগ্ধতা সঞ্চার করিতেছে। মহাত্মা রামমোহন রায়ের মাতা শেষ জীবনে নিজ হাতে জগন্নাথের মন্দির ঝাঁট দিবার ভার লইয়াছিলেন। কেন লইয়াছিলেন? ভৃত্যের অভাবে নয়, কিন্তু নিজ শ্রদ্ধা ভক্তির

চরিতার্থতার জন্য। দেরাদুনের নিকটবর্ত্তী নালাপাণি পাহাড়ে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে। সেটি অতি মনোরম নির্জ্জন স্থান। পাহাড়ের বনের ভিতরে আশ্রমের কয়েকখানি কুটীর ও প্রাঙ্গণ; একটি বৃক্ষতলে বসিবার জন্য উচ্চ একটি বেদি। মাটি দিয়া লেপিয়া এ সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। আশ্রমধারী সন্ন্যাসীকে যখন আমরা দেখিতে পাইলাম, লক্ষ্য করিলাম যে তাঁহার বহির্ব্বাসের উপরে কোমরে একখানি কাপড় বাঁধা, হাতে ঝাঁটা; তিনি সেই প্রাঙ্গণ ও গাছতলা ঝাঁট দিতেছিলেন। কাব্যে পড়ি আশ্রমের মুনি-কন্যারা গাছের গোড়ায় জল সেচন করিতেন, আবার পাখীরা যাহাতে নিঃশঙ্ক হইয়া সেই জল পান করিতে পায় সেদিকেও তাঁহারা দৃষ্টি রাখিতেন। এই সকল ছোট ছোট কাজ কেন তাঁহারা করিতেন? সারাদিন ধ্যান ধারণায় যাপন না করিয়া মাঝে মাঝে এই সকল কাজে কেন তাঁহারা সময় ব্যয় করিতেন?—হৃদয়কে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য।

আমরা নগরে বাস করি। আমাদের একটুও প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থান নাই। অনেকেরই একটিও প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু রাখিবার সঙ্গতি নাই। কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবনে এমন কিছু কিছু প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজ রাখা সম্ভবপর, যাহাতে হৃদয় তাজা থাকে। পূজার ঘর ঝাঁট দিয়াই হউক, কিংবা যাহাকে শ্রদ্ধা করি এমন মানুষের ঘরখানি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া দিয়াই হউক, বাগানে গিয়া গাছের ফুলগুলিকে স্পর্শ করিয়াই হউক, কিংবা মানুষের বাড়ীর ফুল যে শিশুগুলি, তাহাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ সময় যাপন করিয়াই হউক, অথবা কোনও ভালবাসার স্নিগ্ধ স্পর্শের মধ্যে প্রতিদিন খানিকক্ষণ আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াই হউক, যে ভাবেই হউক, যে কাজের

দ্বারাই হউক. জীবনে স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তির স্নিগ্ধতাকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে; নতুবা জীবন শুষ্ক হইয়া যাইবে। শুধু প্রয়োজনীয় কাজে (সে কাজ সংসারের কাজই হউক, ধর্ম্মসমাজের কাজই হউক, অথবা ধর্ম্মসাধন নামে চিহ্নিত পবিত্র কার্য্যগুলিই হউক) সারাদিনের সময়কে নিঃশেষে ব্যয় করিলে, তাহার ফল হইবে হৃদয়ের শুষ্কতা। এমনও দেখা গিয়াছে যে একজন ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ দিবসের অনেক অধিক সময় উত্তেজনাপূর্ণ উপাসনা প্রার্থনা ও কীর্ত্তনাদিতে ব্যয় করিলেন; তাহার ফলে তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী এমন শ্রান্ত ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গেল যে, তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আর নিজ সন্তান বন্ধু ভৃত্য প্রভৃতি মানুষের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করিতে পারিলেন না। হিতে বিপরীত ঘটিল। এমন পবিত্র কাজ যে ঈশ্বরের উপাসনা, তাহাও যেন তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিল। ঈশ্বর তো তাহা চাহেন না। তিনি চাহেন যে আমরা আমাদের হৃদয় সরস রাখি, প্রেমের স্নিগ্ধতাকে জীবনে সযত্নে রক্ষা করি। সজীব হৃদয়ের সূত্র ধরিয়াই ঈশ্বর আমাদের জীবনকে অধিকার করেন। হৃদয়ের স্নিগ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে যথেষ্ট অবসর চাই; প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজের জন্য সময় ব্যয় করিতে পারা চাই; প্রেম-ভক্তির চর্চ্চার জন্য নানা আয়োজন করা চাই এবং সে-সকলকে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধরিয়া থাকা চাই। ঝাঁট দেওয়ার কাজ, ফুল তোলার কাজ, শিশুদের আদর করার কাজ, বাগানের কাজ, এ সকল হয়তো সব দিন সমান সরস বোধ হইবে না; বন্ধুর ভালবাসার স্পর্শ হয়তো সব দিন সমান মিষ্ট লাগিবে না; তথাপি এ সকলের জন্য নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে সময় দেওয়া চাই, কারণ, স্নিগ্ধতার হাওয়া বিনা প্রেম বাঁচে না।

প্রেমের নির্ভর ও তাহার শান্তি

প্রেমের শান্তির কথা বলিতে গেলেই বাইবেলের মার্থা ও মেরীর কাহিনী মনে পড়ে। মার্থা ও মেরী নামে দুই বোন ছিল। যীশু মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া বসিতেন। মেরী যীশুর কাছে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতে ভালবাসিত। মার্থার প্রকৃতি ছিল অন্যরূপ। কিসে যীশুর পরিচর্য্যা ভালরূপে সম্পন্ন হইবে, তাহার নানা আয়োজন করিতে গিয়া মার্থার মন ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িত। সে যীশুর কাছে বসিয়া বিশেষ কিছু তৃপ্তি পাইত না। মেরী যে যীশুর কাছে এত বেশী সময় বসিয়া থাকে ও তাঁহার বচনসুধা পান করে, তাহা মার্থার ভাল লাগিত না। একদিন সে একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, "এত কাজ পড়িয়া আছে, আমি একা খাটিয়া খাটিয়া হয়রান হইতেছি।" তদুত্তরে যীশু মার্থাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, "তুমি এত খাটিতেছে কেন? এত কাজই বা সৃষ্টি করিতেছ কেন। এবং তাহা লইয়া এত ব্যতিব্যস্তই বা হইতেছ কেন? আমার কাছে বসাটাই তোমরা প্রধান বলিয়া জান। মেরীই ঠিক পথ ধরিয়াছে।"

মার্থা ও মেরীর এই কাহিনীটিকে কখনও কখনও শ্রমবিমুখতার সমর্থনের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যীশুর উদ্দেশ্য তাহা ছিল না। মনোযোগপূর্ব্বক বাইবেলের ঐ অংশ পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যীশু কর্ম্মের নিন্দা করেন নাই, অতিরিক্ত উদ্বেগের নিন্দা করিয়াছেন। প্রেমের দৃষ্টি ও প্রেমের নির্ভর যাহার অন্তরে নাই, সেই মানুষ 'কাজ' 'কাজ' করিয়া বড়ই ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। প্রভুর সেবা লইয়া এমন মানুষ যেন সর্ব্বদাই বিব্রত। তাহার মুখে হাসি

নাই, উদ্বেগে তাহার ললাট সদাই রেখাঙ্কিত, যেন তাহার মস্তকেই সব ভার পড়িয়াছে; যেন সে ভার সামলাইবার জন্য তাহার উপরে উপরওয়ালা আর কেহ নাই; যেন সেই গুরু ভার বহিতে গিয়া সে আনন্দময় ভগবানের আনন্দের দিকে দৃকপাত করিতেই পারিতেছে না। ব্রাহ্মসমাজের সেবাক্ষেত্রে এইরূপ মনের ভাব অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারের কার্য্যক্ষেত্রেও এমন সব মানুষ দেখা যায়, যাহারা নিজেদের দায়িত্বকে আপন মনে অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াইয়া তোলে এবং তাহার চাপে যেন পিষিয়া যায়।

যেরূপ মনের অবস্থা লইয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজের কাজ করি এবং কাজ করিতে করিতে যে ভাবে আমরা পরস্পরের সঙ্গে বাক্যালাপ করি, তাহাতে আরও একটি তুলনা আমার মনে আসে। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলের মানুষদের সর্ব্বদাই নৌকায় যাতায়াত করিতে হয়। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর এক একখানি নৌকা থাকে। মাঝে মাঝে সেই নৌকা ডাঙ্গায় তুলিয়া তাহার তক্তাতে গাবের রস মাখাইতে হয়, নতুবা তক্তার জোড় ফাঁক হইয়া গিয়া নৌকাতে জল প্রবেশ করে। যাহাতে ভাল করিয়া গাব দেওয়া হয় নাই, এমন নৌকাও কখনও কখনও (হঠাৎ অল্প দূরে যাইবার প্রয়োজন হইলে) জলে ভাসাইতে হয় কিন্তু ইহাতে তাহার আরোহীরা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়ে। একটা ছিদ্র বন্ধ করিতে করিতে শতটা ছিদ্র দিয়া জল উঠিতে থাকে। আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজ যেন একখানি সচ্ছিদ্র নৌকা, আর তাহার কাণ্ডারী ভগবানও যেন এক অন্ধ মাঝি; আর আমরা, তাহার আরোহীরা, তাহার ছিদ্র বন্ধ করিতে গিয়া সামাল্ সামাল্ রবে একবার এদিক একবার ওদিক দৌড়িয়া বেড়াইতেছি। কেবলই উদ্বেগ, কেবলই হা হুতাশ, কেবলই ছুটাছুটি! ভগবানের সেবকের দশা এমন হইলে

চলে না। ভগবানও অন্ধ কাণ্ডারী নহেন; ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া তিনি আমাদের সচ্ছিদ্র নৌকাতেও বসান নাই; আর তিনি আমাদের কেবল ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া হয়রান হইতেও বলেন নাই।

ভগবান তাঁহার সেবকদের বলেন, "এই অতি-ভাবনা ছাড়। বিপদ কাটাইয়া ব্রাহ্মসমাজ-তরীকে লক্ষ্যধামে লইয়া যাইব আমি। তুমি তোমার কাজ করিয়া যাও। তুমি প্রেম লাভ কর। প্রেম লাভ করিয়া বিকশিত হইয়া উঠাই তোমার কাজ। আমার সেবাক্ষেত্রে তুমি কাজ করিবে প্রেম বিলাইয়া, চরিত্রসৌরভ বিস্তার করিয়া, বিকশিত মনুষ্যত্বের স্পর্শ দিয়া; ব্যস্ত হইয়া বা ছুটাছুটি করিয়া নয়। তোমাতে যে প্রেম ভক্তির বীজ আছে, তোমাতে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ রহিয়াছে, সে সব তুমি আগে ফুটাইয়া তোল। আর কিছুর ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" সেবকের জীবনটা চির-উদ্বেগের চিরব্যস্ততার জীবন নয়; প্রেমে ফুটিয়া, প্রেমের সৌরভ বিস্তার করিয়া মানুষকে আকর্ষণ করিবার জীবন। যাহার প্রকৃতিতে ভালবাসা আছে, এবং ঈশ্বরের ভালবাসা দেখিবার চক্ষু যাহার আছে, সেই মানুষের মন হইতে উদ্বেগ চলিয়া যায়। মেরীর ন্যায় সে প্রেমের নির্ভরে ও প্রেমের শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

প্রেমের আবরণ

প্রেমের একটি কাজ, মানবজীবনের শ্রম দুঃখ ত্যাগের উপরে পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া। বাহিরের জগৎ হইতে একটি উপমা গ্রহণ করা যাক্। মানুষ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে গিয়া, চাষ করিতে গিয়া, পৃথিবীর মাটি কাটিয়া শুষ্ক ধূলিতে পরিণত করে। যদি প্রকৃতি নিরন্তর

তাহাকে আবার শ্যামল তৃণদলে আচ্ছাদন না করিতেন, তবে পৃথিবী মানবের বাসের উপযোগী স্থান হইত না। প্রেমেরও সেই স্বভাব। সংসার ও ধর্ম্মসমাজ, এই উভয় ক্ষেত্রে, মানুষের পরিশ্রম ও উদ্বেগ হইতে বহু পরিমাণে উত্তাপ উত্তেজনা ক্লান্তি ও বিরক্তি উৎপন্ন হয়। এ সকলকে ঢাকিয়া রাখা, এ সকলকে গোপন করা, এ সকলের উপরে একটি স্নিগ্ধ আবরণ টানিয়া দেওয়া,—ইহা প্রেমের স্বভাব। যদি দেখা যায়, কোনও বাড়ীতে কর্ত্তা কিংবা গৃহিণী, পিতা মাতা কিংবা পুত্রকন্যা, মনিব কিংবা দাসদাসী, তাহাদের শ্রম ও ক্লান্তির কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না, নানা ভাবে নিত্য তাহারই আলোচনা করিতেছে, তবে বুঝিতে হইবে সেই বাড়ীতে প্রেম নাই; সেই বাড়ীর মানুষেরা পরস্পরের ভালবাসার স্বাদ পায় নাই। প্রেমের স্পর্শে পরিশ্রমের ও ক্লান্তির অনুভূতি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়।

প্রেমের একটি কাজ যেমন পরিশ্রমের উপরে পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া, তেমনি আর একটি কাজ, সংগ্রাম দুঃখবরণ ও ত্যাগের উপরে পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া। আমরা প্রভুর সেবাক্ষেত্রে আসিয়া কেবলই 'শ্রম শ্রম' ও 'ত্যাগ ত্যাগ' কেন বলিব? নিশ্চয়ই আমরা প্রাণ দিয়া খাটিব, সব দুঃখ সহিব, অর্থকরী বৃত্তি ও ভোগসুখকে বর্জ্জন করিয়া আসিব। কিন্তু সেই শ্রমকে, সেই দুঃখবরণকে, সেই ত্যাগটুকুকে বার বার বলিয়া বলিয়া কেন বাড়াইব? তাহার জন্য গৌরব কেন লইতে যাইব? প্রেমের কাজ তাহা কখনও নয়। প্রেম যেমন শ্রমের অনুভূতিকে গোপন করে, তেমনি সংগ্রাম দুঃখ এবং ত্যাগের অনুভূতিকেও আবরণ করে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুরে আমাদের একজন ডাক্তার বন্ধু হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। কিছুকাল আমরা প্রতিদিন সেই বাড়ীতে

গিয়া তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনদের লইয়া ভগবানের নাম করিতাম ও সেই পরিবারের ভবিষ্যৎ বিষয়ে পরামর্শ করিতাম। "ডাক্তার বাবু এমন হঠাৎ চলিয়া গেলেন! একটি মাত্র পুত্র চাকরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর সব ছেলেমেয়েদের এখনও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি টাকা কড়ি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পত্নী কিরূপ অসহায় হইয়া পড়িলেন! কি করিয়া তিনি এই গুরু ভার সামলাইবেন? হায়, উঁহাদের পক্ষে কি দুর্দ্দিনই উপস্থিত হইল;"— আমরা সহানুভূতির সহিত এইরূপ কথা প্রায়ই বলিতাম। ডাক্তার বাবুর পত্নী নীরবে আমাদের কথাগুলি শুনিয়া যাইতেন, কিছুই উত্তর করিতেন না। অবশেষে কয়েক দিন পরে একদিন হঠাৎ তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আপনারা যাহা বলিতেছেন, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমার স্বামী আমাকে ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছেন, এ কথা আমার সম্মুখে আর কখনও বলিবেন না। তিনি আমাকে সারা জীবন অশেষ সুখশান্তিতে রাখিয়াছিলেন, এখনও বেশ ভাল অবস্থাতেই রাখিয়া গিয়াছেন।" সেই নারীর কথায় আমরা লজ্জিত হইলাম। সেদিন প্রকৃত প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। প্রকৃত প্রেমের স্বভাব এই যে, সে নিজে কখনও দুঃখ সংগ্রামের কথা বলে না; এবং বন্ধুজন সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়া তাহার উল্লেখ করিলে তাহাও সে সহ্য করিতে পারে না।

মানবজীবনে এমন এক অপূর্ব্ব নিগূঢ় শক্তি আছে যাহা সুখ ও দুঃখ, ভোগ ও ত্যাগ, শ্রম ও আরাম, এই সকল দ্বন্দ্বের দুইকেই আত্মস্থ করিয়া, পরিপাক করিয়া, আত্মার রসরক্তে পরিণত করিতে পারে; যাহা এ উভয়ের সাহায্যে আত্মার শ্রী সৌন্দর্য্য রচনা করিতে পারে।

যোগশক্তি প্রেম। প্রেমের শক্তিতে যখন শ্রম দুঃখ ও ত্যাগ কোনও জীবনে আত্মার রসরক্তে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তখন আর তাহা সে জীবনে শ্রম দুঃখ ও ত্যাগের আকারে মানুষের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে পারে না।

প্রেমের জ্যোতি

শুধু তাহাই নহে। প্রেমিকের জীবনের সেই শ্রম দুঃখ ও ত্যাগ, তাঁহার মনের আনন্দকে, অন্তরের জ্যোতিকে বাড়ায়। সংসারের কোন গৃহিণীর কথা ভাবুন। তাঁহার জীবনে যে শ্রম দুঃখ ও ত্যাগের কোনও বাহ্য প্রকাশ নাই, সে-সকল যে তাঁহার অন্তরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ইহাই কি শেষ কথা? তিনি যে পতির দুঃখ-সংগ্রাম পতির সহিত একত্রে বহিতে প্রস্তুত, তিনি যে স্বামীর প্রতি বিশ্বাসবতী, তিনি যে সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্টচিত্তা, ইহাই কি তাঁহার জীবনের চরম কথা? কখনও নয়। যদি তাঁহার অন্তরে পতির প্রতি প্রেম থাকে, তবে তাঁহার মন বলিবে, "সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ, উভয়ই তোমার সঙ্গে আমার প্রেম-বন্ধনকে দৃঢ়তর করিয়াছে, আমার প্রেমানন্দকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে।" পতির সঙ্গে তাঁহার সকল ব্যবহারে, বাক্যের ও কার্য্যের সকল বিনিময়ে, এমন কি পতির প্রতি তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টিপাতে তাঁহার অন্তরের সেই প্রচ্ছন্ন প্রেমানন্দের আভা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। লতার কোমল অঙ্গে, তাহার পাতায় ফুলে, যেমন তাহার ভিতরের সরসতা ফুটিয়া বাহির হয়, তেমনি পতির প্রতি তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টিপাতে, তাঁহার সকল আকার ইঙ্গিতে, তাঁহার অন্তরের গূঢ় প্রেমানন্দের আভা ফুটিয়া বাহির হইবে। সাচ্চা মণি হইতে যেমন একটি আভা, একটি দীপ্তি নির্গত হয়, সুন্দর ব্রাহ্ম-চরিত্র হইতে তেমনি একটি প্রেমের আভা

নির্গত হয়; তাহা তাহার গৃহ পরিবারকে আলো করিয়া রাখে। সুন্দর সেবক-চরিত্র হইতে তেমনি একটি প্রেমের আভা নির্গত হয়, তাহা সেবাক্ষেত্রকে আলো করিয়া রাখে। অন্তরের সেই প্রেমানন্দের আভা চারিদিকে মানুষের মধ্যে বিস্তার করিতে পারিলে তুচ্ছ সেবাও সার্থক; না পারিলে শ্রেষ্ঠ সেবাও ব্যর্থ।

১২ই মাঘ, ১৩৩৫

প্রেমভক্তি সাধনের অনুকূল ক্ষেত্র রচনা

মানব-দেহে gland-এর কাজ রক্ত হতে নানারূপ রস উৎপন্ন ও সঞ্চিত ক'রে এবং সমগ্র দেহে তাহা সঞ্চারিত ক'রে দেহের কার্য্যকে বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিচালিত করা। ধর্ম্মসমাজেও তেমনি বিশেষ বিশেষ ভাব উৎপন্ন ও সঞ্চার করবার জন্য বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র থাকা আবশ্যক। এই ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, সাধনাশ্রমের একটি সুমহৎ কাজ ধর্ম্মপিপাসু মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয় লাভের বিষয়ে ও ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হবার বিষয়ে সহায়তা করা। 'পরিচয়' ও 'সম্বন্ধ',—এই কথা দুটি একটি তুলনার সাহায্যে ব্যক্ত করা যাক্।

হিন্দু সমাজের একটি বালিকা বধূ তার পিতৃগৃহ ছেড়ে পতিগৃহে চলে যাবে। তার মন নানা সংশয়ে আকুল হয়ে রয়েছে। আমি পরিচিত পিতৃগৃহ ছেড়ে কোন্ অচেনা অজানা জায়গায় যাব, কোন্ অচেনা একদল লোকের সঙ্গে আমাকে বাস করতে হবে, কা'দের অধীনতার মধ্যে, নূতন কোন এক পরিবারের শাসন-শৃঙ্খলার (disciplineএর) মধ্যে আমাকে গিয়ে পড়তে হবে, এই বলে তার মন অস্থির। তার এই অস্থির ভাব দূর করবার জন্য তার বাবা তাকে বোঝাতে লাগলেন, "মা, আমি খুব ভাল করে জেনে শুনে, খুব ভাল ঘরেই তোমার বিয়ে দিয়েছি। তোমার যিনি স্বামী, তিনি অতি সদাশয় ও মহৎ অন্তঃকরণের লোক। তাঁদের বাড়ীর সব লোকগুলির বিষয়ে আমি খোঁজ নিয়েছি, সকলেরই প্রকৃতি বড় ভাল। তাঁদের শরীরে বড় দয়ামায়া। তোমার কোন ভাবনার কারণ নাই।" এইরূপে

পিতা তাঁর কন্যার কাছে তার স্বামীর ও স্বামীর আত্মীয়দের গুণসকল বর্ণনা করে করে ও সুযুক্তিপূর্ণ কথা বলে বলে তার দ্বিধা সংশয় দূর করে দেবার চেষ্টা করলেন।

তার পরে ঘর ছেড়ে যাবার সময়টি নিকটে এল; তখন তার সমবয়স্ক অন্যান্য বধূরা তাকে নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিয়ে আশ্বাস দিতে লাগল; বলল, "প্রথম প্রথম আমাদেরও কত ভয় করেছিল। বাপ মা ভাই বোনকে ছেড়ে গিয়ে ও পরিচিত সব মানুষ পরিচিত ঘর বাড়ী ছেড়ে গিয়ে প্রথম প্রথম কষ্টও পেয়েছিলাম বই কি? তা ছাড়া, নূতন পরিবারের শাসন-শৃঙ্খলার বশবর্ত্তী হয়ে চলতে গিয়েও প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। কত অভ্যাস বদলাতে হয়েছে, কত রকমে আপনাকে জোর করে বাঁধতে হয়েছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে কষ্টের দিন চলে গিয়েছে। এখন দেখ না, আমরা কত মনের আনন্দে ঘরকন্না করছি।" বাপের বাড়ীর বউয়েরা এ রকম বলল। শ্বশুরবাড়ীতে পূর্ব্বে আগত অন্যান্য বউয়েরাও এই রকম কথাই বলল। তাদের সকলের সাক্ষ্য শুনে সেই নব বধূর মন একটু শান্ত ও নির্ভয় হল।

আর সকলের সাক্ষ্যের চেয়ে সে তার নিজের মার সাক্ষ্য পেয়ে অধিক আশ্বস্ত হল। তার মা বললেন, "এই দেখ না, মা, আমিও তো একদিন তোমাদের এ বাড়ীতে বউ হয়েই এসেছিলাম। আমি তখন এসেছিলাম বলেই না তোমরা সকলে আমার কোলে জন্মেছ?" এই প্রকারে সকলে নিজ নিজ জীবনের সাক্ষ্য দিয়ে নব বধূকে নির্ভয় করে দেবার চেষ্টা করল।

সে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে সাবধানে সকলকে খুসী করে চলবার চেষ্টা করে। এই ভাবে কিছুকাল যাবার পর নিজ পতির সঙ্গে তার পরিচয়

হল ও প্রণয় জন্মাল। তখন তার এক নূতন জীবন আরম্ভ হল। তখন আর তার সে সংশয়ও নাই, সে ভয়ও নাই। আপনা হতেই সে সব দূর হয়ে গিয়েছে। তখন তার জীবন দিনে দিনে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই সময়ে সে একদিন তার স্বামীকে বলল, "আমি মনে করেছিলাম, এখানে এসে কেবল সাবধানে নিজেকে সংযত করে করে ও সকলকে খুসী করে করে, ভয়ে ভয়েই আমাকে চিরকাল চলতে হবে। আমি তো তার জন্যই মনকে প্রস্তুত করেছিলাম। সে ভাবে এখানকার জীবন আরম্ভ করেই তো আমি সন্তুষ্ট ছিলাম, কিন্তু এখন তোমাকে ভালবেসে আমার এ কি-জীবন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে! এমন আনন্দময় জীবন যে আমার ভাগ্যে আছে, তা তো আমি আগে জানতাম না!"

ধর্ম্মের ঘরে কোন মানুষ যখন প্রথম আসে, তখন তাকে ঐ নব বধূর সঙ্গে তুলনা করা যায়। ধর্ম্মরাজ্য তার কাছে নূতন। ঈশ্বরকে তখন সে জানে বটে, কিন্তু তাঁকে আপনার বলে চেনে নি। পিতৃগৃহ ছেড়ে পতিগৃহে গমনোদ্যত বধূর সম্বন্ধে তার পিতা যা করেছিলেন, ধর্ম্মসমাজের পক্ষে নবাগতের জন্য তা করা প্রয়োজন হয়। তার চিন্তার সকল সংশয় দূর করে দেবার জন্য, তাকে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা ও মঙ্গলস্বরূপ প্রভৃতি ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য, তাকে ধর্ম্মরাজ্যের সুপথ বিপথ ভাল করে চিনিয়ে দেবার জন্য একটি ভাল আয়োজন ধর্ম্মসমাজে থাকা প্রয়োজন হয়। অজ্ঞান অন্ধকারে তার হাতখানি ধরবার জন্য, সারা জীবনে তার জ্ঞানপিপাসাকে জাগিয়ে রাখবার ও তৃপ্ত করবার জন্য ধর্ম্মসমাজে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন হয়।

চিন্তা ও যুক্তিলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্মপথে নূতন যাত্রীর সব সংশয় দূর হ'য়ে গেলেও তার অন্তরের ভয় দূর হয় না। ভীরুতা ও অল্প-বিশ্বাস মনুষ্যমাত্রেরই প্রকৃতিগত। নূতন পথে চল্‌তে গেলেই মানুষের

প্রকৃতিগত সেই ভীরুতা ও বিশ্বাসের অল্পতা এসে মানুষকে ভীত করে। এজন্য প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজে এমন ধর্ম্মমণ্ডলী থাকা প্রয়োজন, যেখানে গিয়ে নূতন মানুষ একদল সাক্ষীর সাক্ষাৎ পাবে। সাক্ষীর দরকার কেন? তারা যে তাকে কিছু বোঝাবে, তা নয়। এমন কি, তাকে কিছু যে বলবে, তা-ও নয়। কিন্তু তারা তাকে কিছু দেখাবে। "আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ। ধর্ম্মের পথে আমরাও চলেছি। এ পথে দুঃখ সংগ্রাম আছে বটে, কিন্তু তাতে ভয় নাই। দেখ, আমরা কত সংগ্রাম পার হ'য়ে এসেছি; তুমিও তোমার সব সংগ্রাম পার হ'য়ে যাবে; ভয় নাই,"—এই বলে যারা সাক্ষী হয়ে তার সম্মুখে দাঁড়াবে এমন মানুষ থাকা দরকার।

দয়ালের দয়াতে ধর্ম্মজগৎ এইরূপ সাক্ষীর দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রথমতঃ দেখতে পাই, সকল দেশের ও সর্ব্বকালের সাধুভক্তেরা এইরূপ সাক্ষী। তাঁরা অভয় দিয়ে বলছেন, "চলে এস. শান্তি আছে। পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্তেরা এস, বিশ্রাম আছে। দুঃখী তাপীরা এস, চোখের জল মুছে যাবে।" প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজের একটি বিশেষ কাজ, ধর্ম্মপিপাসু নরনারীকে সাধুভক্তগণের সঙ্গে জীবন্ত যোগে যুক্ত ক'রে দেবার জন্য একটি কেন্দ্র রচনা করা। যে-ধর্ম্মসমাজে ধর্ম্মের আলোচনা অনেক আছে কিন্তু এই সাক্ষীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগ-স্থাপনের ভাল ব্যবস্থা নাই, সে-ধর্ম্মসমাজ ব্যাকুল-হৃদয় নূতন নূতন মানুষ পাবার ও রাখবার যোগ্য স্থান নয়। ধর্ম্মসমাজের সর্ব্বপ্রধান কাজই বোধ হয়, সাধু ভক্ত, ধর্ম্মবীর, চরিত্রবীর ও মহামনা মানুষদের এইরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সাধনের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ কিরূপ? শুষ্কতায় যখন আমার প্রাণ কাঁদবে, তখন আমি অনুভব করব, চৈতন্যদেব আমার কাছে এসেছেন; আমার জন্য নিজের চোখের জল ফেলে, আমার শুষ্ক

চোখের যে জল উৎসারিত হচ্ছিল না, তাকে উৎসারিত করে দিচ্ছেন। পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত ভগ্ন চূর্ণ অবস্থায় আমি অনুভব করব, যীশু আমার কাছে এসেছেন ; এসে তাঁর করুণ চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমার দুঃখ তাপ হরণ করছেন। রিপুর উত্তেজনায় আমি অনুভব করব, বুদ্ধদেব আমার কাছে এসে তাঁর অমৃতময় নির্ব্বাণ-বাণী উচ্চারণ ক'রে আমার সে উত্তেজনা শান্ত ক'রে দিচ্ছেন। ভগবান কি ধর্ম্মরাজ্যটাকে একটা বিশাল জনহীন প্রান্তরের মতন ক'রে, একটি নির্জ্জন বন্ধুহীন স্থান ক'রে সৃষ্টি ক'রেছেন ?—তা কখনই নয়। সাধুভক্তগণের দ্বারা, কত বন্ধুজনের দ্বারা তা' পরিপূর্ণ। সেই সাধুভক্তগণকে কি অতীত যুগই ফুরিয়ে ফেলেছে ? তাঁরা কি এ-যুগে বর্ত্তমান নাই ? তাঁদের আশ্বাসবাণী কি আমরা শুনতে পাব না ? যীশুর "come unto me" এই অমৃতময় আহ্বান কি আমরা শুনব না ?—তা কখনও নয়। ধর্ম্মজগতের বড় কাজ, মানুষকে দয়ালের দয়ার এই সাক্ষীদের জীবন্ত সংস্পর্শের মধ্যে স্থাপন করা।

কিন্তু যেমন সেই বালিকা বধূর পক্ষে আর সকলের সাক্ষ্যের চেয়ে নিজের মায়ের সাক্ষ্য বড় হ'য়েছিল, তেমনি মানুষের পক্ষে আর সব যুগের সব দেশের সাক্ষ্যের চেয়ে নিজ মণ্ডলীর সাক্ষ্য বেশী বড় হয়। নিজ মণ্ডলী যেন নিজের মা।

প্রত্যেক ভাল পরিবারে নব বধূ গিয়ে কতকগুলি নিয়ম শৃঙ্খলা ও আজ্ঞাধীনতার হাওয়াতে বাস করে। যে পরিবারে তার ব্যবস্থা নাই, সেখানে মানুষ ভাল গড়ে না। আজকাল এমন অনেক দুর্ভাগ্য উচ্ছৃঙ্খল পরিবার দেখা যায়, যেখানে বধূরূপে প্রবিষ্ট হবার পর সুশিক্ষিতা সুবিনীতা কন্যাগণের চরিত্র হ'তে পূর্ব্বের সকল সুশিক্ষা ও সদ্‌গুণ মুছে গিয়েছে। যা হওয়া উচিত ছিল মানুষ গড়বার স্থান, তা হ'য়ে গেছে

মানুষ নষ্ট করবার স্থান। ধর্ম্মরাজ্যেও তেমনি। যে সমাজের হাওয়াটি প্রত্যেক নবাগত মানুষের মনে প্রথম হ'তেই ঈশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণের শিক্ষা, সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শের অনুগত হ'য়ে চলবার শিক্ষা মুদ্রিত ক'রে দেবার অনুকূল নয়, সে-সমাজ প্রকৃত ধর্ম্মসমাজ নয়। ধর্ম্মসমাজের হাওয়া কিরূপ? একজন নূতন মানুষ সেখানে গেলে তার আত্মার রোমে রোমে এই ভাব প্রবিষ্ট হ'য়ে যায় যে, "রুচি বাসনা কল্পনা বিষয়ে, শক্তি অর্থ ও সময়ের ব্যবহার বিষয়ে আমি নিয়ত পরম প্রভুর আজ্ঞাধীন।" এই আজ্ঞাধীনতার হাওয়া যে-সমাজে নাই, অথচ স্বাধীনতার হাওয়া আছে, সেখানে গিয়ে নবাগত মানুষের মন সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্ফুর্ত্তি, পারিবারিক ও সামাজিক আমোদ আহ্লাদ এবং ভোগবিলাসের দিকেই ঝোঁকে; মহত্ত্ব ও উন্নত চরিত্রের দিকে অগ্রসর হবার পক্ষে প্ররোচনা কিংবা সাহায্য প্রাপ্ত হয় না। কিসে সমাজ মধ্যে এই আজ্ঞাধীনতার হাওয়া, আদর্শের অনুবর্ত্তিতার হাওয়া নিরন্তর প্রবাহিত থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। একটি সজীব ধর্ম্মমণ্ডলী এ বিষয়ে বড় সহায়।

সাধনাশ্রমের মণ্ডলীটি হ'তে আমরা এ বিষয়ে কত সাহায্য পেয়েছি; জীবনের রুচি অভ্যাস সব ভেঙ্গে চুরে নূতন ক'রে গড়া, সুখাসক্ত মনকে প্রভুর সেবায় উদ্যোগী করা, ইন্দ্রিয়াসক্ত প্রকৃতিকে শুদ্ধ করা,—এ সকলের কঠিন সংগ্রামে সাধনাশ্রমের মণ্ডলী হ'তে যে সাহায্য পেয়েছি, তা চিরদিন স্বীকার করব। এ মণ্ডলীর কত ভালবাসার সুকোমল স্পর্শে, কত ব্যাকুল প্রার্থনার বেষ্টনে, কত শাসনের চাপে, কত আদরে ভর্ৎসনায় দণ্ডে আমার জীবন গ'ড়ে উঠ্‌বার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছে। আমার আত্মার রক্তে সে সকল মিশে রয়েছে। আযৌবনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম, নিজ প্রকৃতিকে বশ ক'রে ঈশ্বরের চরণে

দান করার মত কঠিন কাজ আর কিছু নাই। আমার জীবনের অনেক শত্রুকেই আমি এক কোপে কেটে নিঃশেষ করতে পারি নাই। তোমাদের জীবনে যদি এক কোপে কাটবার মত জিনিস কিছু থাকে, তবে তা তেমনি ক'রেই কাট। লাগাও তার উপর ব্রহ্মনামের খাঁড়া, তীক্ষ্ণ বৈরাগ্যের খাঁড়া। আর, লাগাও সাধকদের কাছে আত্ম-সমর্পণ-রূপ খাঁড়ার কোপ! আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, এই শেষোক্ত ভাবের খড়্গাঘাতে বড় কাজ হয়। কাট' এমনি ক'রে বিষয়াসক্তি, সুখাসক্তি, অহঙ্কার! কত বিষয়ে যে সারা জীবন ধ'রে আত্মার অণু পরমাণুকে ধৌত করতে হয়, শরীরের রক্ত মাংসকে বিন্দু বিন্দু ক'রে শুদ্ধ করতে হয়! এই কাজের জন্য একা একা সেই হৃদয়েশ্বরের চরণতলে প'ড়ে প'ড়েও কাঁদতে হয়; আবার, ধর্ম্মমণ্ডলীতে যাঁরা বাপ মায়ের মত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীর মত, স্নেহভাজন সহোদর সহোদরার মত, তাঁদের কাছে ব'সে ব'সে অশ্রুজলে ভেসে ভেসে জীবন ধৌত করতেও হয়। এ বিষয়ে ধর্ম্মপরিবার আমাদের কত সহায়!

তার পরে ধর্ম্মসমাজের হাওয়াটি এমন হওয়া দরকার যে তাহাতে বেষ্টিত থেকে প্রত্যেক ধর্ম্মপিপাসু আত্মা ঈশ্বরের প্রেমানুভূতিতে ও তাঁহার প্রতি প্রেম-ভক্তিতে ফুটে উঠবার সাহায্য পায়। ধর্ম্মসমাজের প্রকৃত সার্থকতা, প্রেমের অনুকূল ও ভক্তির অনুকূল হাওয়া সৃষ্টিতে; যে-হাওয়াতে মানব-হৃদয়ে মানুষ সম্বন্ধে নম্রতা ও কোমলতার ভাব প্রথমে প্রস্ফুটিত হ'য়ে মানুষের মূল্য-অনুভূতিটি প্রথমে জাগরিত হ'য়ে তাকে ভক্তির জীবনের জন্য উন্মুখ ক'রে রাখে; যে-হাওয়াতে আত্ম-ইচ্ছাপরায়ণতার কঠোর ভাবটি জাগতেই পায় না; যাতে সেরূপ ভাব নিয়ে কেউ এলে শীঘ্রই সে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায়, শীঘ্রই সে কোমল

স্নিগ্ধ হ'য়ে আত্মবিলোপে অভ্যস্ত হ'য়ে প্রেম-ভক্তির জীবনের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে যায়। যদি ধর্ম্মসমাজের হাওয়াটা কেবল যুক্তি-তর্কের হাওয়া, জ্ঞানালোচনার হাওয়া, অথবা কর্ম্মব্যস্ততার হাওয়া মাত্র হয়, তার বেশী আর কিছু না হয়, অর্থাৎ প্রেম-ভক্তির অনুকূল হাওয়া না হয়, তবে তো সেখানে এসে মানুষ ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত পরিণতি লাভ করতে পারবে না। বধূ নূতন বাড়ীর খুব ভাল রাঁধুনী বা ভাল দাসী হ'য়ে থাকলেও যেমন সেখানে তার প্রকৃত জীবন হ'ল না,—প্রকৃত জীবন হয় যখন সে পতির সঙ্গে এবং পতিকুলের লোকগুলির সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধে বাঁধা পড়ে,—এখানেও তেমনি। ধর্ম্মসমাজ তার নবাগত মানুষটির উপরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেন? সে-সমাজে এসে নবাগত মানুষটি ভাল জ্ঞানী, কর্ম্মী, এমন কি নিষ্ঠাবান তপস্বী হ'লেও হ'ল না। প্রশ্ন এই যে, তার প্রেম-ভক্তি-ফুল কি সে হাওয়াতে ফোটে? যে সজল স্নিগ্ধ হাওয়াতে মানব-হৃদয়ের সুকোমল ভক্তি-বৃত্তি অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিত হয়, তা' কি সেখানে প্রবাহিত?

প্রেমভক্তির জীবনের অনুকূল আবেষ্টন (setting) হ'ল একটি মণ্ডলী; একাকিত্বে তাহার সাধন হয় না। একা ধ্যান ধারণা সম্ভব, কিন্তু ভক্তিসাধনা সম্ভব নয়। ভক্তির সাধকের প্রথম কথাই এই যে, আমি আত্মার সঙ্গীদের দ্বারা বেষ্টিত না হয়ে জীবন ধারণ করব না। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য, দ্বিবিধ মণ্ডলীতে বেষ্টিত হয়ে বাস করেন। ভক্তির সাধক কিসে ভরপূর হ'য়ে থাকেন? কিসে ডগমগ হ'য়ে থাকেন? তাঁর প্রেমময় দেবতা যে নিত্য তাঁর কাছে এবং তাঁর প্রিয়জনেরা যে নিত্য তাঁর আত্মার কাছে কাছে! যে সাধু ভক্তেরা তাঁকে মাতিয়ে রাখেন, তাঁরা যে আত্মার গায়ে গায়ে লেগে রয়েছেন! এই আত্মিক সঙ্গের দ্বারা possessed না হ'লে যেন কিয়ৎ পরিমাণে ভূতাবিষ্টবৎ অবস্থা না

হ'লে ভক্তির সাধন হতে পারে না। শুধু কীর্ত্তনে আর খোল করতালের ধ্বনিতেই ভক্তির অনুকূল অবস্থা রচিত হয় না। তার জন্য চাই ভক্তদের ও প্রিয় আত্মাদের আত্মিক সঙ্গ; তার জন্য চাই, রেশমের পোকা যেমন আপনাকে সোনালি সূতা দিয়ে জড়িয়ে ফেলে, তেমনি ক'রে প্রাণেশ্বরের ও প্রিয় আত্মাগণের সঙ্গের দ্বারা নিজ আত্মাকে নিয়ত জড়িয়ে রাখা।

নব বধূর তুলনাটি হ'তে কেবল ধর্ম্মসমাজের বিষয়ে নয়, ধর্ম্মসমাজের আধ্যাত্মিক সেবকের বিষয়েও উপদেশ লাভ করা যায়। যিনি ধর্ম্মসমাজের আত্মিক সেবা করতে চান, প্রথমতঃ, তিনি ধর্ম্মপিপাসু মানুষের সংশয় ছেদন করতে সমর্থ হবেন। বইপড়া-জ্ঞান যদি তাঁর না-ও থাকে, তবু নিজ অন্তর-আলোকে তিনি মানুষের সংশয় দূর করে দেবেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মধ্যে মানবজীবনের সুখ দুঃখের, সংগ্রাম ও আনন্দের অভিজ্ঞতার এমন প্রাচুর্য্য থাকা প্রয়োজন, যার দ্বারা তিনি ধর্ম্মরাজ্যের যাত্রীর কাছে সে রাজ্যের জীবনের ভাল সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান হ'তে পারেন। তৃতীয়তঃ, তিনি আজ্ঞাধীনতার জীবনে, নিয়ত ঈশ্বর-ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন। চতুর্থতঃ এবং সর্ব্বোপরি, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রেমানন্দে জীবিত থেকে, ভক্তির জীবনে প্রস্ফুটিত হ'য়ে অপর মানুষকেও সেই প্রেম-প্রলোভনের দ্বারা আকর্ষণ করবেন, ভক্তির জীবনের দিকে অগ্রসর ক'রে দেবেন।

প্রেমভক্তির সাধনা করা ও তাহার অনুকূল একটি স্থান রচনা করাতেই যে ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা, এই সত্যটি একবার ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একটি তুলনার সাহায্যে প্রকাশ ক'রেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মজিলপুর অঞ্চল থেকে অনেক লোক সুন্দরবনে মধু আহরণ করতে যায়। মৌমাছিরা যখন চাকের

দিকে ফিরতে থাকে, তখন একজন লোক একটি মৌমাছির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সে মানুষটি ঘাড় উঁচু ক'রে সেই মৌমাছির দিকে তাকিয়ে থাকে, আর মৌমাছি যে দিকে যায় সেই দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। তার তো চোখ নামাবার যো নাই, তাই পথে খানাখন্দ কাঁটা থাক্‌লে সে তাহা এড়াতে পারে না। তার হাত ধ'রে আর একজন বা দুই জন লোক যায়। তারা তার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ায় এবং তাকে পথের বিপদ হ'তে রক্ষা করে। ধর্ম্মসমাজের কাজও এইরূপ। এর প্রধান মানুষগুলির লক্ষ্য থাকবে প্রেম-ভক্তির সাধনার দিকে; সমাজমধ্যে প্রেমানুগত স্বভাব, ভক্তির অনুকূল স্বভাব সঞ্চার করবার দিকে। তাঁদের দৃষ্টি অন্য কোন দিকে গেলে চলবে না। বর্ত্তমান যুগের মানুষ ভক্তির আতিশয্য হ'তে উদ্ভূত অকল্যাণকে বড় ভয় করে। যদি সমাজমধ্যে সে ভয়ের কারণ দেখ, তবে না হয় ধর্ম্মরাজ্যের খানাখন্দ ও কাঁটাবন হ'তে রক্ষা পাবার জন্য প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে সাবধান জ্ঞানী ও কর্ম্মীদের সংযোগ ক'রে দিও; কিন্তু তথাপি প্রধান ব্যক্তিদের দৃষ্টিটা সেই প্রেমভক্তির দিকেই রাখতে দিও। ব্রাহ্মসমাজে প্রেমভক্তির সাধনায় অর্পিতচিত্ত একাগ্রমনা মানুষের বড় অভাব হয়েছে। কে ব্রাহ্মসমাজকে প্রেমভক্তির সেই মধুচক্রের দিকে নিয়ে যাবে? কার দৃষ্টি একেবারে সেই দিকে লেগে রয়েছে?

২৬ বৎসর পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয় যা' বলেছিলেন, এখন তা আরও প্রবল ভাবে অনুভব করছি। কিসে ব্রাহ্মসমাজ প্রেমভক্তিতে স্নিগ্ধ স্থান হয়, কিসে ইহা সংসারতাপে তপ্ত আত্মাদের জুড়াবার স্থান হয়, আমাদের সকলের চেয়ে বড় ভাবনার বিষয় তো তা-ই। সমাজমধ্যে ঈশ্বরের প্রেম-প্রলোভন যদি প্রবল ভাবে বিদ্যমান থাকে, তবে ক্ষুদ্র সাংসারিক প্রলোভন মানুষকে কেন টেনে নেবে? তাঁর প্রেমরাজ্যে

কত অমৃতময় স্বাদ! মানুষে-মানুষে, মানুষে-ঈশ্বরে, ঈশ্বরে-মানুষে,—তিনে মিলে তাঁর প্রেমরাজ্যে কি প্রেমলীলা, কি মধুময় নিত্য লীলা! কেন আমরা এ সকল হ'তে বঞ্চিত থাকব? ব্রাহ্মসমাজে আবার সুদিন আসুক; ব্রাহ্মসমাজ প্রেমভক্তির স্রোতে আবার সিক্ত হোক্, সরস হোক্।

১২ই মাঘ ১৩৩৬

ধর্ম্মজীবনের সত্যতা

'ধর্ম্মজীবনের সত্যতা' সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করতে গেলে ধর্ম্মজীবন সত্য হয় না কিসে তার আলোচনা অগ্রে প্রয়োজন।

আনন্দ অন্বেষণ

প্রথমতঃ, সুখ অন্বেষণ ধর্ম্মজীবনের সত্যতার পরিপন্থী। ধর্ম্মসাহিত্যে বলে, জ্ঞানী ভক্ত ও যোগী অতি উন্নত আনন্দের অধিকারী হন,— পরাশান্তি লাভ করেন। জ্ঞানী যখন জ্ঞান-তপস্যায় নিযুক্ত, এক একটি পবিত্র তত্ত্ব যখন তাঁর চিত্ত-আকাশে উদ্ভাসিত হয় তখন তাঁর হৃদয় কি আনন্দে পরিপূর্ণ! ভক্ত যখন ঈশ্বরের প্রেমানুভূতিতে মগ্ন, ঈশ্বরের নামগানে কীর্ত্তনে যখন তাঁর চিত্ত উদ্বেলিত, তখন তাঁর হৃদয় কি আনন্দে পরিপূর্ণ! যোগী যখন ধ্যানস্থ হয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলের চঞ্চলতা থেকে মুক্ত, যখন তাবৎ বস্তু তাবং সত্তা তাবৎ জগদ্ব্যাপার তাঁর কাছে বিগলিত হয়ে যায়, স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যখন একাত্মভূতির বিমল রস তাঁর চিত্তকে প্লাবিত করে, তখন তাঁর হৃদয় কি আনন্দে পরিপূর্ণ! কিন্তু এ সকল আনন্দ ধর্ম্ম-জীবনের ফল। এ আনন্দকে যাই তুমি লক্ষ্য-স্থানে রাখলে, অমনি তোমার ধর্ম্মজীবনে সত্যতা আর রইল না। সুখ-অন্বেষণকে যত উর্দ্ধেই নিয়ে যাও না কেন, তা' সুখ-অন্বেষণই। তা' সত্য ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা নয়, তা' সত্য ধর্ম্মজীবন নয়।

আজকাল যাঁরা নবযুগের নব শিক্ষার ফলে ঈশ্বরানুভূতিকে বিশ্ব-জগতে ব্যাপ্ত করে দিচ্ছেন, যাঁরা জীবধর্ম্মের সকল আনন্দে, রূপ-রস-গন্ধ-

স্পর্শ-শব্দে, সঙ্গীতে, সৌন্দর্য্যে, ঈশ্বরের আনন্দলীলা দর্শন করতে মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁরা ধর্ম্মকে সহজ ভূমিতে নিয়ে এসে মানব-মনের অশেষ উপকার সাধন করছেন। কিন্তু তাঁরা যে-পরিমাণে ঐ সহজ আনন্দকে মানব জীবনের লক্ষ্য-স্থানে রাখেন সেই পরিমাণে তাঁরা সত্যজীবন হতে চ্যুত হন। এ ক্ষেত্রেও বলতে হয়, সুখ-অন্বেষণ সুখ-অন্বেষণই। সুখকে যত ইচ্ছা মার্জ্জিত কর না কেন, তাঁকে "আনন্দ" নাম দিয়ে যত ইচ্ছা গৌরবান্বিত কর না কেন, মানব-মনে তার জন্য যে অন্বেষণটি তা' মানব-মনকে প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের অবস্থা হতে নীচে নামিয়ে দেয়। সুখ-অন্বেষণের ভাবটি ধর্ম্মজীবনের সত্যতার একটি বড় বাধা।

আত্ম-অভিনন্দন

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মজীবনের সত্যতার আর এক বাধা,—আত্মতৃপ্তি, (self-complacency), "আমার অবস্থা কত ভাল" এই বলে মনে মনে আপনাকে অভিনন্দিত করা। সকলেই জানেন, মানুষের ধনাভিমান ও জ্ঞানাভিমান এ সংসারে অতি অশোভন বস্তু। কিন্তু মানুষের ধর্ম্মাভিমান ও সাধনাভিমান ততোধিক কদর্য্য বস্তু। "চারিদিকে সকলেই সাধনভজনবিহীন; এর মধ্যে আমি বা আমরা কয় জন সাধনে অনুরাগী" —এইরূপ একটি ভাব যদি মনের গোপনে বিদ্যমান থাকে, তবে সে আত্ম-অভিনন্দন, সে self-congratulation ধর্ম্মজীবনের সত্যতাকে একেবারে বিনষ্ট করে দেয়। "চারিদিকে সকলেই সংসারাসক্ত; আমি বা আমরা কয়জন ত্যাগী"—এই ভাব যদি মনের গোপনে কাজ করে, তা তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মজীবনকে অসত্য ও অসার করে তোলে। "চারিদিকে ভারত তিমিরাচ্ছন্ন, তার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ আলোক-প্রাপ্ত",—এরূপ বা এর অনুরূপ একটি ভাব যদি ব্রাহ্মসমাজ আপনার অন্তরে পোষণ করে

আপনাকে অভিনন্দিত করতে থাকেন, তা' তাঁর ধর্ম্মজীবনের সত্যতাকে বিনষ্ট করবে।

যে-ভূমিতে দাঁড়িয়ে কোনও মানুষ বা মণ্ডলী বা সমাজ আপনাকে অভিনন্দিত করেন, হয়তো সেই ভূমিতে পৌছিতে তাঁদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সেই সংগ্রামের যুগে হয়তো তাঁদের ধর্ম্মজীবন সত্য ছিল; তাঁরা ধর্ম্মজীবনের সত্যতার পথ দিয়ে ঐ ভূমিতে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু যখনি ঐ প্রকার আত্ম-অভিনন্দন আরম্ভ হল, অমনি তাঁদের ধর্ম্মজীবনে অসত্যতা প্রবেশ করল। তখন হতে তাঁদের ধর্ম্মজীবনে অসারতার ভাগ বর্দ্ধিত হতে লাগল। যদি এই অসারতাকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হতে দেওয়া হয়, তবে শেষে অতি শোচনীয় ফল ফলে। কারণ, আত্ম-অভিনন্দনের ফল অন্ধতা; এরূপ অন্ধতাহেতু কত ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বনাশ হয়েছে, কত ধর্ম্মমণ্ডলীর অধঃপতন হয়েছে, তার সংখ্যা নাই।

প্রদর্শন

তৃতীয়তঃ, সংসারে ভদ্রতা রক্ষা, খেলা, অভিনয় প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপার আছে। তা'তে সত্য গোপন অথবা মিথ্যা আচরণ নাই। সত্য গোপন ও মিথ্যা আচরণ সর্ব্বদাই দূষণীয়। এ সকল ব্যাপার সেভাবে দূষণীয় নয়। সংসারে যখন আমরা ভদ্রবেশে সজ্জিত হয়ে কোনও সামাজিক মিলনক্ষেত্রে যাই, তখন আমরা সকলেই জানি যে এই পোষাক আমাদের কারো প্রতিদিনের পোষাক অথবা অষ্ট প্রহরের পোষাক নয়। এরূপ জানা থাকে বলে আমরা সকলে সেখানে নিঃসঙ্কোচে পরস্পরের সঙ্গে মিশতে পারি। কিন্তু যদি কারো মধ্যে আপনার প্রকৃত অবস্থাকে অতিক্রম করে একটু প্রদর্শনের ভাব প্রকাশ পায়, তবে তা' বিসদৃশ

বোধ হয়। কত ধনী পরিবার ঘটনাবশে দারিদ্র্যে পতিত হয়েও পূর্ব্বের ন্যায় "ঠাট বজায় রাখতে" গিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়।

ছেলেমেয়েরা যখন খেলা করে তখন একজন রাজা হয়, একজন মন্ত্রী হয়, একজন প্রজা হয়। তখন তারা যা করে বা বলে, তা কেউ সত্য বলে ভ্রম করে না। বয়স্কেরা যখন অভিনয় করেন বা অভিনয় দর্শন করেন, তখন কেউ এ ভ্রম করেন না যে সত্য সত্যই রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠির বা বিক্রমাদিত্য তথায় উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যেও কি এই জাতীয় ব্যাপার সকলের স্থান আছে? আমার বিশ্বাস, তা নাই। সত্যতা, reality,—ইহাই ধর্ম্মের একমাত্র ভূমি। মিথ্যা না হলেও, যাতে ঠাট বজায় রাখা, অভিনয়, সাজসজ্জা প্রভৃতির ভাব মনে আসে, এমন সকল ব্যাপারকে ধর্ম্মরাজ্য হতে দূরে রাখা আবশ্যক।

সংসারে সাজ পোষাকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে মানুষের মন সাজ পোষাক নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত, তাকে বড় কৃপাপাত্র মনে হয়। আমার একটি নেপালী চাকর ছিল। সে কাজে কর্ম্মে বড় দক্ষ ছিল। কিন্তু তাকে কোন কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে বললেই দেখতাম, সে নিজের ঘরে গিয়ে ভাল পোযাকটি পরে, জুতা পায়ে দিয়ে, চুল আঁচড়াচ্ছে; এদিকে দেরী হয়ে আমার কাজে ক্ষতি হচ্ছে। তার এই অতিরিক্ত সাজ সজ্জার ফলেই সে ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে লব্ধ জ্ঞান ঈশ্বরের সেবার জন্য ব্যবহার করতে পারা যায়। সে জ্ঞান যেন ঈশ্বরের ভৃত্যের হাতের যন্ত্র, যেন ঈশ্বরের সৈনিকের অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু তাকে সাজসজ্জার ভাবে, অর্থাৎ তাহা দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে মানুষের সম্মুখে বাহির হবার ভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি কোনও মানুষের মনে জ্ঞানের জন্য ব্যাকুলতাকে ডিগ্রীর জন্য ব্যাকুলতা গ্রাস করে অথবা ডিগ্রী লাভ করবার পর তার চিহ্নের অক্ষর

কয়টি নামের পশ্চাতে যত্র তত্র ব্যবহার করবার প্রবৃত্তি যদি তার মধ্যে প্রকাশ পায়, তবে সে প্রদর্শন-স্পৃহা অচিরে তার ধর্ম্মজীবনের সারবত্তা নষ্ট করে ফেলবে। এমন কি, এরূপ প্রদর্শন-স্পৃহা যার মধ্যে দেখা দিয়েছে, তার ধর্ম্মজীবনে যে ইতিমধ্যেই অসারতা প্রবেশ করেছে, তা'তে সন্দেহ নাই। উপাধি লাভ করে যাঁর মনে আত্ম-তৃপ্তির ভাব আসে, সে তখন হতে নিজ ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অসাবধান হয়ে পড়ে।

জ্ঞানগত বিষয়ে মানুষকে পরীক্ষা করা, তার যোগ্যতার বিচার করা, ও তাকে উপাধি দান করা সম্ভব। ঈশ্বর-সেবকের পক্ষে এরূপ পরীক্ষা দেওয়াতে এবং পরিশ্রম করে উপাধির যোগ্যতা অর্জ্জন করাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধীয় কিংবা চরিত্র সম্বন্ধীয় কোনও উপাধি গ্রহণ অথবা ব্যবহার করা ধর্ম্মজীবনের সত্যতা এবং সারবত্তা নষ্ট করবার প্রকৃষ্ট হেতু। মানুষ শ্রদ্ধাবশতঃ কখনও কখনও মানুষকে এই জাতীয় উপাধিও প্রদান করে থাকে, কিন্তু তিনি স্বয়ং এরূপ উপাধি ব্যবহার করছেন, এ কল্পনা করতেও ক্লেশবোধ হয়। কখনও কখনও কাহারও কাহারও নামের সঙ্গে "ভক্তিবিনোদ" প্রভৃতি উপাধি সংযুক্ত হতে দেখেছি এবং তাঁদের নিজ উক্তিতে নিজের নামে ঐ উপাধি ব্যবহার করতেও দেখেছি। দেখে শরীর শিউরে উঠেছে। মনে হয়েছে, ভক্তির সর্ব্বনাশ করা হচ্ছে।

অভিনয়

ইউরোপের কোন কোন স্থানে যীশু খ্রীষ্টের জীবনের অভিনয় প্রদর্শিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে Oberammergau নামক স্থানের Passion-play অতি প্রসিদ্ধ। অনেকে সেখানে গিয়ে উপকৃত হয়ে

থাকেন। ধর্ম্মের সঙ্গে অভিনয়ের সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত, এ বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক মনে হয়।

এ দেশে প্রাচীন কাল হতে অনেক সামাজিক আনন্দোৎসব প্রচলিত আছে। সে সকলের মধ্যে আমোদ আহ্লাদ যাত্রাগান অভিনয় প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয় এবং তার সঙ্গে অল্প স্বল্প দেবপূজার ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। মানুষের নির্দ্দোষ আনন্দকে দেবপূজার দ্বারা এইরূপে পবিত্র করে দেওয়া নিশ্চয়ই ভাল। আমি নির্দ্দোষ আমোদের বিরোধী নই, নির্দ্দোষ অভিনয়েরও বিরোধী নই। কিন্তু ধর্ম্ম ও আমোদ, ধর্ম্ম ও অভিনয়, এ উভয়ের প্রভেদের রেখাটি অস্পষ্ট করে ফেলা আমি বিপজ্জনক মনে করি। আমার মতে আমোদ বা অভিনয়াদি ধর্ম্মোৎসবের সহিত মিশ্রিত হওয়া উচিত নয়।

প্রাচীন ভারতে 'ধর্ম্ম' বলতে যা যা বোঝাত, আমরা এ যুগে ধর্ম্ম বলতে তদতিরিক্ত আরও কিছু বুঝি এবং সেই অতিরিক্ত অংশটুকুকেই প্রাধান্য দান করি। ধর্ম্ম শুধু ঈশ্বরের পূজা নয়, ধর্ম্ম শুধু সংসারের গুরুতর ব্যাপার সকলকে অথবা সামাজিক আমোদ আহ্লাদকে ঈশ্বরের পূজার দ্বারা মণ্ডিত করে নেওয়া নয়। প্রধানতঃ ঈশ্বর-চরণে মানুষের আত্মসমর্পণের নামই ধর্ম্ম; এই আত্মসমর্পণের জন্য মানব-মনে যে প্রবল ব্যাকুলতার উদয় হয়, তা-ই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। এ কারণে আমরা অনেক সময়ে শুধু 'ধর্ম্ম' শব্দটি ব্যবহার করি না; আমাদের মনের ভাব অধিক উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করবার জন্য আমরা 'ধর্ম্মজীবন' শব্দটি ব্যবহার করি।

এ কথা মনে রাখলে বলতে হয়, সামাজিক আমোদ আহ্লাদের দিনে যাই করা হোক না কেন, ধর্ম্মজীবন সংসৃষ্ট ব্যাপার সকল হতে অভিনয় প্রভৃতিকে দূরে রাখাই ভাল। ধর্ম্ম ও অভিনয়, ধর্ম্ম ও

প্রদর্শন,—এই দুই বস্তু কোনও কারণে কোনও আকারে মিশে আছে, তা' ঠিক নয়। উৎসবাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান সত্যতার ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত। যে-দিনটি বা যে-সপ্তাহটি আমি উৎসবের ভাবে কাটাব, প্রাণকে ভেঙ্গে চুরে, অনুতাপে প্রদীপ্ত করে, ব্যাকুলতায় আলোড়িত করে, ঈশ্বর-চরণে সমর্পণ করব, সেই দিনটিতে সেই সপ্তাহটিতে আমি আবার অভিনয়ও করব অথবা অভিনয় দর্শনও করব, এ সমর্থনযোগ্য নয়। ব্যাকুলতার ও খেলার, সত্যের ও অভিনয়ের, এই মেশামিশি, এই juxtaposition, আমার সহ্য হয় না।

ধর্ম্মসাধনে সত্যতা

ধর্ম্মসাধন কিসে সত্য হয়, কিসে হয় না, তা কি একটি সঙ্কেত-বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব? যে-অবস্থায় মানবাত্মা একাকী স্বাধীন ও স্বায়ত্ত, যে-সাধনায় মানবাত্মা আপনাকে একক ও স্বতন্ত্র বলে অনুভব করে, সে-অবস্থা ও সে-সাধনা যতই উন্নত হোক না কেন, তা সত্য ধর্ম্মজীবন লাভের অবস্থা নয়, সত্য ধর্ম্মজীবন লাভের সাধনা নয়। দ্বিতীয় একজনের সম্মুখীন না হওয়া পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় একজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শাসিত ও শৃঙ্খলিত না হওয়া পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় একজনের প্রেমের দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মজীবন সত্য হ'তে পারে না। যে-ধ্যান ধারণা প্রভৃতিতে ঈশ্বর কেবল চিন্তার বস্তু মাত্র, সম্মুখে উপস্থিত দ্বিতীয় পুরুষ ন'ন তা'তে ধর্ম্মজীবন সত্য হয় না। যা শুধু subjective, তা দ্বারা ধর্ম্মজীবন সত্য হয় না।

সাধারণতঃ বলা হয়, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম—এই তিন বিষয় নিয়ে ধর্ম্মের ত্রিবিধ সাধন প্রাচীন কালে এই তিন বিষয়েই "সাধন" কথাটির অর্থ ছিল, গুরুপরম্পরা-নির্দ্দিষ্ট অথবা সাধন-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি

প্রণালী শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা করা ও নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করা। এরও মূল্য অল্প নয়। উপনিষদে যে একাত্মানুভূতির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সমগ্র বিশ্বজগতে ব্রহ্মের প্রকাশ দর্শন ক'রতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে শিক্ষাটি অতি মূল্যবান্। ভক্তিমার্গে পরমেশ্বরের মহিমা ঐশ্বর্য্য এবং আপনার দীনতা অকিঞ্চনতা অনুভব ক'রে নম্র ও বিনীত হতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করতে করতে অশ্রুপাত করতে, পুলকিত হতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে; সে শিক্ষাটিও অতি মূল্যবান্। গীতাতে সংসারের সকল কর্ম্ম নিষ্কাম হয়ে সম্পন্ন করতে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে; এ আদর্শটিও অতি মূল্যবান্। এ সকলের মূল্য আমরা অস্বীকার করি না। একাত্মানুভূতি, ধ্যান ধারণা, অশ্রু-কম্প-স্বেদ-পুলক-মূর্চ্ছা, নিষ্কাম কর্ম্ম, সবই ভাল। কিন্তু শুধু এ সকলের দ্বারাই ধর্ম্মজীবন সত্য হয়ে উঠে না। মানুষ যখন সেই পরম পুরুষের দ্বারা অধিকৃত হয়, তখনই তাহাতে সত্য ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয়।

হে মানব, সত্য ধর্ম্মজীবন চাও? তবে ভেবে দেখ, তিনি তোমাকে ধরেছেন কি না? তিনি কি তোমার কাছে দেখা দিয়ে তোমার হাতখানি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরেছেন? তাঁর সঙ্গে কি তোমার চক্ষে চক্ষে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে, এবং তিনি কি নিজ দৃষ্টির দ্বারা তোমাকে অধিকার করেছেন? Has He held you by His eyes? তাঁর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে মানুষ যখন আর একাকী থাকে না, স্বায়ত্ত থাকে না, স্ববশ থাকে না, যখন সে ঈশ্বরের জলন্ত সন্নিধানে বাস করে, তাঁহার দ্বারা ধৃত হয়ে জীবনধারণ করে, তখনই সে সত্য ধর্ম্মজীবনে জীবিত। সত্য ধর্ম্মজীবন যার মধ্যে আছে তার ছবিটি কিরূপ? প্রভুর সম্মুখস্থিত দাস যেরূপ,—a man before his

master ;—দাসের মন বুদ্ধি তার সমগ্র চেতনা তার দেহের সর্ব্বাঙ্গ, প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তিতার ভাবে অনুপ্রাণিত। তোমাতে কি সেই ভাব এসেছে? তা হলেই সত্য ধর্ম্মজীবন যে কি বস্তু, তা তুমি বুঝেছ; নতুবা নয়।

এখানে ধর্ম্মজীবনের যে ছবি অঙ্কিত করা হল, তাকে ঈশ্বরের সঙ্গে 'সম্বন্ধ' বলে বর্ণনা করা উচিত মনে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানুষকে সেই পরমপুরুষের সম্মুখে স্থাপন করেন, ও তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধে আবদ্ধ করে দেন। পরমপুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধই ধর্ম্ম শব্দের শ্রেষ্ঠ অর্থ। ধর্ম্মের যত বিভিন্ন অঙ্গ, তা এই সম্বন্ধেরই বিভিন্ন অঙ্গ মাত্র। এই ভাবে যিনি ধর্ম্মসাধন করেন, তাঁর জীবনে জ্ঞান ভাব কর্ম্ম সকলই সেই সম্বন্ধের অঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়।

স্কুলের ছাত্রেরা কখনও কখনও তাদের খাতায় দুই প্রকার বস্তুর পার্থক্যের বর্ণনা লিখবার জন্য পাতাটির মাঝখান দিয়ে খাড়া একটি রেখা টেনে তাকে দুই অংশে বিভক্ত করে। সেইরূপ, হে ধর্ম্মসাধক, তোমার অন্তরে দুই প্রকার সাধনার পার্থক্য বুঝবার জন্য একটি রেখা টেনে নাও। সেই রেখার বাঁ দিকে রাখ, ধ্যান ধারণা জপ তপ অর্চ্চনা বন্দনা; ডান দিকে রাখ, ঈশ্বরের কাছে বসে তাঁর ইচ্ছা অনুভব করা, তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা। ডান দিকে যা রাখলে, তার উপরেই তোমার ধর্ম্মজীবনের সত্যতা নির্ভর করে। যদি এই দিকটি তোমাতে দুর্ব্বল হয়, তবে তুমি চিন্তাবিলাসী ধ্যানবিলাসী অর্চ্চনাবিলাসী ভাববিলাসী কবিত্ববিলাসী হতে পার, কিন্তু ধর্ম্মজীবনের সত্যতার তুমি কি জানবে? আবার, যদি এই দিকটি তোমাতে সতেজ হয়, তবে তোমার চিন্তা ভাব ধ্যান ধারণা সঙ্গীত কবিত্ব সবই সার্থক; সবই তোমার ধর্ম্মজীবনের পুষ্টি সাধন করবে।

আদেশ ও নিষেধ বিষয়ে ঐকান্তিকতা

সেই পরমপুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধের আকারে ধর্ম্মকে সাধন করলে জীবনে একটি প্রবল ঐকান্তিকতার উদয় হয়। তাঁর ইচ্ছা পালনের জন্য অন্তরে একটি নিত্য-সজাগ নিত্য-উদ্যত ভাবের উদয় হয়। এই ব্যাকুলতা যেন মানুষকে ঈশ্বরের নিত্য আদেশ-ও-নিষেধের একটি জলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করে। তার মন তখন বলে, "হে প্রভু, আমায় পদে পদে বলে দাও আমি কি করব, কেমন ভাবে চলব।" হে সাধক, হে সেবক, হে তরুণ সেবার্থী, তোমাদের অন্তরে কি ঈশ্বরের আদেশ ও নিষেধ নিত্য শ্রবণের জন্য, তাঁর আদেশ ও নিষেধ নিরন্তর গ্রহণ ও পালনের জন্য সেই প্রবল ব্যাকুলতা জাগরিত আছে? "আমি কখন উঠ্‌ব, কখন কাজ আরম্ভ করব, কখন বিশ্রাম করব, আমার কর্ম্মস্থলে আমি কেমন ক'রে আমার কাজগুলি করব, কেমন ক'রে আমার কলমটি ধরব, আমি কেমন ক'রে মানুষের সঙ্গে কথাটি বলব, মানুষের প্রতি প্রত্যেক ব্যবহারটি করব, আমি গুরুজনের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, নারীর প্রতি কিরূপ দৃষ্টিপাত করব, আমি উপাসনাক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে অবসর-সময়ে ও আমোদের মুহূর্ত্তে আমার রসনাকে কি ভাবে চালিত করব,"—এ সব বিষয়ে কি তুমি অন্তরবাসী দেবতাকে নিত্য উপস্থিত প্রভুরূপে দেখতে ও নিত্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করে চলতে অভ্যাস করছো? তুমি কি নিত্য তাঁর আদেশবাণী ও নিষেধবাণী শুনতে চাও? তবেই সাধনের ঠিক পথটি ধরেছ, নতুবা নয়।

যে-ঈশ্বর কেবল পূজা নেন, ভাব ভক্তি গ্রহণ করেন, চিন্তা ও ধ্যানের বিষয়ীভূত হন, কিন্তু আদেশ দেন না, নিষেধও করেন না, যিনি উদ্যত হস্তকে, উদ্যত রসনাকে কখনও নিরস্ত করেন না, অনুদ্যত চরণকে

কখনও চলতে বাধ্য করেন না,—এমন মনঃকল্পিত ঈশ্বরের উপাসনা করে কখনও জীবন্ত জলন্ত সত্য ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায় না,—অন্যকে কিছু সাহায্য করা তো দূরের কথা।

ধর্ম্মজীবনের সত্যতা ও মানবসমাজ

ধর্ম্মজীবনের সত্যতার ভাবটি যখন একটি সমাজের বা একটি মণ্ডলীর অধিকাংশ মানুষে ব্যাপ্ত হয়, তখন সেই সমাজে বা মণ্ডলীতে তা নৈতিক ব্যাকুলতার (ethical earnestness-এর) আকারে আত্মপ্রকাশ করে। মানবসমাজে এই ব্যাকুলতা সঞ্চার করা ধর্ম্মের একটি বিশেষ কাজ। ধর্ম্মের এই কাজটিকে তার তত্ত্বজ্ঞান, তার পূজার প্রণালী ও তার মতসমষ্টি হতে পৃথক্ করে দেখা দরকার।

মানব-সমাজে ধর্ম্মের প্রধান মূল্য কি ? প্রধান মূল্য,—চরিত্র বিষয়ে, জীবনের বিশুদ্ধতা বিষয়ে, উন্নত আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে মানব-মনে একটি প্রবল আগ্রহ সঞ্চার করা ; মানুষকে সত্যের ন্যায়ের পবিত্রতার পথে দৃঢ় করা ; অসত্য অন্যায় ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হতে শেখানো। মানুষ পূজার মন্ত্র ও পূজার প্রণালী ঠিক ভাবে শিখুক কি না-ই শিখুক, সে তার অন্তরবাসী প্রভুর চরণে বসতে শিখুক ; অন্তরে তাঁর ইচ্ছা বুঝতে শিখুক ; সেই ইচ্ছাপালন বিষয়ে দৃঢ়চিত্ত হতে শিখুক। তত্ত্বজ্ঞানে ভুল হলে, পূজার মন্ত্রে ভুল হলে, এমন কি ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে ভুল হলেও তা ততো মারাত্মক নয়,—ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝে তা পালন না করার অভ্যাস, সত্য জেনে তার অনুসরণ করতে দ্বিধা, অপবিত্রতাকে সতেজে বর্জ্জন করবার উদ্যোগের ও সাহসের অভাব,—এ সকল যত মারাত্মক। এই নৈতিক ব্যাকুলতার ও নৈতিক দৃঢ়তার অভাবই ভারতের মানবকুলের ধর্ম্মজীবনকে চিন্তা ও ভাবমাত্রে অবসিত

করে রাখছে, ধর্ম্মজীবনকে সত্য হতে দিচ্ছে না। ইহাই ভারতে ধর্ম্মের প্রধান শত্রু। জনসমাজ হতে ইহাকে অপসারিত করবার জন্যই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মানবসমাজে এই নৈতিক ব্যাকুলতার একটি ফল,—আপেক্ষিক গুরুত্ববোধ। এই নৈতিক ব্যাকুলতা যার চরিত্রে নাই, সে প্রতিদিনই কর্ত্তব্য-সংশয়ে পতিত হয়। সে দেখে, জগতে প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেরই সমর্থনের জন্য কিছু না কিছু যুক্তি আছে; দ্বিধার মধ্যেই তাহার জীবন অতিক্রান্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু এই নৈতিক ব্যাকুলতা যার চরিত্রে আছে, সে সর্ব্বদা আপনাকে প্রশ্ন করে, কোন্ প্রয়োজনটি অধিক গুরুতর? কোন্ কর্ত্তব্যটির দাবী অধিক? জীবনে কোন্ বস্তুর জন্য কোন্ বস্তুটি ছাড়তে হবে? কোন্ বস্তুকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করতে হবে? সে দ্বিধার অবস্থাতেই কাল কাটায় না।

একজন প্রসিদ্ধ বক্তা ভারতের পুরাতন ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করতে গর্ব্ব সহকারে বলেছিলেন, সেই ব্রহ্মবাদ পতিতা নারীর মধ্যেও ব্রহ্মদর্শন করতে মানুষকে শিক্ষা দেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি পতিতা নারীর মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন করতেই মানুষকে আগে শিখাব, না, তার অপবিত্র সংস্পর্শ হতে মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টাটাই আগে করব? অভিনয় ছবি গান ও নাচের মধ্য দিয়ে আর্টের চর্চ্চাটাই দেশময় আগে ব্যাপ্ত করব, না, পবিত্রতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি ও সতর্কতার ভাব দেশময় আগে সঞ্চার করব? কোনটা আগে?

তৌলদণ্ডের দু'খানি পাল্লার উপরে মাধ্যাকর্ষণের প্রবল শক্তি নানা কার্য্য করে। তন্মধ্যে একটি এই যে, এক দিকের পাল্লার গুরুত্ব সামান্য পরিমাণে অধিক হলেই সে পাল্লাটি নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তেমনি এই নৈতিক ব্যাকুলতা যেন মাধ্যাকর্ষণের প্রবল শক্তির ন্যায় কার্য্য

ক'রে মানব-অন্তরকে একটি সূক্ষ্ম তৌলদণ্ডে পরিণত করে। সে তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয় কাহার গুরুত্ব অধিক। দুই বস্তু, দুই আদর্শ, দুই আহ্বান তার সম্মুখে উপস্থিত হলে সে তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করে যে কা'র জন্য কাহাকে ছাড়তে হবে।

মূর্ত্তিপূজা নিয়ে এ দেশে অনেক আলোচনা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এর ভিতরে যে একটি তত্ত্বের ও আর্টের দিক আছে, তা'তে সন্দেহ নাই। কিন্তু রামমোহন রায়ের প্রাণের ব্যাকুলতা তাঁকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল, যে-পূজা সত্যস্বরূপ চিন্ময় পরমেশ্বরকে অন্তরে ধারণ করবার পথে ও জীবনের প্রভুরূপে বরণ করবার পথে বাধাস্বরূপ, তাকে দেশের মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত কিনা? এক দিকে মানবাত্মার শাশ্বত কল্যাণ, অপর দিকে সাকার-তত্ত্ব অথবা আর্ট। কোন্ দিকের গুরুত্ব অধিক? এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে রামমোহন রায়ের বিলম্ব হল না। তিনি নিজের সমুদয় শক্তি সেই বাধার নিরসনে, সেই অকল্যাণের বিনাশে নিযুক্ত করলেন। তিনি বিলম্ব করতে পারলেন না; কিন্তু দেশের চিন্তাবিলাসী মানুষেরা এক শতাব্দী পরে আজও তত্ত্ব ও আর্টের দিক হতে মূর্ত্তিপূজার আলোচনা করছেন।

আশা

যার ধর্ম্মজীবন সত্য, তার মন নিত্য আশাশীল থাকে। জিজ্ঞাসা করি, কাহারও কি এরূপ মনে হচ্ছে যে ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে কোন ভবিষ্যৎ নাই? ইহার কাজ শেষ হয়ে গেছে? আমি তো ভাবি, যে-আদর্শ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে, তার শতাংশের একাংশ এখনও আয়ত্ত করা হয় নাই। "ব্রাহ্মসমাজ রাজনৈতিক আন্দোলনে অবতীর্ণ হচ্ছে না; এর ফল এই হবে যে, স্বরাজ লাভ হলে ব্রাহ্মদিগকে

আর কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা করবে না”,—এই আশঙ্কা যেন অনেক ব্রাহ্মের মনে রয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, স্বরাজ আয়ত্ত হলে কি আর উন্নত মনের, অটল চরিত্রের, অনমনীয় সত্যপরায়ণতার, অক্ষয় সাধুতার প্রয়োজন থাকবে না? ঐ সকলের সাধনে কি মানুষকে তখন আর নিযুক্ত হতে হবে না? বিধাতার চিরন্তন বিধি কি তখন উল্টে যাবে? হে ভীরু ব্রাহ্ম, যদি বাইরের চিহ্ন দেখে তোমার মনে ঐরূপ আশঙ্কাই হয়, তবে বুঝে নিও, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ও দেশের ইতিহাসে এমন এক যুগ উপস্থিত, যে-যুগে আদর্শরক্ষা ধর্ম্মরক্ষা চরিত্ররক্ষার জন্য দলে দলে অনাহারে মরে গিয়েই ব্রাহ্মসমাজ স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করবেন; যে যুগে মরে যাওয়াই ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে সতেজ জীবনে জীবিত থাকার সমান।—না! না! ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরায় নাই! মহৎ ভাবে মরে যাওয়াও একটি বড় কাজ; সে কাজের ডাক আসতে পারে। তজ্জন্য প্রস্তুত থাক ও মানুষকে প্রস্তুত কর, যে কয়জন বিশ্বাসী আছ! যখন বিপরীত বাতাস বয়, নৌকা চালান অসম্ভব হয়, তখন বার বার নৌকা বাঁধবার খুঁটিটিকে মজবুত করতে হয়। যদি অন্য কোন কাজে অগ্রসর হওয়া ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এখন সত্য সত্যই অসম্ভব হয়ে থাকে তবে বার বার বিশ্বাসের খুঁটিটি শক্ত কর। ইহাই এখন কাজ!

মার্জ্জিত সুখ-সেবা, আত্মতৃপ্তি ও প্রদর্শনের ভাব হতে মুক্ত হয়ে, ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণের দ্বারা আমরা আমাদের ধর্ম্মজীবনকে সত্য করে নি এবং আশাশীল হয়ে এই সত্যধর্ম্মের সাধন ও প্রচার করি।

১২ই মাঘ, ১৩৩১

কেন্দ্র ও পরিধি

উপনিষদের কোন কোন অতি পবিত্র ও অতি অমৃতময় অংশের নাম 'মধুবিদ্যা'। এই নামটির মধ্যে 'মধু' শব্দের একটি গূঢ় অর্থ আছে। যেখানে দেখা যায়, এক বস্তু আর এক বস্তুর সাপেক্ষ, একটিকে ছেড়ে আর একটি থাকতে পারে না, উভয়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, সেখানে ঋষিগণ উভয়ের সেই সম্বন্ধকে 'মধু' নামে অভিহিত করেছেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধুবিদ্যাতে একটি চমৎকার গদ্য মন্ত্র আছে। তা'তে পরমাত্মাকে রথচক্রের নাভি ও নেমি, অর্থাৎ কেন্দ্র ও পরিধি, উভয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চক্রের 'অর'-গুলি, অর্থাৎ লম্বা লম্বা কাঠগুলি কি রূপে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে? চক্রের আবর্ত্তনের ফলে তারা যে খুলে যায় না, খ'সে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে না, তার কারণ কি? কারণ এই যে, চক্রের কেন্দ্র ও পরিধি উভয়ই তাদের বেঁধে রাখে, কেন্দ্র ও পরিধি উভয়ের মধ্যে তারা অর্পিত, তাই তারা স্থির থাকে। তেমনি, সমুদয় জীবগণ, সমুদয় দেবগণ, সমুদয় লোক লোকান্তর, সকল প্রাণ, সকল আত্মা,—ইহারা কিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে? কে সেই পরিধি, কে সেই কেন্দ্র যাঁর বাঁধনে ইহারা স্থির আছে? ঋষি বলেছেন, সেই পরমাত্মা একাধারে বিশ্বচক্রের কেন্দ্র ও পরিধি। তাঁহাতেই সকলে 'অর্পিত' অর্থাৎ প্রবিষ্ট, সংলগ্ন ও বিধৃত; তাই বিশ্বজগৎ স্থির আছে।

সেই পরমাত্মা একাধারে কেন্দ্র ও পরিধি। কি চমৎকার কথা! ঋষিদের ধ্যানলব্ধ মননলব্ধ এক একটি ইঙ্গিতের মধ্যে কত গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলতেন, "এক একটি উপনিষদ্-মন্ত্রের

মধ্যে আমি যেন অতল সমুদ্র দেখতে পাই।" এই পরিধি ও কেন্দ্রের সম্বন্ধ বিষয়ে আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি গভীর চিন্তাপূর্ণ উপদেশ আছে।

সেই পরম পুরুষ কিরূপে বিশ্বকে ধারণ করেন, তা প্রকাশ করতে গিয়ে উপনিষদ্‌কার ঋষি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রটি রচনা করেছেন। সেই ভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাই, তাঁর কাজ যেন এক হ'য়েও বহু বিচিত্রকে আপনার মধ্যে ধারণ করা। চক্রের পরিধিতে কত বিচিত্রতা, কিন্তু কেন্দ্রে একতা। একটি চক্রের উর্দ্ধতম বিন্দু ও ভূ-সংলগ্ন বিন্দু পরস্পরের বিপরীত স্থানে অবস্থিত; তেমনি, সর্ব্বাপেক্ষা সম্মুখের ও সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাতের বিন্দুদ্বয় পরস্পরের বিপরীত স্থানে অবস্থিত। কিন্তু অর-সকলের দ্বারা এক কেন্দ্রের সঙ্গে সকলেই যুক্ত। কেন্দ্রে যেন সকল বিচিত্রের মধ্যে একতা; কেন্দ্র যেন একা এত বিপরীত বস্তুকে আপনার মধ্যে ধারণ করে রয়েছে।

দুইটি ক্ষেত্রে আমরা পরিধি ও কেন্দ্রের সম্বন্ধকে দেখে তার আলোচনা করব। প্রথম, ঈশ্বরের স্বরূপে ও ধর্ম্মের সাধনে; দ্বিতীয়, ধর্ম্মসমাজে।

ঈশ্বরের স্বরূপে ও ধর্ম্মের সাধনে

একবার স্বরূপ-চক্রের কথা চিন্তা করা যাক। ব্রহ্মস্বরূপের এক বিন্দুতে এসে মনে হয়, তিনি নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প। কোনও পরিবর্ত্তনে কোনও ঘটনায় তিনি আন্দোলিত হন না; তিনি পরিবর্ত্তিত হন না। বেদান্ত যেন এই ভূমি হ'তে ব্রহ্মস্বরূপকে দেখেছিলেন। আবার, এর বিপরীত বিন্দুতে দণ্ডায়মান হয়ে ভক্তেরা দেখেছেন, তিনি প্রেমে ব্যাকুল; তিনি আমাদের সুখে সুখী, আমাদের ব্যথায় ব্যথী। বিশেষতঃ

যীশু দেখলেন, ঈশ্বর পাপীর ক্রন্দনে এত ব্যাকুল যে তিনি পাপীকে খুঁজতে বাহির হন। তিনি ৯৯টি সাধুকে অপেক্ষা করিয়ে একটি পথভ্রষ্টের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে বাহির হন।

ব্রহ্মস্বরূপের এক বিন্দু হ'তে মনে হয়, তিনি শান্ত সমাহিত, চির মৌনী, চির স্থির। আমাদের ব্রহ্মসঙ্গীতে "শান্ত"-স্বরূপ-প্রকাশক এই ভাবের কত কথা আছে! আবার এর বিপরীত বিন্দুতে গিয়ে দেখা যায়, তিনি আমাদের ধর্ম্মযুদ্ধে সেনাপতি। তিনি জনগণমন-অধিনায়ক। তিনি মানব-মনকে অগ্রগতি দান করেন। স্বয়ং তিনি অগ্রে অগ্রে চলেন ও আমাদের চালান। বাইবেল-এ এই ভাবে ঈশ্বরকে God of Israel বলা হয়েছে। মহাভারতে এই ভাবে বলা হয়েছে, "জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।"

স্বরূপ-চক্রের এক বিন্দুতে তিনি আনন্দস্বরূপ; বিপরীত বিন্দুতে তিনি রুদ্র। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের যে প্রার্থনাটি আমরা আমাদের সাধারণ প্রার্থনায় গ্রহণ করেছি ('রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্') তার ভিতরে এই দুই রূপের কথা আছে। রুদ্রোপাসকেরা ঋগ্বেদের 'রুদ্র' দেবতাকে ক্রমশঃ যজুর্বেদে বিশ্বের এক দেবতায় পরিণত করলেন। তারপর তাঁরা সেই দেবতাকে উপনিষদের আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখতে লাগলেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ঋষি বলছেন, "যে তোমাকে পূর্ব্বে একদিন আমি পুরাতন রুদ্ররূপে দেখেছিলাম, সেই তুমি আজ আমাকে উপনিষদ-বেদ্য নূতন-রূপে (আনন্দ ও অমৃতরূপে) দেখা দাও।" 'দক্ষিণ মুখ' কথাটির ভিতরে এতখানি অর্থ রয়েছে। ঋষি এখানে স্বরূপ-চক্রের দুই বিপরীত বিন্দুতে, আনন্দ ও রুদ্র উভয় স্বরূপে, যুগপৎ দৃষ্টিপাত করেছেন। ব্রাহ্মসমাজে আমরা ঈশ্বরের রুদ্রস্বরূপটি প্রায়ই বাদ দিয়ে যাই। কিন্তু সে স্বরূপটিও অতি

সত্য। আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে আমার জীবনে আমি ঈশ্বরের রুদ্র মুখ দেখেছি।

তিনি এক হয়ে এই বিভিন্ন ও আপাত-বিপরীত স্বরূপ সকলকে আপনার মধ্যে ধারণ করে রয়েছেন। আবার জগতের দিকে চেয়ে দেখি, পরিধিতে তাঁর বিচিত্র সৃষ্টি, কেন্দ্রে তিনি স্রষ্টা। তাঁর সেই সৃষ্টি-লীলায় কি চমৎকার বিচিত্রতা! "কিরূপে তোমা হ'তে এত বিচিত্রতা সম্ভবে," মানব-মনের এ একটী চিরদিনের বিস্ময়, একটী যুগযুগান্তের প্রশ্ন। বৈষ্ণব-সাধন-তত্ত্বের মধ্যে "মুরলী শিক্ষা" নাম দিয়ে এই প্রশ্নটীর আলোচনা করা হয়েছে। জীবাত্মা (রাধা) পরমাত্মাকে (কৃষ্ণকে) প্রশ্ন করছেন, "তুমি কেমন করে এমন বিচিত্র জগৎ রচনা কর? তুমি সে কি-সুর বাজাও যাতে ফুল ফোটে, নদী ছোটে, বাতাস বয়? যাতে কোকিল পঞ্চম স্বরে ও ময়ুর কেকা শব্দে গান গায়? যাতে পৃথিবীতে ষড়-ঋতু এক কালে উদয় হয়? যাতে আমার মন এমন মুগ্ধ হয়? বল, প্রভু, সে কি সুর?" ভগবান তার উত্তরে বলছেন, "আমার বাঁশীতে আর কিছু বাজে না; কেবল একটী মাত্র ধ্বনি বাজে। তা' এই যে, তুমি আমার, আমি তোমাকে চাই।"

কি চমৎকার কথা! বিশ্বের পরিধিতে যে এত বিচিত্রতা, এত সৌন্দর্য্য, তার কেন্দ্র স্থলে আছে ভগবানের প্রেম: আছে জীবাত্মার প্রতি তাঁর প্রেমের আহ্বান!

মানব-জ্ঞান যেন পরিধিতে ঘুরে ঘুরে সামঞ্জস্য বিধান করতে ব্যস্ত। "এই নিয়মের (law-র) সঙ্গে ঐ নিয়মের সামঞ্জস্য কোথায়? এই তত্ত্বের সঙ্গে ঐ তত্ত্বের বিরোধ কি ক'রে মেটানো যায়? আমি কি তা জানতে পারবো?" রহস্যময় অসীম যেন মানব-জ্ঞানকে একটী একটী ক'রে ইঙ্গিত দিয়ে দেন। যুগে যুগে তাই নিয়ে মানব-জ্ঞান সামঞ্জস্য

বিধান করতে থাকে। যুগে যুগে জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের নিয়মগুলি এক একটী বিশালতর নিয়মের অন্তর্গত বলে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু প্রেম যেন একেবারে কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। স্বরূপচক্রের কেন্দ্রস্থলে কি আছে? আছে,—তিনি পরম পুরুষ, তিনি প্রেমময়, তিনি আমাদের ভালবাসেন, তিনি আমাদের চান। প্রেম সোজা কেন্দ্র পর্য্যন্ত চ'লে গিয়ে এটুকুর সন্ধান পায়।

ভক্তেরা ভগবানের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধের বিচিত্রতাতেও বিস্মিত হন। তুমি আমার কে হও? তোমায় কি বলে ডাকব? তুমি কি আমার পিতা? তুমি কি মাতা? প্রভু, ভক্ত, সখা,? সম্বন্ধচক্রের পরিধিতে এইরূপ কত নাম; কত ডাকে তাঁকে ডাকা হয়। কেন্দ্রস্থলে আছে একটী মাত্র অনুভূতি,—"তুমি আমার, আমি তোমার।" এই সত্যটী আমাদের ব্রহ্মসঙ্গীতে ("কে তুমি কাছে ব'সে থাক সর্ব্বদা আমার") কেমন চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে ভক্ত গেয়েছেন—"যে হও, সে হও তুমি, তুমি আমার, আমি তোমার।"

তেমনি সাধনচক্রের পরিধিতে কত বিচিত্রতা! তার এক বিন্দুতে উপনিষদের শান্ত ভাব, তদ্বিপরীত বিন্দুতে ভাগবত-ধর্ম্মের প্রগল্‌ভা ভক্তি। এক বিন্দুতে ভারতীয় ধ্যানপরায়ণতা, বিপরীত বিন্দুতে খ্রীষ্টীয় কর্ম্মশীলতা। একদিকে হিন্দুজাতির স্বভাব,—concrete-এ শ্রদ্ধা, মূর্ত্ত বস্তুতে প্রীতি। অপর দিকে মুসলমানের বিশেষত্ব.—জড়রূপে একান্ত বিরাগ। হিন্দুর মন জড় জগতে অসংখ্য "তীর্থ" দেখতে চায়; প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যেখানে বিশেষভাবে প্রকাশিত, সেখানেই তাঁর তীর্থ ও মন্দির। সে মানবজগতে অসংখ্য দেবাত্মা স্বীকার করতে চায় ও তাঁদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ মাহাত্ম্য মনে মনে ধ্যান ক'রে সুখী হয়। মুসলমানের মন দেবমূর্ত্তি ও মানুষের

মূর্ত্তি উভয়কে সমভাবে ত্যাগ করে ; নিষ্ঠাবান মুসলমান ব্যবসায়ীরা ছবি ও পুতুল বিক্রয় পর্য্যন্ত করেন না। একদিকে দেখি, উপনিষদের আদর্শ মানুষ হচ্ছেন, "বিদ্বান্" অর্থাৎ যিনি সাধনের দ্বারা জ্ঞান লাভ করেছেন, যিনি ব্রহ্মকে জানেন। অপর দিকে দেখি, যীশুর স্বর্গরাজ্যের আদর্শ মানুষ হচ্ছেন শিশুস্বভাব-সম্পন্ন লোকেরা। তিনি শিশুদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "স্বর্গরাজ্য ইহাদের সদৃশ মানুষের দ্বারাই পরিপূর্ণ।" সাধনচক্রের একদিকে যোগীরা বলচেন, "ঈশ্বরকে আত্মার পরমাত্মা-রূপে দর্শন কর।" অপর দিকে প্রেমিক ভক্তেরা ঈশ্বরকে জগদ্ব্যাপারে দেখবার জন্য মানব-মনকে আহ্বান করেন। ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত ও আচার্য্য শিবনাথ একবার একসঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন। দেখা গেল, একটী বাছুর মাতার স্তন্যপান করছে, গরুটী বাছুরের গা চেটে দিচ্ছে। গুপ্ত মহাশয় বলে উঠলেন, "দেখুন, দেখুন শিবনাথবাবু, মাতা কেবল সন্তানের ক্ষুধা নিবারণ ক'রেই তৃপ্ত নন ; তার উপর আবার গা চেটে দিয়ে নিজের আহ্লাদটীও জানানো চাই।" একদলের মতে ঈশ্বরের দর্শন-ভূমি মানব-অন্তরে। অপর দলের মতে সে দর্শন-ভূমি বহির্জগতে। সাধনচক্রের এক বিন্দুতে ত্যাগী তপস্বিগণ : তদ্বিপরীত বিন্দুতে প্রেমিক গৃহস্থগণ। আমরা ত্যাগকে সম্মান করি, ত্যাগীকে শ্রদ্ধা অর্পণ করি। অপর দিকে, যে প্রেমিক ভালবাসায় আত্মহারা, যিনি সংসারে থেকেই সকলকে ভালবাসেন, প্রেমের স্নিগ্ধ স্পর্শ দিয়ে সকলকে তৃপ্ত করেন এবং সেবা দিয়ে সকলকে সাহায্য করেন, তাঁকে দেখে আমরা কেমন মুগ্ধ হই ; "অনুরাগী প্রেম-বৈরাগীকে" দেখে আমরা কেমন মুগ্ধ হই !

সাধনচক্রের পরিধিতে এইরূপ কতই বিচিত্রতা ! এই বিচিত্রতাতে মানুষ অনেক সময়ে বিরোধ কল্পনা করে। কিন্তু কেন্দ্রস্থলে সেই এক জ্ঞানময় প্রেমময় আনন্দময় পরম পুরুষ র'য়েছেন। তিনি আপনার

সঙ্গে সকলকে বেঁধে রেখেছেন। তাঁর স্বরূপে অনন্ত বিচিত্রতা, জীবের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ, তাতেও অনন্ত বিচিত্রতা; তাই সাধন-রাজ্যেও এই বিচিত্রতা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি আপনি সব সাধককে আপনার প্রেমে বেঁধে রেখেছেন। তিনি শুধু আপনার প্রেম-উৎস হ'তে বিশ্বে প্রেম বিতরণ ক'রেই সুখী নন; বিশ্বে এত বিচিত্রতা না থাক্‌লেও তো তাঁর প্রেম বিলানো সম্ভব হ'ত। কিন্তু তিনি প্রেম দেখতেও ভালবাসেন। তাই বিশ্বে এত বিচিত্রতা; বিচিত্রতা না হ'লে আমাদের প্রেম খেলতে পায় না যে! মানুষে মানুষে এত বিচিত্রতার আয়োজন করেই তিনি সংসারে এত প্রকারের প্রেম-সম্বন্ধ দিয়ে মানব-সংসারকে খচিত করেছেন। আবার সেই জন্যই সাধন-রাজ্যেও এত বিচিত্রতা; নইলে তাঁর এত রূপ, তাঁর এত রস, মানুষ নিজ অন্তরে ধরতো কি ক'রে? তিনি সাধন-রাজ্যের সকল সাধককে পরস্পরের সঙ্গে এবং আপনার সঙ্গে প্রেমে মিলিত ক'রতে চান। শান্ত যোগী ও প্রগল্‌ভ ভক্ত, মূর্ত্তে ও অমূর্ত্তে আস্থাবান উপাসক, বিদ্বান্‌ ও শিশু, আত্মদর্শী ও জগৎদর্শী, ত্যাগী ও প্রেমিক,—সকলকে তিনি আপনার সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে যেন একটী পদ্ম রচনা করতে চান। পশ্চিমের ভক্ত গুলাল্‌ বলেছিলেন, "দল দল মিলিত আজ সাধ-সঙ্গত করৈ; ফুল ফুলৈ; ভঁবর ব্রহ্ম আয়া। কহে গুলাল, সো সাহিব ভঁবর ভয়া, ডুব ভক্ত-কমলমেঁ তৃপ্তি পায়া।" অর্থাৎ, "সাধকেরা নানা শ্রেণীর; তাঁরা দলে দলে মিলিত হ'য়ে চমৎকার একটী ফুল রচনা করেছেন। সেই প্রস্ফুটিত ফুলে ব্রহ্ম-ভ্রমর এসেছেন। কবি গুলাল বলেন, এইরূপ বিভিন্ন সাধক-রচিত যে ভক্ত-কমল, তাহাতে মগ্ন হয়ে স্বামী বড় তৃপ্তি লাভ করেন, ভ্রমর যেমন প্রস্ফুটিত বহুদল পুষ্পে বড় তৃপ্তির সহিত উপবেশন করে।"

ধর্ম্মসমাজে

আমরা সমাজকে প্রায়ই জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে থাকি। দেহের পরিধিতে আছে হস্তপদ ও হস্তপদের অঙ্গুলি এবং ত্বক। হস্তপদ দেহের কাজগুলি সম্পন্ন করে; ত্বক্ তার রক্ত মাংসকে বেঁধে রাখে, আগ্‌লে রাখে। দেহের কেন্দ্রস্থলে আছে হৃৎপিণ্ড যা সমগ্র দেহে তাজা রক্তকে সঞ্চালিত করে। রক্তধারা দেহের কেন্দ্র হতে পরিধি পর্য্যন্ত ধাবিত হয়ে যায়, আবার পরিধি হতে কেন্দ্রে ফিরে আসে। এইরূপে সমগ্র দেহে ঘন ঘন রক্ত যায় আর আসে, আসে আর যায়; নতুবা দেহের স্বাস্থ্য তেজ স্ফূর্ত্তি বজায় থাকে না।

ধর্ম্মসমাজেও পরিধি ও কেন্দ্র আছে। প্রচার, সমাজ-সংস্কার, জনসেবা, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন, সাহিত্য সৃষ্টি, শিক্ষা বিস্তার,—এ সমুদয় ধর্ম্মসমাজের কার্য্যগত জীবনের প্রকাশ। ধর্ম্মসমাজের হস্তপদ এই সমুদয় কার্য্য করে; এ সব যেন ধর্ম্মসমাজের পরিধির বস্তু।

দেহের হস্তপদে হৃৎপিণ্ড যেমন রক্ত সঞ্চালিত করে, তেমনি ধর্ম্ম-সমাজের কেন্দ্রস্থলে এমন কিছু থাকা চাই, যা তার সমুদয় কর্ম্মের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবে। কেন্দ্রস্থ সেই বস্তুটী কি? তা ব্রহ্মপ্রেমে ও পরস্পরের প্রেমে অনুপ্রাণিত একটী মণ্ডলী। ধর্ম্মসমাজের কেন্দ্রস্থলে যাঁরাই থাকুন না কেন, ধর্ম্মসমাজের আধ্যাত্মিক কি বৈষয়িক, যে-কোন কর্ম্মভার যে-কোন দলের হাতেই ন্যস্ত থাকুক না কেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রেমে ও পরস্পরের প্রেমে অভিষিক্ত একটী প্রগাঢ় মণ্ডলীর ভাব ধারণ করতে হবে। তাঁহাদিগকে সমাজদেহের হৃৎপিণ্ড হতে হবে, নতুবা ধর্ম্মসমাজ তাজা থাকতে পারে না।

হৃৎপিণ্ড ও সমগ্র দেহের মধ্যে যদি রক্ত যায় আর আসে, তবে দেহ

তাজা থাকে। তেমনি একদিকে কেন্দ্রস্থ ঐরূপ মণ্ডলী হ'তে ধর্ম্ম-রক্ত সমাজ-দেহে ও সমুদয় কর্ম্মে সঞ্চারিত হওয়া চাই ; কাজগুলি ধর্ম্মভাবে, প্রেমে, অনুপ্রাণনে, ব্রহ্মের জীবন্ত সংস্পর্শে তাজা হওয়া চাই। আবার কাজগুলি হতে কেন্দ্রস্থ মণ্ডলীতে এমন অনুপ্রাণন-স্রোত আসা চাই যে তাঁহারা প্রতিদিন সেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন ক'রে প্রতিদিন সেই সকল কর্ম্মের সংবাদে ও স্মরণে সতেজ ও প্রাণবান্ হবেন। এই হ'ল সমাজ-দেহে রক্তের আসা-যাওয়া ; প্রাণবান্ ধর্ম্মসমাজে এম্‌নি ক'রে রক্ত চলাচল হয়।

প্রাণবান সমাজের লক্ষণ

তাজা রক্ত যার দেহে আছে, সে-মানুষের মুখ চোখ দেখেই তা বুঝতে পারা যায়। তাজা প্রেম যে বাড়ীতে আছে, সে বাড়ীর লোকগুলির পরস্পরের দিকে তাকানো দেখেই তা বুঝতে পারা যায়। তাজা অধ্যাত্ম-রক্ত যে সমাজে প্রবাহিত আছে, সে-সমাজের সব কাজে কর্ম্মে, সব কথায় আলাপে, তার লক্ষণ সকল দেখতে পাওয়া যায়।

সুস্থ মানব দেহের যে লক্ষণটী প্রথমেই সকলের চোখে পড়ে, তা তার আনন্দ, তেজ ও স্ফূর্ত্তি। দেহটী যে সুস্থ, তা তার কাজে কর্ম্মে, আকার-ইঙ্গিতে, চলা-ফেরায় সর্ব্বদা প্রকাশ পায়। প্রাণবান সমাজ-দেহেও তেমনি সর্ব্বদা একটী কৃতজ্ঞতা, প্রফুল্লতা ও আনন্দের আভা বিদ্যমান থাকে। ব্রাহ্মদের ভাব দেখে কি মানুষ ইহা অনুভব করে যে তাঁদের ধর্ম্মটী আনন্দময়! তাঁদের ধর্ম্ম কি তাঁদের মুখে হাসি, মনে কৃতজ্ঞতা ও উৎসাহ এবং সমুদয় আকার-ইঙ্গিতে একটী প্রসন্ন আনন্দের শোভা সঞ্চার করছে? যদি ব্রাহ্মসমাজে তার বিপরীত ভাব দেখা যায়, তবে আমরা মানুষকে যতই ডাকি না কেন, যতই টানাটানি

করি না কেন, কেহ আমাদের কাছে আসবে না। যে-ধর্ম্ম আমাদের মুখে হাসি এনে দিতে পারে না, জীবনে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সুর এনে দিতে পারে না, মানুষ আমাদের দেখে সে-ধর্ম্ম কখনও গ্রহণ করবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি আনন্দের ধর্ম্ম নয়? জগতে আর সব ধর্ম্মে মিষ্টতা আছে, আর এ ধর্ম্মই কি শুধু শুষ্ক ও নীরস? ব্রাহ্মদের উপাসনা কি স্বাদহীন? ব্রাহ্মদের মন্দির ও মন্দিরের উপাসনা কি মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে না? আমরা তবে ধর্ম্মকে জগতের কাছে কি আকারে ধরছি? আমরা কি জগতের কাছে অমৃত পরিবেশন করছি, না শুষ্ক নীরস বস্তু পরিবেশন করছি। জগৎ যে মিষ্ট বস্তু চায়! ধর্ম্ম যে চাখ্‌বার জিনিস! জগৎ যে ধর্ম্মকে চেখে দেখতে চায় যে ইহা মিষ্ট কিনা। যদি ব্রাহ্মসমাজে এসে পৃথিবীর মানুষ চেখে দেখে যায় যে, এদের ধর্ম্মে কিছু মিষ্টতা নেই, তবে আর তারা আসবে কেন? যাদ তারা আমাদের মুখ দেখে বুঝে যায় যে, আমরাই আমাদের ধর্ম্মকে মিষ্ট বলে আস্বাদন করছি না, তবে আমাদের কাছে তারা আর আসবে কেন? একজন লোক আখ খাচ্ছে, আর একজন শুধু আখের ছিব্‌ড়া চিবাচ্ছে। সেই দুইজনের মুখের ভাবে কত তফাৎ! আমাদের মুখ দেখে কি বোঝা যায়? আমরা কি কিছু রস পাচ্ছি! না শুধু ছিব্‌ড়া চিবাচ্ছি?

ধর্ম্ম মধুময়, ধর্ম্ম অমৃতময়। যে-মানুষ যে-দল ধর্ম্মকে শুষ্ক বলে প্রকাশ করে, তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে libel (অসম্মানজনক উক্তি) প্রচার করে। হাফিজ একদিন তাঁর নিন্দাকারীদের বলেছিলেন, "তোমরা যে বল, সৌন্দর্য্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আরো অনেক কিছু আছে, তার উত্তরে আমি বলি, আমার সখাতে সে-সবও আছে।" ঠিক তেমনি করে আমাদের বলতে হবে, "উন্নত নীতি, পবিত্রতা, তেজ, বীর্য্য, নির্ভীকতা,—ধর্ম্মের এ সকল দৃঢ়তার ভাব আমাদের ধর্ম্মে পূর্ণ

মাত্রায় আছে; আবার ধর্ম্মের কোমলতা ও মাধুর্য্যের ভাব, ধর্ম্মের যত অমৃতময় স্বাদ, তাও আমাদের ধর্ম্মে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে।" আমাদের বলতে হবে, "জগতে যে কোন দেশে, যে কোন যুগে, যে কোন ধর্ম্মে যত অমৃতরস উৎসারিত হয়েছে, সবই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে। হে জগৎ, এস, তাহা পান কর, তৃপ্ত হও; দেখ, আমরাও তা পান ক'রে আনন্দে পূর্ণ হয়েছি।"

সুস্থ মানব দেহের দ্বিতীয় একটী লক্ষণ—বিচিত্রতা; তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিচিত্রতা, তার খাদ্য পানীয়ের বিচিত্রতা, তার আত্মপ্রকাশের বিচিত্রতা। এই বিচিত্রতার ফলেই সুস্থ মানব-দেহের জীবনলীলায় নিত্য সরস ও নিত্য সতেজ ভাব দেখতে পাওয়া যায়। যা একঘেয়ে, যা বাসি, সুস্থ দেহের পক্ষে তা প্রীতিকর হয় না। মানুষের খাদ্যে কত বিভিন্ন প্রকারের উপাদান থাকে, এবং সুস্থ মানুষ আপনার খাদ্যকে কত বিভিন্ন আকারে প্রস্তুত করিয়ে নেয়। বিচিত্রতাতেই তার আনন্দ ও তৃপ্তি। সুস্থ মানব দেহ কখনও শ্রমে নিযুক্ত, কখনও বিশ্রামের অবস্থায় অবস্থিত। সে কখনও বা চক্ষুকে, কখনও বা কর্ণকে, কখনও বা ঘ্রাণকে, কখনও বা হস্তপদকে ব্যবহার করে। এইরূপ ব্যবহারের বিচিত্রতার দ্বারা মানুষ নিজের দেহকে সর্ব্বদা সতেজ রাখে।

প্রাণবান ধর্ম্মসমাজেও এই লক্ষণ। প্রাণবান ধর্ম্মসমাজের উপাসনায় নিত্য বিচিত্রতা ও সরসতা, কর্ম্মে নিত্য বিচিত্রতা ও সরসতা, প্রসঙ্গে আলাপে, সামাজিক সম্মিলনে নিত্য বিচিত্রতা ও সরসতা দেখতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর যে আমাদের কাছে প্রকাশিত হন, তিনি যে আমাদের নিয়ে লীলা করেন, তাঁর সে প্রকাশ, তাঁর সে লীলা নিত্য সরস ও নিত্য নবীন। ভগবানের সম্বন্ধে যদি কোন কথা সত্য হয়, তবে এই কথা সত্য যে তিনি নিত্য সরস ও নিত্য নবীন। তাঁর মধ্যে একঘেয়ে ভাব কোন

দিকে নাই। তথাপি আমরা যে আমাদের ধর্ম্মকে ও উপাসনাকে নীরস করে ফেলি, আমাদের মুখে যে তাঁর কথা বাসি (stale) বলে মনে হয়, তার কারণ এই যে আমরা বিচিত্রতার সাধনে অভ্যস্ত হই না। পরমেশ্বর কখনও নীরস হন না। তাঁর ধর্ম্মও বিস্বাদ জিনিষ নয়। কিন্তু আমরাই হয়ে পড়ি একঘেয়ে, ছাতাপড়া, বাসি মানুষ। আমরাই তাঁর ধর্ম্মকে জগতের কাছে প্রকাশ করবার যোগ্য থাকি না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, আমাদের অনুষ্ঠানে উৎসবে চির-বিচিত্র, চির-সুন্দর, চির-সরস, চির-নবীন ঈশ্বরের বিচিত্র স্পর্শের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বয়স্কের জন্মদিনে আমরা যে উপাসনা করি, শিশুদের জন্মদিনেও ঠিক সেই উপাসনাই করি। কেন এই একঘেয়ে ভাব? ভগবান বয়স্কদের জন্য যা, শিশুদের জন্যও কি তাই? কখনও নয়। আমরা তাঁর নিত্য বিচিত্রতার সঙ্গে যোগ রেখে আপন জীবনকে বিকাশ করতে শিখি না, তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা, এই একঘেয়ে ভাব। এই কথাটী আরও একদিক দিয়ে দেখা দরকার। নিজের মত, নিজের রুচি, নিজের প্রকৃতি, নিজের ছাঁচ (type)-এ সকলের দ্বারা আমাদের মনগুলি কি একান্ত ভাবে বেষ্টিত ও আবদ্ধ হয়ে রয়েছে? অন্য ছাঁচের মানুষের সঙ্গে কিছুতেই আমাদের মিশ খায় না, বন্ধুতা হয় না, আত্মীয়তা হয় না,—আমাদের স্বভাব কি এই প্রকার হয়ে গিয়েছে? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে আমরা সত্যস্বরূপের উপাসক নই। সত্যস্বরূপের প্রত্যেক উপাসককে বহুভাবাপন্ন মানুষ হতে হয়। জ্ঞানী তাঁর বন্ধু, কর্ম্মী তাঁর বন্ধু, যোগী ধ্যানী তাঁর বন্ধু, প্রমত্ত ভক্তও তাঁর বন্ধু। হিন্দু সাধক তাঁর বন্ধু, মুসলমান ভক্ত তাঁর বন্ধু, বিশ্বাসী খ্রীষ্টান তাঁর বন্ধু। ফুল তাঁর বন্ধু, গাছ তাঁর বন্ধু, পাহাড় নদী সাগর তাঁর বন্ধু, আকাশের তারা

তাঁর বন্ধু। তাঁর অন্তর হতে জগতের ও মানবের সঙ্গে যোগ-বন্ধনের এত তন্তু চারিদিকে প্রসারিত হয়, তাঁর জীবনে স্বাদ গ্রহণের শক্তি এমন বিকশিত হয় যে, তাঁকে যে অবস্থায়, যে কাজে, যে দলে ফেলে রাখ, তাতেই তিনি নিত্য সরস থাকতে পারেন।

এই বহুভাবাপন্নতা একটী সাধন করবার বস্তু। ইহা সাধন করতে হলে প্রথমতঃ আত্মশাসন ও সংযম চাই। "নিজের মনের মতন মানুষটী না হলেই তাঁর সঙ্গে আমার বিরোধ হবে",—এই যার মনের ভাব, সে ধর্ম্মসমাজের কেন্দ্রস্থলে থাকবার যোগ্য মানুষ নয়। সে আগে শিক্ষা ও সংযমের (discipline ও training-এর) দ্বারা নিজের প্রকৃতির খোঁচাগুলিকে (angularities) ক্ষয় করে আসুক। দ্বিতীয়তঃ, ইহা সাধন করতে হলে আপনাকে নানা দিক দিয়ে বিকশিত করবার জন্য অন্তরকে বহু বিচিত্রতায় ফুটিয়ে তোলবার জন্য ব্যাকুল হওয়া চাই। ইচ্ছা করে, চেষ্টা করে, উদ্যোগী হয়ে সেই বিচিত্রস্বরূপের বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে এবং বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে যোগ স্থাপন করা চাই।

ব্রাহ্ম অথচ সঙ্কীর্ণ প্রকৃতি, ব্রাহ্ম অথচ অনুদারমনা, ব্রাহ্ম অথচ ভিন্ন দলের মানুষকে বুঝতে অক্ষম, অথবা তার সঙ্গে মিলতে অনিচ্ছুক, ইহা আমার কাছে স্ব-বিরোধী কথা বলে মনে হয়; এরূপ ভাব আমার কাছে আত্মঘাতী ভাব বলে মনে হয়। এরূপ প্রকৃতি আমার চক্ষে ধর্ম্মসমাজের স্বাস্থ্যের ও সরসতার বিষম শত্রু বলে মনে হয়। যে সকল কারণবশতঃ ব্রাহ্মসমাজ দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারবেন না, তার মধ্যে একটি বড় কারণ এই যে, বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মদের প্রকৃতিতে এই বহুভাবাপন্নতার অভাব ঘটেছে, অপরকে বুঝবার সাধনার অভাব ঘটেছে। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির

বহুমুখীনতার ও উদারতার অভাববশতঃ আমাদের সমাজমধ্যেই অনেক সময়ে অকারণ সংঘর্ষণ ও উষ্মা উৎপন্ন হচ্ছে এবং অনেক ভাল কাজ পণ্ড হয়ে যাচ্ছে।

প্রাণবান সমাজের তৃতীয় লক্ষণ, তাহাতে প্রবহমান প্রেমধারা। সুস্থ দেহকে প্রাণবান্ রাখে তাহাতে প্রবহমান তরল তপ্ত রক্তধারা। প্রেম যেন সমাজদেহের সেই তরল ও তপ্ত রক্ত। প্রথমতঃ, তপ্ত তাজা ঈশ্বর-প্রেম সব মানুষগুলির মনকে নিত্য অনুতাপে ও ভক্তিতে বিগলিত রাখবে। যে সমাজে অনুতাপ ও সাধুভক্তি, এই দুই ভাব প্রবল আকারে বিদ্যমান নাই, বুঝতে হবে, সেখানে মানুষের মন পাথর হয়ে যাচ্ছে। মনগুলিকে গলাবার জন্য কোন উত্তাপ সেখানে কাজ করছে না। মন না গল্‌লে মণ্ডলীর গাঢ়তা হয় না; মন না গল্‌লে ধর্ম্ম প্রচার হয় না। মন না গল্‌লে ধর্ম্মসমাজের কোন কাজই সফল হয় না। আমরা মাঝে মাঝে কেন উৎসব করি? মনগুলিকে ঈশ্বরের করুণার ও আপনাদের অধমতার অনুভূতিতে বিগলিত অবস্থায় আনবার জন্য করি।

তারপর মানব-প্রেম, মানুষের মূল্য-অনুভূতি, মানুষকে বুকে ধরবার ভাব, ইহাও সমাজ মধ্যে প্রবল আকারে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। আমাদের সমাজে কি তা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে? আমি প্রেমকে তরল তপ্ত রক্তের সঙ্গে তুলনা করেছি। রক্ত তরল বস্তু। ইহা প্রত্যেকটি দেহকোষকে আলিঙ্গন করে, বেষ্টন করে। তেমনি সমাজ-মধ্যে এমন ভাব প্রবল থাকা প্রয়োজন যে, সমাজস্থ প্রত্যেক সাধু আত্মাকে সতেজ ভক্তি না দিয়ে, তাঁর চরিত্রকে আলিঙ্গন গ্রহণ ও আত্মস্থ না করে আমরা তৃপ্ত হতে পারি না। ধর্ম্মসাধন অর্থ শুধু ব্রহ্মের স্তব স্তুতি নয়। মানুষকে ভক্তি করা, মানুষকে ভালবাসা, মানুষের জন্য

দরদপূর্ণ হওয়া, এটিও একটি প্রয়োজনীয় সাধন। এটি একটি স্বতন্ত্র সাধন। এর জন্য প্রতিদিন আপনার প্রকৃতিকে কোমল ও নমনীয় করতে হয়, প্রেমে গলাতে হয়।

সাধু ভক্তগণের সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি? শুধু তাঁদের বাণীর বা ধর্ম্মবার্ত্তার বা মহত্ত্বের আলোচনা করা নয়। তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগ স্থাপন; তাঁদের ডেকে কথা কওয়া যায়, এমন করে তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন; তাঁদের ভাবের ও স্বভাবের মধ্যে আপন আত্মাকে ডুবিয়ে রসিয়ে লওয়া।

এ কর্ত্তব্য শুধু মহাপুরুষদের সম্বন্ধেই নয়। আপনার সঙ্গীদের ও বন্ধুদের চরিত্রেও অবগাহন করা চাই; তাঁদের ভাবের মধ্যেও আত্মাকে ডুবিয়ে রসিয়ে নেওয়া চাই। সাধনাশ্রমে আমরা এটাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সাধন বলে মনে করি। সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সাধনাশ্রমের এই বিশেষ আদর্শটিকে আমি আমার রচিত একটি সঙ্গীতে ("দূর দূর দেশ হতে আমাদের জীবন-ধার") প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলাম। সেই সঙ্গীতের এক স্থানে এই কথাগুলি আছে,—

"পরস্পর-চরিত্রনীরে করি মোরা অবগাহন,
সে নদীর পবিত্র তীরে রচি জীবন-তপোবন;
হৃদয়াভরণ বিমল ভক্তি ও প্রেম-পরিমল
পরস্পর-চরণতলে প্রতিদিন ধরি উপহার।"

ঈশ্বরে প্রেম ও মানবে প্রেম সমাজমধ্যে সমান ভাবে প্রবল হলে তবে তা প্রাণবান ধর্ম্মসমাজ হয়।

সুস্থদেহের প্রত্যেকটী অঙ্গে খাটবার জন্য, শ্রমে আপনাকে অর্পণ করবার জন্য উৎসুক ভাব থাকে। প্রাণবান সমাজেও তেমনি। ঈশ্বরের কাজ, ধর্ম্মের কাজ কি কেবল অসাধারণ মানুষের জন্য? কেবল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক

মহাপুরুষদের জন্য? কেবল যুগ-আলোড়নকারী নেতাদের জন্য? তা' নয়। দেহে যেমন দেখি, মাথাও খাটে, পা-ও খাটে, ঈশ্বরের রাজ্যেও তেমনি, সকলেরই যোগ্য কাজ আছে। এস, কাজে ঝাঁপ দেবে; এস, সেবায় আপনাদের অর্পণ করবে। আমরা বলে থাকি যে আমরা সর্ব্বসাধারণের অধিকারে (democracy তে) বিশ্বাস করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সে অধিকার কি শুধু সভাতে আর কমিটিতে দাবী করতে হবে? কেবল নিজের বা স্ব-দলের মতটিকে জয়ী করবার সময়েই দাবী করতে হবে? আমি বলি, এস, একবার খাটুনির democracyতে নাম তো? দলবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ দিয়ে খাটতে নাম তো? "আমারও সেবা চান ভগবান; আমারও সেবা চান ব্রাহ্মসমাজ,"—এ কথা সকলে মনে মনে অনুভব কর। আমার যা কিছু আছে, যতটুকু শক্তি আছে, ঈশ্বরের জন্য, সমাজের সেবার জন্য অর্পণ করব এবং সেটুকুকে তাঁর সেবার জন্য, ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য মেজে ঘষে উজ্জ্বল করে অর্পণ করব। যদি হিসাব লিখতে জান, এস। যদি জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখতে জান, এস। যদি বলতে লিখতে পার, এস। যদি ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে অথবা আনন্দ দিতে পার, এস। কত কাজ পড়ে আছে। শুধু উঁচু কাজের দিকে দৃষ্টিপাত করো না। যার যেটুকু শক্তি আছে, ভগবানের সেবার যোগ্য হবার জন্য তাকে মাজতে ঘষতে লেগে যাও। বেশী বয়সেও হাতের লেখা বদলানো যায়। আমি তার সাক্ষী। নিতান্ত সুর-বোধ-বিহীন মানুষও গানের সাধনা করতে পারে। যদি সেবায় লাগবার জন্য অনুরাগ থাকে, তবে মানুষ তার জন্য শিখতে না পারে এমন কাজ নাই; ফোটাতে না পারে এমন শক্তি নাই।

আপনার সেবা-অর্পণে বিশ্বাস রাখ। "আমি অনুরাগের সঙ্গে এই সেবাটুকু অর্পণ করছি, মানুষ জানুক বা না জানুক, ভগবান ইহা নিশ্চয়ই

গ্রহণ করবেন,"—এই বিশ্বাসে দৃঢ় হও। ক্ষুদ্রতম সামান্যতম সেবা, তুচ্ছতম অর্থদান, সবই সেই পরম দেবতা পরম আদরে গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়? সবই তিনি সার্থক করে তোলেন। আমি আবার বলছি, ব্রাহ্মসমাজ এ পর্য্যন্ত দরিদ্রের পয়সাতেই চলেছে। হে দরিদ্র ব্রাহ্ম, তুমি তোমার শ্রদ্ধার দানের দুটি পয়সাকে ঈশ্বরের দিকে তুলে ধর; দেখবে, তিনি কত আদরে তাকে গ্রহণ করবেন ও সার্থক করে তুলবেন। দাও, সকলে আপন আপন দরিদ্রের ভাণ্ডার হতে সমাজের কাজে অর্থ দাও। শ্রদ্ধার সঙ্গে দাও। "দিয়ে ধন্য হলাম এবং আজীবন দিয়ে ধন্য হব,"—এই ভাবে মন পূর্ণ করে দাও; তোমাদের সামান্য সেবা তোমাদের ক্ষুদ্র দান ধন্য হবে। ঈশ্বরের হাতে পড়ে তাই প্রবল শক্তির আকার ধারণ করবে।

ধর্ম্মসমাজের কেন্দ্রটি এইরূপে আনন্দে, বিচিত্রতায়, সরসতায়, প্রেমে, আত্মোৎসর্গে সতেজ ও সজীব হয়ে থাকা চাই। দেহে যেমন রক্তস্রোত কেন্দ্রে ও পরিধির মধ্যে নিরন্তর আসে আর যায়, যায় আর আসে, তেমনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ব্রাহ্মগণ হ'তে ইহার কেন্দ্রস্থ মণ্ডলীতে, আবার কেন্দ্রস্থ মণ্ডলী হতে ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে, নিরন্তর তাজা প্রাণ-স্রোত যাওয়া-আসা করুক। কেন্দ্র পরিধির দিকে, পরিধি কেন্দ্রের দিকে প্রেমপূর্ণ, আশাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করুক।

যিনি সকল হৃদয়ের, সকল জীবনের, সকল মানবাত্মার পরমাশ্রয়, মানবের সকল সাধন যাঁর চরণের দিকে প্রবাহিত, যিনি একা আপনাতে বহু বিচিত্রতা মিলিত করেন, তাঁহাতে যেন আমাদের সকলের জীবন, আমাদের সমাজ, আমাদের এই আশ্রম, আমাদের সকল কর্ম্ম, নিত্য অর্পিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকে।

১২ই মাঘ, ১৩৩৮

ধর্ম্মের মধুকোষ

পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকেও দুই ভূমি থেকে দেখা প্রয়োজন। তন্মধ্যে প্রথম ভূমি থেকে দেখবার বিষয়,—যে-দেশে ও যে-যুগে ইহার জন্ম, তা হ'তে উত্থিত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সকল। দ্বিতীয় ভূমি থেকে দেখবার বিষয়, - ইহার নিত্য শাশ্বত ভাবসকল।

ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার করা, মানুষকে ব্রহ্মচরণে টেনে আনা, প্রলোভনের সময়ে মানুষের অন্তরে বল সঞ্চার করা, মানুষের জীবনের লক্ষ্যকে উন্নত ক'রে দেওয়া প্রভৃতি ধর্ম্মের নিত্য ও শাশ্বত কার্য্য। ইহা প্রথম পর্য্যায়-ভুক্ত। কিন্তু ধর্ম্মের এ সকল নিত্য ও শাশ্বত প্রকাশের অন্তরতম অংশে কি থাকে? এ সকলের দ্বারা যে-সাধন-গৃহ রচিত হয়, তার অন্তঃপুরে কি থাকে? এ সকলের দ্বারা ধর্ম্মজীবনের যে-পুষ্প বিকশিত হয়, তার নিভৃততম কোষে কি থাকে?

ব্রাহ্মধর্ম্ম মধুময়

মানুষের গৃহের অন্তঃপুরেই গৃহের মধুরতম অংশ। সেখানে মানুষে মানুষে কত মধুময় সম্বন্ধ এবং সে সকল সম্বন্ধের কত মধুময় প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়!' সেখানে কত স্নিগ্ধ দৃষ্টি, মত মৃদু স্পর্শ! ক্ষণিকের আলোর ঝলকের মত' কত প্রেমের দৃষ্টি-বিনিময়; আবার, পরস্পরের কাছে আজীবন বিশ্বস্ততা-নিবেদনের কত উক্তি, কত ইঙ্গিত!

পুষ্পের পত্র-বেষ্টনীটি সুন্দর, বৃন্তটি সুন্দর, দলগুলি সুন্দর। তার পরাগ-কেশর সুন্দর, তার পরাগ সুন্দর। কিন্তু এ সকলের চেয়েও

সুন্দর তার সেই নিভৃত মধুকোষ, যেখানে পুষ্পজীবনের অমৃত সঞ্চিত হয়; যেখানে তরুদেহের তাবৎ কষায় কটু রসের মধ্য হ'তে একটি ক্ষুদ্রতম সারাংশ বিধাতার নিগূঢ় স্পর্শে এক বিন্দু মধুতে পরিণত হ'য়ে অপেক্ষা করে।

তেমনি ধর্ম্মসাধনে ও ধর্ম্মজীবনে, জ্ঞান আছে, ভাব আছে, তপস্যা আছে, সঙ্কল্প আছে; কঠোর প্রতিজ্ঞা আছে, অনুতাপ আছে। সারা জীবনে কত কর্ত্তব্য, কত দায়িত্ব, কত সংগ্রাম আছে; কত সুখের স্পন্দন, কত দুঃখের বেদনা আছে। আমরা যে সারাজীবন এ সকলের মধ্য দিয়ে চলি, আমরা যে সারাজীবনে এ সকলের পথ দিয়ে জীবন-দেবতার কত বিচিত্র স্পর্শ লাভ করি, তার ফলে, সারা জীবন ধ'রে আত্মার অন্তরতম অংশে, আনন্দময় অন্তঃপুরে, কি-লীলা কি-মধুময় ব্যাপার সঞ্চিত হ'তে থাকে? ধর্ম্মজীবনের নিভৃত মধুকোষে কি-মধু সঞ্চিত হ'তে থাকে?

সাধক হাফিজের একটি উক্তি বড় চমৎকার। বোধ হয় কেহ তাঁকে ব'লেছিল যে "তুমি কেবল তোমার সখার সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্বের কথাই কেন বল? ধর্ম্মরাজ্যে কি আর কিছু নাই? ঐ বস্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আরও কত বস্তু তো ধর্ম্মরাজ্যে রয়েছে!" হাফিজ তার উত্তরে বলেছিলেন,—

আঁ কি মী গোয়ন্দ্ আঁ বেহ্তর্ অজ্ হুসন্,
য়ারে মা ঈঁ দারদ্ ও আঁ নীজ. হম্,

["যদি কেহ বলেন যে সৌন্দর্য্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ অমুক বস্তু আছে, তবে আমি বলব যে আমার সখাতে সে শ্রেষ্ঠ বস্তুটিও আছে, কিন্তু তার সঙ্গে তাঁহাতে সৌন্দর্য্যও আছে।"

তেমনি ক'রে বলতে ইচ্ছা হয়, "ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বের বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করতে হ'য়েছে বটে; ভ্রম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে

নিজ দৃঢ় মূর্তিটি প্রকাশ করতে হ'য়েছে বটে; মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, বিবেকানুগত্য, কঠোর শুচিতা ও সংযমের আদর্শ নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে বটে; কিন্তু ধৰ্ম্মরাজ্যে যেখানে যত মাধুর্য্য প্রকাশিত হয়েছে, তা-ও আমার সখাতে, আমার প্রভুতে, আমার ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে।" অপর কোনও ধর্ম্মের মানুষ এসে যদি আমাদের কাছে বলে, "দেখ দেখি, আমাদের ধর্ম্মে কত সুন্দর ও মধুময় তত্ত্ব রয়েছে, কত মধুময় উপলব্ধি রয়েছে; তোমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে তা কই?" তবে আমাদের সমগ্র প্রাণ মন অমনি বলে ওঠে, "ও যে আমারই সখার সৌন্দর্য্য! ও যে আমারই ধর্ম্মের অনুভূতি! ও-সবই যে আমার!" হাফিজের মত ভাষায় আমাদের প্রাণ বলে ওঠে, "সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ছাড়া আর যত কিছু, তা তো আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে আছেই; কিন্তু ধৰ্ম্মরাজ্যের যত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, তা-ও আমাদের ধর্ম্মে পূর্ণমাত্রায় আছে।" আমাদের মনের কথা এইরূপ। এ জন্যই তো ভক্তবাণীতে মজে আমরা এত তৃপ্তি পাই। জগতের সব ভক্তের যত বিমল মধুর অমৃতময় উক্তি ও নিবেদন,—সব যে আমাদেরই!

ঐ মধুময় বস্তু আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনগৃহের অন্তঃপুরে নিয়ে যাব। সেখানে আমাদের প্রিয় পরমেশ্বরকে সেই সব ভাব ও ভাষা দিয়ে প্রেম নিবেদন করব। সংসারে যে-সব বাড়ীতে ভালবাসার স্রোতগুলি সতেজে প্রবাহিত আছে, শুকিয়ে যায় নি, সেখানে নিত্যই এই ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়। এমন বাড়ীতে পতি-পত্নী ভাবেন যে কি-প্রণালীতে পরস্পরকে প্রণয় নিবেদন করবেন; তা ভাল করে শিখতে তাঁদের ইচ্ছা হয়। যাঁরা বেশী ভাল প্রণয়ী, বেশী গাঢ় প্রণয়ী, এমন দম্পতির কাছ থেকে প্রণয়-নিবেদনের ভাষা ও ইঙ্গিত শিখে নিতে তাঁদের ইচ্ছা হয়। যে-বাড়ীতে মাকে ছেলে মেয়েরা খুব ভালবাসে, আবার

মা-ও ছেলেমেয়েদের খুব আদর করেন, এমন বাড়ী থেকে আদরের কথাগুলি শিখে এসে নিজেদের বাড়ীতে তা প্রচলিত করতে ইচ্ছা হয়। আমার ছোট বেলার একটা ঘটনা মনে আছে। আমার মা আমাকে খুব আদর করতেন। একদিন অন্য এক বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম, একটি ছেলেকে তার মা "আমার যাদুমণি" বলে আদর করছেন। আমার মনে হল আমার মা তো কখনও এ কথাটি বলে আমায় আদর করেন নি। তখনি ছুটে এসে মাকে বল্‌লাম, "মা, আমাকে একবার 'আমার যাদুমণি' ব'লে আদর কর তো!" প্রেমরাজ্যের এই ধারা; ধর্ম্মরাজ্যেরও এই ধারা। যার হৃদয়ে প্রেম আছে, তাকে প্রেমের ভাষা, প্রেম-নিবেদন শিখতেই হয়। এই শিক্ষায় যাঁরা গুরু, যাঁদের প্রেম-ভক্তি খুব গাঢ়, সেই সব ভক্তেরা আমাদের কেমন আপনার! ধর্ম্মরাজ্যে এমন আপনার জন আর কে আছে? তাঁদের সব মধুময় অনুভূতি, তাঁদের সব মধুময় নিবেদন আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনগৃহের অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে হবে।

কি করে ব্রাহ্মসমাজের সাধনের অন্তঃপুরটি খুব মিষ্ট হয়, কি ক'রে ব্রাহ্মসমাজের সাধনের মধুকোষে ভাল মধু সঞ্চয় হয়, তার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হচ্ছে।

ধর্ম্মের অন্তঃপুর

ধর্ম্মরাজ্যে যতই বাইর থেকে ভিতরের দিকে যাত্রা করা যায়, যতই অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই যেন অনুভব করতে পারা যায় যে, অন্তরতম স্থানে ধর্ম্ম কত মধুময়! কয়েকটি তুলনার সাহায্যে এ কথাটি বুঝবার চেষ্টা করি।

পূজনীয় আচার্য্য শিবনাথ একটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করতেন। একজন

বাঙ্গালী যুবক পশ্চিমের একটি সহরে গিয়ে একজন সদাশয় মানুষের বাড়ীতে অতিথি হলেন। তিনি প্রথম কয়েক দিন অতিথির জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে বাস করতে লাগলেন; সেই ঘর থেকেই তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন যে বাড়ীর লোকগুলির স্নান আহার বিশ্রামাদির সময় কিরূপ, রীতি কিরূপ; এবং আপনার সব কাজে তিনি সেই দৈনিক কার্য্যপদ্ধতি ও রীতি অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তার পর ক্রমশঃ পরিচয় একটু বেশী হলে তিনি গৃহস্বামীর বসবার ঘরে এসে বসতে লাগলেন। সেখানে গৃহস্বামী বন্ধুদের সঙ্গে মন খুলে আলাপ করতেন; তাই সেখানে বসে সেই আলাপে যোগ দিয়ে দিয়ে ক্রমশঃ তিনি বাড়ীর মানুষগুলির স্বভাব ও তাদের রুচি-অরুচি সব বুঝে নিলেন। সেখানে বসে তিনি জানতে পারলেন যে সে-বাড়ীর কর্ত্তাটি শৃঙ্খলাপ্রিয় এবং পরোপকারশীল; বাড়ীর সব মানুষগুলি কাব্যামোদী সঙ্গীতপ্রিয়, স্বদেশভক্ত। তার পর কয়েক দিন গেলে আরও একটু ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। তখন বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁকে বলতে লাগল, "তুমি আমাদের মার কাছে চল না! আমাদের মা বড় ভাল।" তারা তাঁকে টেনে ভিতর বাড়ীতে নিয়ে গেল। যেখানে বসে মা রান্না করেন, ছেলেমেয়েদের আদর করেন; যেখানে বাবা মা ও ছেলেমেয়েরা একত্র হয়ে মনের কথা বলেন, সেই অন্তঃপুরে সেই যুবকের গতিবিধি হল। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পেলেন যে, বাড়ীর একটি বয়স্ক ছেলে শিক্ষার জন্য বিলাতে রয়েছে। তার কথা বলতে বলতে বাবা মার চোখ স্নেহ ও আশার আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পেলেন যে, বাড়ীর একটি মেয়ে কিছু দিন আগে মারা যায়। ঐ ছেলেটি সেই বোনকে বড় ভালবাসত! বোনটির মৃত্যুতে সে এতই শোকে আকুল হয়েছিল যে তার সম্মুখে

সেই কন্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই যেত না। বাড়ী ছেড়ে রওনা হবার দিন সেই ছেলেটি মায়ের কাঁধে মাথা রেখে নীরবে আকুল হয়ে বড়ই কেঁদেছিল। কেউ তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করে নি; কিন্তু সকলেই বুঝে নিয়েছিল যে সেই হারানো বোনকে মনে করে সে কাঁদছে। এই বর্ণনা করতে করতে বাবা মার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। বিদেশে এই বাড়ীর অন্তঃপুরের এই সকল দৃশ্য, এই সকল স্নেহের প্রকাশ দেখে দেখে সেই যুবকের মনে নিজের বাড়ীর ও নিজের বাবা মার স্নেহের ছবি জেগে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন, সব বাড়ীতেই অন্তঃপুরের ভাবটি দেখি ঠিক এক রকম। তাঁর ইচ্ছা হতে লাগল যে, আমিও এঁদের পুত্রস্থানীয় হয়ে এঁদের স্নেহের অংশী হই।

এই কাহিনীতে বর্ণিত যুবকটি প্রথম অবস্থায় সেই পরিবারের দৈনিক কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করলেন; তার পর তাদের রুচি ও প্রকৃতির পরিচয় পেলেন; এবং সর্ব্বশেষে অন্তঃপুরে গিয়ে পিতা মাতা ও সন্তানদের ভালবাসার মধুময় দৃশ্যসকল দেখলেন। ধর্ম্মরাজ্যেও এর অনুরূপ ব্যাপার আছে। ধর্ম্মরাজ্যেও বাহির হতে ভিতরের দিকে যাবার তিনটি স্তর আছে।

যে-কোনও ধর্ম্মের সঙ্গে পরিচিত হতে যাও, যে কোনও ধর্ম্মকে সাধন করতে যাও, প্রথমেই চোখে পড়বে তার বাইরের অঙ্গ,—তার মত ও বিশ্বাস, তার অনুষ্ঠানপ্রণালী, তার পূজা অর্চ্চনার প্রণালী প্রভৃতি। তার চেয়ে একটু ভিতরে গেলে দেখা যায়, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই কিছু না কিছু বিশেষ স্বভাব আছে। কোন্ বস্তুকে প্রাধান্য দিতে হবে, কোন্ বস্তুকে অপ্রধান স্থানে রাখতে হবে, এ বিষয়ে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। যে-দেশে, যে-যুগে, যে-মানুষদের মধ্যে সে-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়েছে, তার উপযোগী হবার জন্য যে সে-ধর্ম্মকে কিছু বিশেষ কর্ত্তব্যসমষ্টি ও বিশেষ বার্ত্তা নিয়ে অবতীর্ণ হতে হয়, এ কথা আগেই

বলেছি। সেই কর্ত্তব্যসমষ্টি ও বার্ত্তার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হয়ে সেই ধর্ম্মে একটি বিশেষ mood, একটি বিশেষ spirit, একটি বিশেষ স্বভাব বিদ্যমান থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বুদ্ধদেব যে উদারতা ও মৈত্রীর সমাচার প্রচার করেছিলেন, তার মূল তো তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উপনিষদেই ছিল। শুধু সেটুকুই কি বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব? তা কখনও নয়। কিন্তু তাঁর সময়ে মানুষের ধর্ম্মকর্ম্মকে বৈদিক যাগযজ্ঞের আড়ম্বর হতে ও পুরোহিতগণের একাধিপত্য হতে মুক্ত করে দেওয়া বড়ই প্রয়োজন হয়েছিল। তাই তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান ঝোঁকটি হল এই দুই বিষয়ে,— (১) ধর্ম্ম যাগযজ্ঞে নয়, ধর্ম্ম শীলে অর্থাৎ চরিত্রে; এবং (২) এই শীলের সাধনের জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোনও প্রয়োজন নাই। তাই, সে যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ স্বভাবটি হয়েছিল, ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্রোহ এবং ধর্ম্মে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। বুদ্ধদেব যদি কেবল কতকগুলি সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিতেন, ঐ দুই বিষয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিবাদ করবার জন্য এবং মানুষের মনে দৃঢ়তা সঞ্চার করবার জন্য না দাঁড়াতেন, তা হলে এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই সম্ভব হত না। তেমনি, ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্যুদিত হয়েছেন মূর্ত্তিপূজায়, জাতিভেদে, অবতারবাদে, অভ্রান্ত গুরুবাদে জর্জ্জরিত ও শতধা খণ্ডিত ভারতবর্ষে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে। তাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল নিরাকারবাদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে আসেন নাই; সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্রও ললাটে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের নিঃশ্বাস-বায়ু। তেমনি, মত সাধন ও বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, ভক্তি দীনতা মাধুর্য্য সহিষ্ণুতা প্রভৃতিই ছিল বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ স্বভাব।—প্রত্যেক ধর্ম্মেই একটি বিশেষ স্বভাব, একটি বিশেষ ঝোঁক থাকে।

কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মে এই স্বভাব অপেক্ষা আরও অন্তরতর একটি অংশ আছে। সেই অন্তরতম অংশে, সেই অন্তঃপুরে কি থাকে? সেখানে কি দেখা যায়, কি শোনা যায়?—ভিতর বাড়ীর খবর যেমন সব পরিবারেই এক রকম, ধর্ম্মের অন্তঃপুরের খবরও তেমনি সব ধর্ম্মেই এক রকম। তা কি খবর?—মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য কেমন ব্যাকুল হয়, সেই খবর। যে-সন্তান কাছে রয়েছে তার জন্য মায়ের ব্যাকুলতার প্রকাশটি কেমন, আর যে-সন্তান দূরে গিয়েছে, তার জন্য মায়ের ব্যাকুলতার প্রকাশটি কেমন, এই সব দৃশ্য। যে ধরা দিয়েছে, তাকে পেয়ে মায়ের মনটা কেমন সুখী, আর যে ধরা দিচ্ছে না, তাকে কোলে টেনে আনবার জন্য মায়ের মনটা কেমন অস্থির, এই খবর। মায়ের ভালবাসার, মায়ের ব্যাকুলতারই নানা ছবি। তারই নানা ইতিহাস, তারই নানা উচ্ছ্বাস, তারই নানা তরঙ্গ, তারই নানা লীলা, তারই নানা কীর্ত্তি। আবার, আর এক দিকে, মায়ের জন্য সন্তানের ভক্তি ভালবাসার, মায়ের চরণে সন্তানের আনুগত্যের আত্মসমর্পণের কত বিচিত্র আকার, কত বিচিত্র প্রকাশ, কত বিচিত্র ভাষা!

যে-কোনও ধর্ম্মকে দেখ, দেখবে তার অন্তঃপুরে এই মধুময় দৃশ্য, এই মধুময় কাহিনী। তা এমনি মধুর যে মনকে তা তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ করে। সেই যুবকটির ইচ্ছা হচ্ছিল যে এঁদের বাড়ীর ছেলে হয়ে যাই, এই বাপ-মার স্নেহের অংশী হই; তেমনি আমাদেরও হয়। পৃথিবীর যে-কোন দেশে, যে-কোন যুগে, যে-কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ে, সেই পরম জননী কোনও ভক্তকে বা কোনও দুঃখী তাপীকে তাঁর স্নেহধারায় সিক্ত করছেন, এই দৃশ্য দেখলেই আমাদের ইচ্ছা হয়, আমরাও ঐ অমৃতের অংশী হই।

উপাসনার অন্তরতম কোষ ; মাতৃস্তন্য পান

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান সাধন যে উপাসনা, তার প্রকৃত স্বরূপটি কিরূপ ? শাস্ত্রবাক্যে শুনি, শ্রবণ (অর্থাৎ অধ্যয়ন) অপেক্ষা মনন গভীরতর ; আবার মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন (অর্থাৎ ধ্যান) গভীরতর। কিছু পরিমাণে সেই ধারা অনুসরণ করে বলা যায়, উপাসনায় বাক্যের স্তর অপেক্ষা চিন্তার স্তর গভীরতর, আবার চিন্তার স্তর অপেক্ষা নীরব অনুভূতির স্তর গভীরতর। তা-ই অন্তরতম স্তর।

এই অন্তরতম স্তরে কি হয় ? সেই নীরব অনুভূতি কি রকমের ব্যাপার ?—কত ভাবে তা বলতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বলা যায় না। "নীরবে পরম জননীর স্নেহের মধ্যে আপনাকে ফেলে রাখা : নীরবে সেই স্নেহ-বেষ্টন আত্মার সর্ব্বাঙ্গ লাগানো ; সুশীতল জলে খানিকক্ষণ অবগাহন করলে ক্রমে যেমন শরীরের সমুদয় মলিনতা ও সমুদয় তাপ চলে যায়, সেইভাবে পরম জননীর স্নেহ-সলিলে অবগাহন করে দেহ মন স্নায়ু ও মেজাজ পর্য্যন্ত শীতল করে লওয়া",—ইত্যাদি কত ভাবে কত ভাষায় এই নীরব অনুভূতির বর্ণনা করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কোনও বর্ণনাই তো উপযুক্ত ভাবে তাকে প্রকাশ করতে পারে না। কারণ, এই শ্রেণীর যত বর্ণনা, সবই তো আমার দিক থেকে। কিন্তু উপাসনার সেই অন্তরতম স্তরে কি কেবল উপাসকই কিছু করেন ? দেবতা কি নিশ্চেষ্ট থাকেন ? তা কখনই নয়। উপাসনা তো এক জনের ক্রিয়া নয় ; দেবতা ও উপাসক উভয়ের ক্রিয়া ; উভয়ের জন্য উভয়ের কিছু কাজ।

উপাসনার সেই অন্তরতম পুরে কি ব্যাপার হয় ? দেবতাই বা কি করেন ? সাধকই বা কি করেন ? দুজনে মিলে কি হয় ? সে ব্যাপারের বিশ্লেষণ হয় না, বর্ণনা সম্ভবে না। কেবল একটি তুলনা আমার খুব ভাল লাগে। সেইটি বলি,—

ছোট একটি শিশু ; তার খুব জ্বর হয়েছে, গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। রোগের যাতনায় শিশু অস্থির হয়ে কাঁদ্‌তে লাগল্। গায়ে হাত বুলিয়ে বাতাস ক'রে কেউ তাকে শান্ত করতে পারছে না। মা এলেন, শিশুকে বুকে ধরলেন, শিশুর মুখে নিজের স্তন্য পূরে দিলেন। তখন তার কান্না থামল। তখনই কি শিশুর জ্বরটা কমে গেল? তা তো নয়। কিন্তু মাতৃস্তন্য মুখে গ্রহণ করে শিশুর দেহে ও মনে এমন কিছু নিগূঢ় ক্রিয়া হল, যার ফলে সে শান্ত হল।

ছোট একটি শিশু ; সবেমাত্র চলতে শিখেছে। হঠাৎ পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। যারা কাছে ছিল, সযত্নে তাকে তুলে নিল। আহত স্থানে জল দিল, হাত বুলিয়ে দিল। কিন্তু শিশুর কান্না তবু্ থামে না। মা এলেন, বুকে ধরলেন, স্তন্য শিশুর মুখে পূরে দিলেন। তখন কান্না থামল। তখনই কি তার আঘাতের ব্যথা চলে গেল? তা তো নয়। কিন্তু এখানেও সেই নিগূঢ় ক্রিয়া দেখা গেল।

ছোট একটি শিশু ভয় পেয়ে ছুটে এসেছে; কাঁদতে কাঁদতে মাকে জড়িয়ে ধরেছে। কান্না থামবার পরেও তার বুক ধড়্ফড়্ করছে, স্পন্দন থামছে না। মা তাকে বুকে চেপে ধরলেন; স্তন্য মুখে দিলেন। টানতে টানতে ক্রমে ক্রমে শিশুর বক্ষের স্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে এল।—কখনও কখনও অল্পবয়স্কা মাকে এ রকম করতে দেখে তাঁর অবিবাহিতা অনভিজ্ঞা সখীরা পরিহাস করে। তারা বলে, "তোমার বুঝি ধারণা এই যে তোমার স্তন্যপানই শিশুর সব কষ্টের ওষুধ?" কিন্তু সত্য কথা তো তা-ই। যারা এমন করে বলে, তারাই কিছু জানে না।

কত সময়ে কেউ খেলনা কেড়ে নিয়েছে বলে শিশু নিরাশ্বাস হয়ে কাঁদতে থাকে। কত সময়ে দেখতে পাই, পাঁচ ছয় মাসের একটি শিশু এমন রেগে গিয়েছে যে কেউ তার কান্না থামাতে পারছে না। এই সব

সময়ে মা শিশুকে বুকে ধরেন, স্তন্য মুখে পূরে দেন। স্তন্য পান করতে করতেও শিশু এক একবার আগের সেই ক্ষোভের বা ক্রোধের উচ্ছ্বাসে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে; কিন্তু ক্রমে স্তন্য পান করতে করতেই সে শান্ত হয়ে পড়ে।

এই যে কয়েকটি ব্যাপারের বর্ণনা করলাম, এগুলির মধ্যে মা ও শিশু, দুজনেই কিছু করছেন। শিশু কাঁদল, মা তাকে বুকে তুলে নিলেন, তার মুখে স্তন্য পূরে দিলেন। এ সব ব্যাপারের ভিতরে শিশুর কাজটা বড়, না, মায়ের কাজটা বড়? কে বলবে! মনে তো হয় যেন মায়ের কাজটাই বড়।

তেমনি সত্য উপাসনায় কি হয়? সন্তান কাঁদে, মা তাকে তুলে ধরেন; তার আত্মাকে নিজ স্পর্শসুধা দিয়ে বেষ্টন করেন; তার আত্মাকে নিজ স্নেহসুধা পান করান। এতে সাধকের কাজই বেশী, না দেবতার কাজই বেশী? কে বলবে! মনে তো হয় যেন দেবতার কাজই বেশী।

মাতৃস্তন্য মুখে নিলে শিশুর দেহমনে কি-ক্রিয়া হয়? মাতা নিজের স্তন্য হতে শিশুর দেহে ও চেতনায় কি-গূঢ় প্রভাব, কি-স্রোত ঢেলে দেন? সে কি শুধু দুগ্ধধারা? সে কি শুধু ক্ষুধার নিবৃত্তি? কখনও নয়! তখন মাতা কি দেন, সন্তান কি পায় তা এত গভীর, এত জটিল, এত নিগূঢ়, যে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

তেমনি, জীবনে আমরা যতবার সত্য উপাসনা সম্ভোগ করি, তখন আমাদের আত্মাতে কি ঘটে? তখন আমাদের চেতনায়, আমাদের দেহ-মন-মেজাজে কি ব্যাপার হয়? কে তা বলতে পারে? পরম জননী তখন আমাদের কি বস্তু দেন? তাঁর সেই স্পর্শের, সেই প্রভাবের নাম কি? বর্ণনা কি? বিশ্লেষণ কি?—জানি না। শুধু এই মাত্র জানি যে তাতেই প্রাণ নূতন হয়, তাজা হয়।

এ জীবনে রোগে, শোকে, দুঃখে, ভয়ে, বিফলতায়, রিপুর উত্তেজনায় যতবার পরম জননীর কোলে মুখ রেখে কেঁদেছি, ততবার জীবনে এই ব্যাপারই ঘটেছে। রোগের মধ্যে মন বলেছে, "মা তুমি কাছে থাক; আমার এই রোগক্লিষ্ট দেহ যে তোমার কোলে রয়েছে, তার অনুভূতিই ভাল করে আমার চেতনাতে সঞ্চার কর; তাতেই আমার ক্লেশ দূর হবে।" সে অবস্থায় পরম জননী তাই করেন। তাঁর কোলে পড়ে থাকা ও তাঁর স্নেহসুধা পান করাই সে অবস্থার উপাসনা। তেমনি দুঃখে; তেমনি ভয়ে; তেমনি সংসারের বিফলতায়।

রিপুর উত্তেজনাতেও সেই কথা। কত সময়ে নিজেই বুঝতে পারি যে আমি সংযম হারাচ্ছি, আমার এমন রাগ হওয়া উচিত নয়; কিন্তু তবু রাগ থামাতে পারি না। তখন পরম জননীর কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোলে মুখ লুকিয়ে বলি, "মা, আমার রাগটা তুমি থামিয়ে দাও। আমার উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলীকে তুমি নিজের বুকে চেপে রেখে শান্ত করে দাও।" তখন ঐ পাঁচ মাসের শিশুর মত নিজের বুদ্ধি চেষ্টা সব ভুলে গিয়ে মায়ের বক্ষের মধ্যে লুকাতে ইচ্ছা করে। আমি যে তখন মাকে জড়িয়ে ধরে কাতর হয়ে কেবল ঐ কথাই বলতে থাকি, আর মা যে তখন আমাকে নিজ স্নেহবক্ষে চেপে নিয়ে ক্রমে ক্রমে শান্ত করে দেন,—মায়ের সঙ্গে আমার এই যে ব্যাপার ঘটে, এই তো আমার তখনকার উপাসনা।

আমি দুঃখের ও বেদনার উপাসনার কথাই এতক্ষণ বললাম। কিন্তু শান্ত মনে যখন তাঁর উপাসনা করি, তখনও এই কথা। বাক্যের, চিন্তার ও নিবেদনের চেয়ে গভীরতর স্থানে যে-নীরব অনুভূতি থাকে, যাতে তিনি আমাকে কিছু দেন, আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু পাই, তার বর্ণনা হয় না, তার বিশ্লেষণ হয় না।

উপাসনার ভিতরে মায়ের কাজটাই বেশী বড়, এই সত্য খুব ভাল করে আমাদের মনে প্রবেশ করুক। সন্তানের চেয়ে মায়ের ব্যাকুলতাই বেশী। কত সময়ে স্তন্যপান করবার জন্য সন্তান তত ব্যাকুল হয় না, স্তন্যদান করবার জন্য মা যত ব্যাকুল হন। কোনও বাড়ীতে এক দিন অতর্কিত কারণে মা সকালবেলা শিশু সন্তানকে স্তন্যপান করাতে পারেন নি। দাসী সে কথাটি জানত না; সে যথাসময়ে শিশুকে হাওয়া খাওয়াতে বাইরে নিয়ে গেল। শিশুও বেড়াতে যাবার উৎসাহে ক্ষুধা ভুলে গেল। কিন্তু মার তখন কি ব্যস্ততা। কত বার বাইরের দিকে তাকান, কখন আমার বাছা ঘরে ফিরে আসবে, তাকে স্তন্যপান করাব! আমরা কত সময়ে উপাসনা না করেই বা ভাল করে উপাসনা না করেই সংসারের কাজে বাহির হয়ে পড়ি। তখন কি দেখা যায় না যে, স্তন্যদানের জন্য মা যত ব্যাকুল, স্তন্যপানের জন্য আমরা তত ব্যাকুল নই? সেই বাড়ীর মায়ের মত, ব্রাহ্মসমাজ-বাড়ীতে স্তন্যভারাতুর মায়ের ছবিটি কি দেখেছ?

সত্য উপাসনা হলে আত্মাতে কি-ফল হয়? আত্মার সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিকেরা কত গবেষণা করেও এখনও মানবদেহের সর্ব্বাঙ্গকে পুষ্ট করবার উপযোগী কোন খাদ্য বস্তুর (perfect food) উদ্ভাবন করতে পারেন নাই।[১] অথচ কি আশ্চর্য্য, এক মাতৃস্তন্যে শিশুর সর্ব্বাঙ্গ পোষণের উপাদান বিদ্যমান! তেমনি, উপাসনা যদি সরল ও সত্য হয়, মাতৃস্তন্য পানের অনুরূপ হয়, তবে তা দ্বারা আত্মার সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট হয়, সর্ব্বাঙ্গ সতেজ হয়।

মস্তিষ্ককে নির্ম্মল, বুদ্ধিকে পরিষ্কার রাখতে চাও? সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা লাভ করবার জন্য চিন্তাকে উজ্জ্বল রাখতে চাও?—উপাসনা কর। মনকে কোমল, হৃদয়কে শ্রদ্ধায় নত ও প্রেমে স্নিগ্ধ রাখতে চাও?

উপাসনা কর। সঙ্কল্পে দৃঢ়, প্রলোভনে অকম্পিত, বাধা বিঘ্নে নির্ভীক থাকতে চাও?—উপাসনা কর। কিন্তু শুধু বাক্যের উপাসনা নয়; শুধু মননের উপাসনাও নয়। সেই নিগূঢ় আত্মদানের উপাসনা কর, যা মাতৃস্তন্য পানের সমান।

লোলুপ মানুষ

ধর্ম্মরাজ্যটা কি-রকম মানুষের রাজ্য? একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝবার চেষ্টা করা যাক্।

এক বাড়ীতে চার ভাই তাঁদের পরিবার সহ একসঙ্গে থাকেন। তাঁদের সকলের শিশুরা একত্রে একটি ঘরে খেলা করে। মাঝে মাঝে বধূরা সেই ঘরে এসে নিজ নিজ সন্তানকে স্তন্য দান ক'রে আবার নিজ নিজ কর্ম্মে চলে যান।

সেই শিশুগুলির মধ্যে একটি বড়ই লোভী। সেই ঘরে এসে যাই কোন মা তাঁর সন্তানকে কোলে নিয়ে স্তন্যদান করতে বসেন, অমনি সে ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজের মায়ের খোঁজে ছুটে যায়। মাকে যেখানে পায় সেখানেই তাঁর পা জড়িয়ে ধরে, এবং তখনই স্তন্যপান করবার জন্য আব্দার করতে থাকে। এ বাড়ীতে সেই ছেলেটির এই কাণ্ড দেখে সকলে বড়ই কৌতুক অনুভব করেন। সে ছেলেটি এ বাড়ীতে "হ্যাংলা ছেলে" বলে পরিচিত।

এই রকম "হ্যাংলা ছেলে" বয়স্কদের মধ্যেও থাকে। মাতৃভক্তিতে যাঁর হৃদয় একান্ত সিক্ত, বড় হ'লেও তাঁর প্রকৃতি এমনি থাকে। এমন মানুষ যদি কোথাও গিয়ে দেখতে পান যে একটি মা গদ্‌গদ হয়ে নিজ সন্তানকে আদর করছেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁর মন নিজের মায়ের দিকে ছোটে। যেখানে মাতৃস্নেহের লীলা, সেখানেই তাঁর মন লোলুপ হয়ে ওঠে।

ভক্তেরা এই শ্রেণীর লোলুপ ছেলে। পৃথিবীর যে-দেশে যে-যুগে যে-সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে জগজ্জননীর স্নেহনির্ঝর বিশেষ ভাবে তাঁর মানবসন্তানের জন্য ঝরেছে, সেখানেই ভক্ত দুবাহু তুলে মা মা বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই নির্ঝরধারায় স্নাত হবার জন্য উৎসুক হন। সেখানেই তিনি সেই সন্তানদলে মিশে তাঁদের সঙ্গে মাতৃস্তন্য পান করবার জন্য উৎসুক হন।

আমাদের মত দুঃখী পাপীরাও এই জন্য উৎসুক। আমাদের অন্তরটাও সেই হ্যাংলা ছেলের মত। সমুদয় ধর্ম্মরাজ্যটাই এই রকম লোলুপ ছেলে মেয়েদের দিয়ে ভরা। মা তাঁর কোনও ভক্তকে স্তন্যপান করাচ্ছেন, এই দৃশ্য দেখে আমরাও মায়ের পা জড়িয়ে না ধরে থাকতে পারি না। আমাদেরও মন বলে, "মা গো, রামপ্রসাদের কাছে, রামকৃষ্ণের কাছে যেমন মিষ্টি মা হয়ে দেখা দিয়েছিলে, আমাদেরও সেই দর্শন দাও। যীশুর কাছে যেমন খোরাক-পোষাকের-পর্য্যন্ত ভার-লওয়া সত্য-পিতা হয়ে দেখা দিয়েছিলে, আমাদের কাছেও তেমনি দেখা দাও। শ্রীচৈতন্যকে, মাডাম গেয়োঁকে যেমন মধুর রূপে দেখা দিয়ে মাতিয়েছিলে, আমাদেরও তেমনি দেখা দাও, তেমনি করে মাতাও!" ধর্ম্মরাজ্যটা এইরূপ লোলুপ মানুষদেরই রাজ্য।

এই লোলুপ মানুষেরা ধর্ম্মরাজ্য হতে কি অন্বেষণ করেন? তাঁদের সব চেয়ে বেশী অন্বেষণের বিষয় এই যে, কে কোথায় একটু মধু সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছেন। মা সন্তানকে স্নেহসুধা দান করছেন এবং সন্তান মার কাছে আত্মদান করছেন, এই উভয় ব্যাপারের যত অমৃতময় প্রকাশ ও যত অমৃতময় নিবেদন, সে-সকলই ধর্ম্মরাজ্যের মধু। এই মধুর জন্যই তাঁরা লোলুপ।

ব্রাহ্মসমাজ এই দেশে ও এই যুগে যে-সকল কার্য্য করছেন, তার

ইতিহাস নিশ্চয়ই গৌরবময়! আমরা আশা করি যে আগামী যুগেও সেইরূপ গৌরবময় ইতিহাস রচিত হবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ যুগের ধর্ম্ম-রাজ্যের মানুষেরা, বিশেষতঃ ক্ষুধিত তৃষিত আত্মাগণ তো শুধু তাই পেয়ে তৃপ্ত হবেন না! তাঁরা অন্বেষণ করবেন, ব্রাহ্মসমাজ কি ধর্ম্মের মধুকোষে কিছু মধু সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছেন?

এই জন্য বলি, শুধু এ দেশের ও এ যুগের উপযোগী কর্ত্তব্যের কথাই মনে রেখো না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে সকল দেশের ও সকল যুগের লোলুপ ভক্তগণের জন্য কিছু প্রেমামৃত, কিছু ভক্তি-অমৃত রেখে যেতে হবে, এ কথাই প্রধান ভাবে মনে রাখতে হবে। ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় কর্ম্মসূচী অপেক্ষা এটি বড় কথা।

ভবিষ্যতে এমন যুগ আসতে পারে, যখন মহাত্মা রামমোহনের কর্ম্ম ও কীর্ত্তি সবই মানুষ বিস্মৃত হবে। কিন্তু তখনও ধর্ম্মরাজ্যের লোলুপ মানুষেরা মনে রাখবে যে ধর্ম্ম-মন্দিরে মিলিত উপাসনাতে বসলেই তাঁর চোখে জল পড়ত। তাঁর হৃদয়ের উদারতা ও মহত্ত্ব, তাঁর সেই অশ্রু, তাঁর ভক্তি ব্রাহ্মসমাজের অক্ষয় ধন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্মসমাজকে সমাজরূপে গঠন করে দিয়েছেন, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, উপাসনা-পদ্ধতি, ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রভৃতি রচনা করে ব্রাহ্মসমাজকে ধর্ম্মমণ্ডলীর আকার দিয়ে গিয়েছেন, এ সব কথা যখন মানুষ বিস্মৃত হবে, তখনও ধর্ম্মরাজ্যের লোলুপ মানুষেরা মনে রাখবে, পরম সুন্দরের নিত্য সান্নিধ্যই তাঁর আত্মার অন্নপান ছিল, এবং সেই প্রেমময়ের স্পর্শে তিনি রোমাঞ্চিত হতেন। মনে রাখবে, তিনি বলেছিলেন, "ব্রহ্ম যে আমার গায়ে ঠেকেন!" তিনি বলে গিয়েছেন, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।"

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা ও এক যুগে তৎকর্ত্তৃক

ভারতবর্ষ আলোড়নের ইতিহাস যখন মানুষ বিস্মৃত হবে, তখনও ধর্ম্মরাজ্যের লোলুপ মানুষেরা তাঁর ভক্তি-বিগলিত মূর্ত্তিটি মনে রাখবে। মনে রাখবে, তিনি হরি-প্রেমে বিভোর হয়ে থাকতেন; তিনি হরিকে দিয়ে অঙ্গ মার্জ্জনা করতেন। মনে রাখবে, তিনি ব্রাহ্মসমাজে আনন্দময়ী মাকে ও নিত্যলীলাময় শ্রীহরিকে চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

আচার্য্য শিবনাথের বাগ্মিতা, তাঁর তেজোময় কর্ম্মজীবন, তাঁর সৃষ্ট এতগুলি প্রতিষ্ঠান,—এ সব একদিন মানুষ ভুলে যাবে। কিন্তু তখনও ধর্ম্মরাজ্যের তৃষিত ও লোলুপ মানুষেরা মনে রাখবে, তিনি বলে গিয়েছেন, "ভাই রে, গভীর পাপের কালি ঘুচিবার নয়, বিনা তাঁরি কৃপাবারি জানিও নিশ্চয়!" মনে রাখবে, "ভাই রে, কি মধুর নাম! বলিতে রচন হারে, কে বাখানে তায় রে, সুধাধারা বহে অবিরাম।" মনে রাখবে, "সে বাণীর বর্ণে বর্ণে সুধারস পশে কর্ণে!" মনে রাখবে, "সে বাণী-পরশ পেয়ে, নরনারী আসে ধেয়ে, সঁপিবারে জীবন যৌবন রে!"

তাই বলি, ধর্ম্মরাজ্যটা মধু সঞ্চয়ের রাজ্য, আর লোলুপ মানুষদের রাজ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম মধুময়। আমরা যেন এই ধর্ম্মকে মধুময় বলে সাধন করতে পারি, আমাদের জীবনের দ্বারা জগতের কাছে মধুময় বলে প্রকাশ করতে পারি এবং ধর্ম্মের মধুকোষে কিছু মধু সঞ্চয় করে রেখে যেতে পারি।

১২ই মাঘ, ১৯৩৩

নব শতাব্দীর আহ্বান

"যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ"

—ঈশোপনিষৎ

ঈশ্বর এক ও শাশ্বত; তিনি যুগে যুগে যখন যা প্রয়োজন হয়, তার বিধান করেন। ধর্ম্মও তেমনই এক ও শাশ্বত; যুগে যুগে যখন যে আকারে প্রয়োজন হয়, ধর্ম্ম সেই ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

নূতন যুগ

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সময়ের কর্ম্মী ও সেবকদল দেশের এক যুগের প্রয়োজন হ'তে উত্থিত, এক যুগের আহ্বানে আহূত। সেই যুগের উপযোগী ভাবে তাঁদের কর্ম্মশক্তি, তাঁদের জীবন, তাঁদের ব্যক্তিত্ব গঠিত। এখন নূতন যুগ সম্মুখে; নূতন যুগের উপযোগী হবার জন্য যাঁরা প্রস্তুত, এবং সে যুগের কর্ত্তব্যের জন্য যাঁরা শিক্ষাপ্রাপ্ত, এমন মানুষ এখন আমাদের চাই।

সেই নবযুগে ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে কি কি নূতন কর্ত্তব্য প্রশ্ন ও সংগ্রাম উপস্থিত হবে এবং ব্রাহ্মসমাজ সে-সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করতে, সে-সকল প্রশ্নের মীমাংসা করতে, ও সে-সকল সংগ্রামের জন্য বল সঞ্চয় করতে সমর্থ হবেন কি না, এ সকল আমাদের গুরুতর চিন্তার বিষয়।

যুগ পরিবর্ত্তনের সময়ে প্রত্যেক সমাজের বাইরের অবস্থার ও তদুত্থিত আহ্বানের সঙ্গে সেই সমাজের অন্তর্জীবনের সামঞ্জস্য ঘটতে

কিছু বিলম্ব হয়। সেই বিলম্বের কালে, চক্ষে দেখবার মত কোন কাজ, কোন আয়োজন, কোন মানুষ সম্মুখে থাকে না। এজন্য স্বভাবতঃ মানুষের মন ভীত ও ত্রস্ত হয়। কিন্তু এই বিলম্বে ভয় করবার কিছু নাই। যে-যে নিয়মের দ্বারা বিধাতা মানব জগতে পরিবর্ত্তনসকল সংঘটিত করেন, সামঞ্জস্যের এই বিলম্বও তন্মধ্যে একটি নিয়ম।

সমাজদেহে জীবনীশক্তি থাকলে বিধাতার বিধানে উপযুক্ত সময়ে সে-সমাজ নব যুগের উপযোগী হয়ে পুনর্গঠিত হয় এবং নব যুগের উপযোগী মানুষ যোগাতেও সমর্থ হয়। এই জীবনীশক্তির লক্ষণ কি কি? সংক্ষেপে বলা যায়, সমাজমধ্যে সেই নিত্য জাগ্রত ভাব, যা মানুষকে দেশের ও কালের পরিবর্ত্তন সকল লক্ষ্য করতে এবং তার মধ্যে যা কল্যাণকর তার সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে শক্তি দান করে; এবং সেই মনুষ্যত্ব ও চরিত্রসম্পদ, যা, নবাগত অবস্থা যাই হোক না কেন, তার ভিতরে স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝে নিতে ও স্থির ভাবে সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করতে মানুষকে সমর্থ করে তোলে।

দেশকালের সঙ্গে যোগ রক্ষা

দেশের ও কালের সমুদয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যোগ রক্ষার কথা চিন্তা করা যাক। মহাত্মা রামমোহন রায় এ বিষয়ে অতন্দ্রিত ছিলেন বলেই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম সম্ভব হয়েছে এবং ব্রাহ্মসমাজ তাঁর প্রথম শতাব্দীর ইতিহাসের অধিকাংশ কর্ম্ম সম্পন্ন করতে পেরেছেন। নবযুগের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং সেই নবযুগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকার প্রদান করবার প্রতি দৃষ্টি রেখে ব্রাহ্মসমাজের ও ভারতের নবযুগের জন্মদাতা রামমোহন তাঁর সমুদয় কার্য্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। রামমোহনের বিবিধ গুণের মধ্যে ভাবী যুগের প্রতি দৃষ্টি এবং পৃথিবীর সমুদয় ভাবপ্রবাহের

সঙ্গে যোগ,—এ দুটি গুণ অতিশয় উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। রামমোহনের চরিত্র হতে এই দুই বিশেষত্ব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত না হলে ব্রাহ্মসমাজ অতীত যুগের ব্রহ্মবাদী সম্প্রদায়সকলের ন্যায় কেবল জ্ঞানালোচনা নিয়েই তৃপ্ত হয়ে থাকতেন; সংস্কারক সমাজ হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না এবং স্বীয় গতিবেগের দ্বারা ভারতে অগ্রগতি সঞ্চার করতে পারতেন না।

রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে কতকগুলি নূতন কর্ত্তব্য এসে পড়ে। বাইরের বাধা বিঘ্ন হতে আত্মরক্ষা করে একটি নূতন 'সমাজ' রূপে, অর্থাৎ বিশিষ্ট ধর্ম্মমত ও বিশিষ্ট রীতিনীতিসম্পন্ন একটি পরিবারসমষ্টি রূপে দণ্ডায়মান হবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে আপনার প্রধান শক্তি প্রয়োগ করতে হলো। এ যুগে আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও তৎপরবর্ত্তী নেতাদিগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্রাহ্মসমাজ দেশ মধ্যে একটি বিশিষ্ট সমাজ হয়ে দাঁড়ালেন; আপন আদর্শ অনুযায়ী কর্ত্তব্য নির্ণয় করে নিলেন, এবং সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য যথাসম্ভব সুগঠিত নানা কর্ম্মব্যবস্থা প্রণয়ন করে নেন।

রামমোহনের পরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পুরুষদিগের দৃষ্টি বহুল পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজেরই ধর্ম্মজীবনকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করবার দিকে নিবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। তার সুফল আমরা এখনও ভোগ করছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও আচার্য্য শিবনাথ, এই দুই জনের নাম উল্লেখ করতে পারা যায়। এই দুজনের নাম একত্র উল্লেখ করাতে এবং অন্য কাহারও নাম উল্লেখ না করাতে কেউ যেন এরূপ মনে না করেন যে, আমি ইঁহাদিগের উভয়ের তুলনা করছি, অথবা ইঁহাদিগের যুগের আর সকল নেতার প্রভাব অস্বীকার করছি। আমি দু'যুগের নিদর্শন স্থানীয় (typical) দুই নেতারূপে ইঁহাদের নাম

করছি মাত্র। ইঁহাদিগের যত্ন ও চেষ্টার ফলে উভয় যুগে যে-সকল বিশ্বাসী, ত্যাগী ও আত্মোৎসর্গশীল মানুষ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসের যে-কোন ধর্ম্মবীর ও martyrগণের সঙ্গে তাঁদের নাম করা যেতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের সহস্র ত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় যে, সকল নরনারীর সাম্যের ও সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার পবিত্র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এরূপ একটি ধর্ম্মমণ্ডলী সভ্যজগতে আর কোথাও বিদ্যমান নাই।

ব্রাহ্মসমাজের যত দোষ ত্রুটি, যত দুর্ব্বলতা ও বিশৃঙ্খলা, তজ্জন্য আমরা দায়ী; কিন্তু বিধাতা তাঁর প্রসাদ আমাদের যোগ্যতা অতিক্রম করে ব্রাহ্মসমাজকে বিতরণ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতা ও বল উভয় বিষয়েই আমাদের চক্ষুষ্মান হওয়া ভাল। কল্পনাপ্রসূত উদ্যমহীন অন্ধ আত্মশ্লাঘা এবং কল্পনাপ্রসূত, ইতিহাসে দৃষ্টিহীন, ভাবুকতাময় নিরাশা উভয়ই সমভাবে বর্জ্জনীয়। ক্রমাগত 'আমাদের কিছু নাই' 'আমাদের কিছু নাই' বলতে থাকলে ঘোর অপরাধ হয়। ইহা অকৃতজ্ঞতার ভাষা; ভগবান আমাদিগকে যথেষ্ট দিয়েছেন, সেজন্য আমাদের বরং কৃতজ্ঞ ও উৎসাহিত থাকাই উচিত। ইহা অসত্য-পরায়ণতার ভাষা; সত্যানুরাগী মানুষ কখনও ঐরূপ কথা বলতে পারে না। ইহা দায়িত্ববিহীনতার ভাষা; যীশুর বর্ণিত যে-অকর্ম্মণ্য ভৃত্য প্রভুর গচ্ছিত ধনের সদ্ব্যবহার করে নাই, তার যোগ্য ভাষা।

আমাদের বিগত যুগের নেতাগণ তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টাতে আমাদের বর্ত্তমান বংশের জন্য একটি নিরাপদ ও সুগঠিত সমাজ রচনা করে দিয়ে গেছেন; ভারতে একটি যশের ও সুনামের ধারা প্রবর্ত্তিত করে গেছেন; ভাবী যুগে ভগবানের কাজ ভাল করে সম্পন্ন করবার জন্য আমাদের হাতে অর্থ রেখে গেছেন। আমাদিগকে এই সকল সুবিধা

ও সুযোগের দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে, তার সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং ভাবী যুগের জন্য নানা ভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

যে যুগ সম্মুখে আসছে, এখন ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে শুধু আপনাতে আবদ্ধদৃষ্টি একটি সম্প্রদায় হয়ে জীবিত থাকলে চলবে না; কেবল আপনার অন্তর্ভুক্ত মানুষ, মন্দির ও প্রতিষ্ঠানসকলের প্রতি দৃষ্টি রাখা যথেষ্ট নয়। ব্রাহ্মসমাজ যে ভারতের জন্য ও জগতের জন্য, এ কথা আবার উজ্জ্বল ভাবে অনুভব করবার সময় এসেছে।

কালের ও দেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যোগরক্ষার ভাবটি রামমোহন রায়ের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল বলে এক শতাব্দী পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের দ্বারা ভারতে বহুবিধ নব সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল; ব্রাহ্মসমাজ তারই অন্তর্গত একটি নব সৃষ্টি। এক শতাব্দী পরে আবার সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত। ভাবী যুগের আহ্বান এসে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে করাঘাত করছে। ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে এখন দুই কাজ। ব্রাহ্মসমাজকে এখন আপনার সম্বন্ধেও মনোযোগী থাকতে হবে; আবার বাইরের প্রতি দৃষ্টি রেখে, তদনুসারে আপনার প্রকৃতিকে ও কর্ম্মব্যবস্থাকে নবীভূত করে নিতে হবে।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, এই উভয় দিকে যুগপৎ দৃষ্টি রক্ষা করা সম্ভব? আমি বলি, শুধু সম্ভব নয়, তা-ই স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ প্রণালী। সেখানে বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টি নিত্য জাগ্রত এবং তার সঙ্গে যোগ নিত্য সতেজ, সেখানেই মানুষ আপনার প্রতি কর্ত্তব্যও উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে পারে। যে-পরিবার একান্ত ভাবে নিজের মানুষগুলিকে নিয়েই ব্যস্ত, তার মানুষগুলির মধ্যে আত্মিক কল্যাণ ও তেজস্বী জীবন রক্ষা পায় না। যে-পরিবারে জগতের সুখ দুঃখ ও নানা প্রয়াসের সঙ্গে যোগ সতেজ, সেই পরিবারেই তা উত্তমরূপে রক্ষা পায়। ব্রাহ্মসমাজ ও

ব্রাহ্মসমাজের পরিবারসকল কখন প্রকৃত মানুষের জন্ম দিয়েছেন?—যে-যে সময়ে দেশের কল্যাণের জন্য ও দেশের অকল্যাণ দূরীভূত করবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ নিরন্তর শ্রম করেছেন। দেশ এখন আর জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য, কল্যাণকর্ম্মের সূচনার জন্য, সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রগতির জন্য ব্রাহ্মসমাজের মুখাপেক্ষী নয়। বর্ত্তমান কালে যখনই দেশের বিবিধ প্রয়াসের সঙ্গে আমাদের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়, তখনই আরামলোলুপতা ও আমোদপ্রিয়তা আমাদের গ্রাস করে; তখনই আমরা উন্নতির স্রোত হতে দূরে পতিত বদ্ধ জলাশয়ের মত পচ্‌তে থাকি।

ব্রাহ্মসমাজকে ভাবী যুগের উপযোগী হতে হলে কোন্ কোন্ বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে, তৎসম্বন্ধে আমার কয়েকটি চিন্তা আমি নিবেদন করি।

কর্ম্মীর শিক্ষা ও কর্ম্মী নির্ব্বাচন

প্রথম, কর্ম্মীর শিক্ষা ও কর্ম্মী নির্ব্বাচন। যেমন বস্তুরাজ্যে, তেমনই ধর্ম্মরাজ্যে, এক বস্তুর দ্বারা অন্য বস্তুর কাজ সম্পন্ন করা যায় না। গণিতজ্ঞ ব্যক্তি নিজ জ্ঞানের দ্বারা ইতিহাসের কোন প্রশ্ন মীমাংসা করতে পারেন না। ইতিহাসে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিজ জ্ঞানের দ্বারা গণিতের প্রশ্ন মীমাংসা করতে পারেন না। গণিত ও ইতিহাস, উভয় প্রকার জ্ঞানের প্রত্যেকটিরই মূল্য আছে; এবং একের দ্বারা যে অন্যের কাজ নির্ব্বাহ হয় না, তা উভয়ের কোনটির পক্ষে নিন্দার কারণ নয়; এতদ্দ্বারা উভয়ের মধ্যে কাহারও আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা অথবা হীনতা প্রতিপন্ন হয় না। প্রত্যেকের মূল্য পৃথক; প্রত্যেকের শিক্ষা-প্রণালীও পৃথক।

তেমনি ধর্ম্মজীবনে, বিশ্বাস স্বার্থত্যাগ আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি আত্মার এক অঙ্গের বস্তু। আবার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা শৃঙ্খলা কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি আত্মার অন্য অঙ্গের বস্তু। প্রথম শ্রেণীর গুণসকল থাকলেই দ্বিতীয়

শ্রেণীর গুণসকল মানুষের প্রকৃতিতে আপনা-আপনি উৎপন্ন হয় না। বিশ্বাসী মানুষমাত্রই যে কাজের মানুষ হবেন, তা নয়। বিশ্বাস স্বার্থত্যাগ আত্মোৎসর্গ প্রভৃতির শিক্ষা দীক্ষা একরূপ; কর্ত্তব্যনিষ্ঠা শৃঙ্খলা কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতির শিক্ষা দীক্ষা অন্যরূপ।

ব্রাহ্মসমাজে অধ্যবসায়শীল দৃঢ়চিত্ত নির্ভরযোগ্য কর্ম্মীর বড়ই প্রয়োজন। এরূপ কর্ম্মী কিরূপে প্রস্তুত হবে? কর্ম্মক্ষেত্র হতে উত্থিত নব নব বাধা বিঘ্ন দেখে যে মানুষ পশ্চাৎপদ হবে না, যে-মানুষ শুধু উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করবে না, কিন্তু অবলম্বিত কার্য্য সমাপন না করে উঠবে না,—কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে যে-মানুষ উদার ভাবে মিশতে পারবে ও একযোগে কাজ করতে পারবে, এমন কাজের মানুষ শুধু বিশ্বাস-বলের দ্বারা ও আত্মোৎসর্গের ভাবের দ্বারা গড়ে না। এমন মানুষ হ'তে হলে তাকে কার্য্যক্ষেত্রের স্বতন্ত্র শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

এখানে যদি কেউ বলেন, "যে-আত্মোৎসর্গ মানুষকে কাজের মানুষ করে গড়ে তোলে না, তা প্রকৃত আত্মোৎসর্গ নয়," তবে আমি শ্রেষ্ঠ অর্থে তা স্বীকার করি। প্রকৃত-পক্ষে বিশ্বাস স্বার্থত্যাগ আত্মোৎসর্গ, এ সকল আদর্শ আমরা পাশ্চাত্য ধর্ম্মসাধনা হতে পেয়েছি। যদি আমাদের জাতীয় প্রকৃতি এ সকল আদর্শের অনুকূল হ'ত, তা হলে আমরা বলতাম. "আত্মোৎসর্গের ভাবের দ্বারাই মানবচরিত্রে কাজের মানুষ হবার উপাদানসকল প্রস্তুত হওয়া উচিত।" যে-খ্রীষ্টীয় সেবক যীশুর প্রেমে পরিচালিত হয়ে আপনাকে জগতের সেবার কার্য্যে উৎসর্গ করেন, তাঁর অন্তরে এই ভাব জেগে থাকে যে, "আমি প্রভুর কার্য্য সমুচিতরূপে সম্পন্ন করবার জন্য সর্ব্ব বিষয়ে সুদক্ষ হব। যে-দেশে যাব সে-দেশের ভাষা শিখে নেব; ডাক্তারী শিখব; পল্লীসংস্কারের কাজ

শিখব; মিশনের হিসাবপত্র রাখতে, বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করতে শিখব। আমি আমার হৃদয়, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাত-পা সবই প্রভুর কাজের জন্য নিপুণ করে নিয়ে তাঁর কার্য্যক্ষেত্রে নামব।" যে-নারীর অন্তরে প্রকৃত প্রেম জেগেছে, সে নিজ প্রণয়াস্পদের সংসারে শুধু হৃদয়ের প্রেম-বস্তুটুকু নিয়েই প্রবেশ করে না। তার প্রেম যদি প্রকৃত প্রেম হয়, তবে তা-ই সে নারীকে গৃহকর্ম্মে সুদক্ষ হতে, গৃহিণীপনার সমুদয় কার্য্য শিখে নিতে প্রেরণা দান করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত আমরা বিশ্বাস স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ, এই সকল ভাবকে খ্রীষ্টীয় আদর্শ অনুসারে গ্রহণ ও সাধন করতে পার নাই। আমাদের ভারতীয় ভাবুক প্রকৃতিতে ঐ সকল আদর্শ ভাবোচ্ছ্বাসের দিকেই চলে যাচ্ছে; শিক্ষার দ্বারা তিল তিল করে আপনাকে প্রস্তুত করে নেবার দিকে যাচ্ছে না। ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসী ত্যাগী আত্মোৎসর্গশীল মানুষেরা যে-পরিমাণে দুঃখ দারিদ্র্য বহন ক'রে ঐ সকল গুণের পরিচয় প্রদান করেছেন, সেই পরিমাণে কর্ম্মক্ষেত্রে কাজের মানুষ হয়ে ঐ সকল গুণকে সার্থক করতে পারেন নাই। "আমাকে ভগবান যা কিছু শক্তি সামর্থ্য দিয়েছেন, আমার যতদূর সাধ্য তার প্রত্যেকটিকে মেজে ঘষে বাড়িয়ে ফুটিয়ে ভগবানের কাজে লাগাব," ঐ গুণসকল মানুষকে এই প্রকার সাধনায় নিযুক্ত করে নাই।

এই জন্যই বলি, ধর্ম্মজগতেও এক বস্তুর দ্বারা অন্য বস্তুর কাজ হয় না। শুধু বিশ্বাস ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সুশৃঙ্খলা ও কর্ম্মকুশলতার অভাবের পূরণ হয় না।

ভাবী যুগে ব্রাহ্মসমাজকে ভারতক্ষেত্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসকলের সমকক্ষতা করতে হলে এ-বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে; এ বিষয়ের

শিথিলতা দূর করতে হবে। শুধু বিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতির উপরে নির্ভর না করে মানুষকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও 'কাজের মানুষ' করে গড়ে তুলবার জন্যও বিধিমত চেষ্টা করতে হবে। যদি দেখা যায় যে, আমাদের মানুষগুলি যে-কাজে নিযুক্ত তৎসম্বন্ধীয় যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করে নাই, তাদের প্রকৃতি যেমন শিথিল ছিল তেমনই শিথিল আছে, কর্ম্মদক্ষতার হিসাবে তারা অতি নিম্নশ্রেণীতে গণ্য এবং এই সকল দোষ ঢাকা দেবার জন্য convenient formula রূপে আমরা 'বিশ্বাস' 'ত্যাগ' প্রভৃতি কথাকে ব্যবহার করছি,—তবে তাতে আমাদের অসারতাই প্রতিপন্ন হবে; এবং ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ পশ্চাতের আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন।

তারপর কর্ম্মী নির্ব্বাচনের কথা। সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে ব্রাহ্মসমাজের কাজে আহ্বান করতে, আকৃষ্ট করতে, নিযুক্ত করতে আমরা দায়ী। যে-মানুষটি ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আপনাকে অর্পণ করবেন, তাঁর মনের ভাব অবশ্যই এরূপ হওয়া চাই যে, "আমি যদি গৃহীত হই, তবে আমি ধন্য হব।" অপর দিকে, ব্রাহ্মসমাজের মনের ভাব এরূপ হওয়া চাই যে, "ব্রাহ্মসমাজের কাজে আমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে এনে বসাব।" সংসারে যে-ভাবে চললে সংসারের কারবার একদিনও চলে না, ব্রাহ্মসমাজের কাজে অনেক সময়েই সেরূপ করা হয়; প্রথম শ্রেণীর মানুষদের, যোগ্যতম মানুষদের পাবার জন্য কোন চেষ্টাই করা হয় না। কর্ম্মী নির্ব্বাচনের দুই প্রণালী আছে। প্রথম প্রণালী, যে-কেহ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম করতে প্রস্তুত আছি বলে আপনাকে উপস্থিত করেন, তাঁদের মধ্য হতে মানুষ বেছে নেওয়া। দ্বিতীয় প্রণালী, শ্রদ্ধেয়তম ও যোগ্যতম ব্যক্তিদিগের নিকটে স্বয়ং গিয়ে তাঁদের সাদরে ও সসম্মানে সমাজের কার্য্য গ্রহণ করতে অনুরোধ

করা। আমরা কেবল প্রথম প্রণালীটিই অনুসরণ করে আসছি; এবং এরূপ করার সুফল ও কুফল উভয়ই ভোগ করছি।

ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব

আমার দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় এই যে, ভাবী যুগে আমরা ধর্ম্মকে কি-আকারে জগতের সম্মুখে ধরব? এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে আমরা যে-ভাবে মানুষের সম্মুখে ধরে আসছি, তাতে কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক আছে কি না? আমার মনে হয়, কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

ঈশ্বর মানুষকে দয়া করেন, ইহা সত্য। কিন্তু কোনও সত্য সত্য হলেও কেবল সেই একটিমাত্র সত্যকে সর্ব্বদা মনের সামনে রাখলে এবং তারই উপরে মনের সমুদয় ঝোঁকটা দিলে পূর্ণ সত্যের কিয়দংশকে আবরণ করা হয়; পূর্ণ সত্যের অবমাননা করা হয়। আমি বলি, ঈশ্বর মানুষকে দয়া করেন, ইহা সত্য বটে; কিন্তু ভাবী যুগে এর সঙ্গে আর একটি সত্যকে যোগ কর; তা এই যে, ঈশ্বর মানুষকে শ্রদ্ধা করেন। সংসারে পিতা বয়স্ক পুত্রকে শ্রদ্ধা করেন। তাকে শুধু দয়া করেন না, শুধু আদর দেন না; কিন্তু তাকে আদেশ দেন, তার উপর কাজের ভার দেন, তার উপরে নির্ভর করেন। বয়স্ক পুত্রের প্রতি পিতার এই শ্রদ্ধা না থাকলে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ক্ষুদ্র থেকে যায়; পুত্রের শৈশবকালে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ যেরূপ অপূর্ণ ও অবিকশিত ছিল, তার অপেক্ষা উন্নত আকার ধারণ করতে পায় না। ধর্ম্মরাজ্যেও এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

ব্রাহ্মসমাজে কখনও কখনও এমন ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করা হয়, যাতে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত, "ঈশ্বর দয়াল ও উপাসক দয়া-ভিখারী," এই একটি মাত্র সুর শুনতে পাওয়া যায়। এমন কি, কখনও কখনও

আগাগোড়া এ অপেক্ষাও নীচু সুরে বাঁধা আরাধনা শুনতে পাওয়া যায়; তার সুরটি এই,—"আমরা ঈশ্বরের আদুরে ছেলে এবং ঈশ্বর আমাদের আবদার সহেন।" দেখা যায় যে, এরূপ আরাধনার আরম্ভ হতে শেষ পর্য্যন্ত একবারও এই নীচু সুর উঁচু হল না; "তুমি আদেশদাতা, আমি তোমার আদেশ লাভ করে ধন্য, তুমি আমাদের শ্রম দিয়ে ভার দিয়ে বেদনা দিয়ে ধন্য করেছ,"—এরূপ উন্নততর সুরের একটি কথাও আচার্য্য বলেন না। আমি বলি, ঐরূপ আরাধনার প্রত্যেকটি বাক্যও যদি সত্য হয়, তথাপি উহা মানুষকে 'মানুষ' করবে না। এই প্রকার কেবল এক দিকে ঝোঁক-দেওয়া উপাসনা মানুষের ক্ষতি করে।

ভাবী যুগে এর পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। দেখা যাচ্ছে, মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জ্জন,—ইহাই ভাবী ভারতের বিশেষ বাণী হবে। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মকে, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকে এই নূতন সুরে বেঁধে নিতে হবে।

এই কারণে, দুঃখ সম্বন্ধেও ধর্ম্মের দৃষ্টিকে পরিবর্ত্তিত করতে হবে। যে-বাড়ীর ছেলেদের সৈনিকরূপে শিক্ষিত করা অভিভাবকগণের অভিপ্রেত, সে-বাড়ীতে ছেলেদের অধিক দিন দিদিমার কাছে রাখা হয় না; একটু পড়ে গেলেই, একটু আঘাত লাগলেই যিনি 'আহা' বলবেন, গায়ে হাত বুলাবেন, এমন কোমলপ্রকৃতির গুরুজনের কাছে অধিক দিন রাখা হয় না। শীঘ্রই তাদের কঠোরতর শিক্ষকের নিকটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মানুষের দুঃখের উপরে ধর্ম্মের যে একটি করুণ দৃষ্টি আছে, তা-ই এতকাল ধরে আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে এসেছে। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতি মানবজীবনের বিবিধ দুঃখে পরম ব্যথায় ব্যথিত হয়ে ধর্ম্মকে মানুষের নিকটে শান্তির ও সান্ত্বনার আকারে উপস্থিত করেছিলেন।

তদ্দ্বারা যুগে যুগে অগণ্য দুঃখী তাপী কত বল, কত আশা লাভ করেছে ! ইহা দুঃখ সম্বন্ধে ধর্ম্মের করুণ দৃষ্টি।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, দুঃখ সম্বন্ধে ধর্ম্মের আর একটি দৃষ্টিও আছে। দুঃখ কল্যাণ ; দুঃখ প্রয়োজন ; দুঃখ বরণীয় ; দুঃখ আমাদের মানুষ করে। একজন ধার্ম্মিক কবি বলেছিলেন, sorrows humanise our race ; এ কথা শুধু কোমলতা-সঞ্চার অর্থেই সত্য নয়। মনুষ্যোচিত দৃঢ়তা সঞ্চার অর্থেও সত্য। ভারতে এমন যুগ আসছে যখন সৈনিকের ন্যায় আনন্দে দুঃখ বরণের আদর্শটি মানুষের মনে বহুল পরিমাণে কার্য্য করবে। সেই ভাবী যুগেও যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম মানুষের দুঃখ-বেদনার সময়ে কেবল 'আহা' 'আহা' বলেন, তবে এ ধর্ম্ম আর সেই ভাবী যুগের উপযোগী হতে পারবেন না। আমাদের কবির ভাষায় বলতে হবে,—

অন্ধকারের উৎস হ'তে উৎসারিত আলো,
সেই ত তোমার আলো !
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো,
সেই ত তোমার ভালো !
পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ,
সেই ত তোমার গেহ !
সমরঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ,
সেই ত তোমার স্নেহ !

আর একটি কথা এই যে, ভাবী যুগে ধর্ম্মের প্রধান ঝোঁকটি পূজা হতে সরিয়ে এনে চরিত্রের উপরে ফেলতে হবে। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করা এবং সেই উপাসনার একটি শ্রেষ্ঠ প্রণালী মানুষকে শিক্ষা দেওয়া,—ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান মূল্য নয়। সর্ব্বপ্রধান মূল্য এই যে, এ-ধর্ম্মের প্রসাদে সেই ঈশ্বরকে মানুষ নিজ জীবনে ও আচরণে পরম প্রভু বলে অনুভব করে এবং তাঁর চক্ষে যা পবিত্র ও সুন্দর, মানুষ সেই ভাবে নিজ জীবন গঠন করতে প্রাণপণ করে। যাতে ব্রাহ্মধর্ম

বললে মানুষ বোঝে 'নির্ম্মল উন্নত ও উদার চরিত্র',—আগামী যুগে সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগী হতে হবে।

ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতীয় জনসমাজ

আমার তৃতীয় চিন্তার বিষয় এই যে, ভাবী যুগে ব্রাহ্মসমাজ এই দেশের জনসমাজের ভিতরে কি ভাবে কাজ করবেন।

ভাবী যুগে মানবের সর্ব্ববিধ সেবার উদ্যোগকে ব্রাহ্মসমাজে অনেক বিশালতর করে তোলা আবশ্যক হবে। যে-মানুষ বা যে-সমাজ মানুষের সেবা না করে, তার 'প্রচার', তার মুখের বা লেখনীর ভাল কথা কেউ শুনতে চায় না। অতীত যুগে ব্রাহ্মসমাজ যে দেশের মনোযোগ এত অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করেছিলেন, তার কারণ এ নয় যে ব্রাহ্মসমাজ খুব ভাল করে সত্য প্রচার করতে পেরেছিলেন। প্রকৃত কারণ এই যে, তখন ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম নীতি সমাজসংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মানুষের সেবা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজকে ভারতে জীবিত সমাজরূপে দণ্ডায়মান থাকতে হলে বর্ত্তমান সময়ে জনসেবার জন্য এর যে-পরিমাণে উদ্যোগ আছে, তা শতগুণ বর্দ্ধিত করতে হবে। মানুষের মন এখন কল্যাণকর্ম্মের দ্বারাই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মূল্য নির্দ্দেশ করে। যদি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে দেশের মানুষের মনে এই ধারণা দাঁড়িয়ে যায় যে, এদের মতামত অতি সুসংস্কৃত ও সুমার্জ্জিত বটে, কিন্তু এরা দেশের কল্যাণের জন্য বিশেষ কিছুই করে না, তবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আর দেশের মানুষের শ্রদ্ধার দৃষ্টি থাকবে না।

জাতিভেদ সম্বন্ধে 'প্রচারের' আবশ্যকতা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কম, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেবার কাজ, অর্থাৎ অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের উন্নত করবার কাজ বহু শতাব্দী ধরে চলবে। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজেরই দায়িত্ব,

অধিকার, ও যোগ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভাবী যুগে এ বিষয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রয়াস শতগুণ বৰ্দ্ধিত করতে না পারলে আমরা ঘোর অপরাধে অপরাধী হব।

জাতিভেদ সম্বন্ধে আগামী যুগে আর একটি কাজে আমাদের মন দিতে হবে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভেদ লোপ করবার প্রশ্নের চরম সমাধান, বিবাহের দ্বারা রক্ত-সংমিশ্রণ। প্রচার বক্তৃতা প্রভৃতি উপায়, এই উপায়ের তুলনায় কিছুই নয়। যাঁরা এই উপায়টি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন, তাঁরা প্রশ্নটি নিয়ে খেলা করছেন মাত্র। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুর কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক রক্ত-সংমিশ্রণ প্রচলিত করেছেন; কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। যে-সকল স্থলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শিক্ষা ও দৈনিক জীবনযাত্রায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমতা জন্মেছে, সেখানেও উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটা এখন সহজ নয়। কিন্তু ইহা ঘটাতে না পারলে ভারতের ঐক্য, ভারতের কল্যাণ কখনও সম্ভব নয়। ভাবী যুগে ব্রাহ্মসমাজকে এ বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। সময় এসেছে, এখন সাহস চাই। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাহ হলে প্রথম প্রথম উত্তরাধিকার প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে; দুইটি পরিবারের রীতিনীতির অসামঞ্জস্যবশতঃ কিছু কিছু পারিবারিক অশান্তিও সৃষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু প্রত্যেক সংস্কারের বেলাতেই এরূপ হয়। নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা নিয়ে বিগত যুগে কত সমস্যা ও কত অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। আবার, আমরা চাই বা না চাই, ইউরোপীয় স্ত্রী নিয়ে যাঁরা ঘর করেন, তাঁদের পরিবারগুলি আমাদের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। তবে কি আমরা কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মিলন বিষয়েই সাহস করতে পারব না? আমার মনে হয়, ভারতের হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান, আর্য্য দ্রাবিড় সেমিটিক মঙ্গোলীয়, সমুদয় শ্রেণীর মানুষকে বৈবাহিক সূত্রে

বাঁধবার একটি সাহসী ও বিশাল আয়োজন করতে না পারলে ভাবী যুগে ব্রাহ্মসমাজ এ দেশে আপনার অস্তিত্ব সার্থক করতে পারবেন না।

মা ভৈঃ

আমার শেষ কথা, "মা ভৈঃ"। সকলে চরিত্রমূলক ধর্ম্মে আস্থা রাখ, এবং মা ভৈঃ, ভয় কোর না। যিনি এক ও শাশ্বত, যিনি যখন যা প্রয়োজন তার বিধান করেন, তিনি আছেন। তাঁরই বাণী, মা ভৈঃ। জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণ অপেক্ষা বড় শক্তি নাই; মানবজগতে চরিত্রশক্তি অপেক্ষা বড় শক্তি নাই। জড়জগতের মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি সমুদয় বস্তুকে স্বস্থানে রাখে; আবার কোনও বস্তুর বা বস্তুসমষ্টির ভারকেন্দ্র স্থানচ্যুত হলে সমুদয় বস্তুকে বিপর্য্যস্ত করেও পুনরায় সামঞ্জস্য বিধান করে। ভূমিকম্প কেন হয়? দীর্ঘকালে ভূস্তর-সকলের ভার-পরিবর্ত্তন ঘটলে পুনরায় সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হয় বলে।

তেমনি মানবজগতে বিধাতার অপ্রতিহত নিয়মে চরিত্রশক্তি আপনার কার্য্য করে যায়। তুমি যদি কেবল প্রতিভার অথবা সুযোগের বলে আজ উচ্চ স্থানে আরূঢ় হয়ে থাক, তবে তার উপর ভরসা করো না; বিধাতার গূঢ় শক্তিসকল তোমাকে এমন আন্দোলিত করবে যে, চরিত্র হিসাবে তুমি যে-স্তরের যোগ্য মানুষ, সেই স্তরে তোমাকে নেমে আসতেই হবে। আবার, তুমি যদি সুযোগের অভাবে এখন মানুষের অবজ্ঞার তলায় পড়ে গিয়ে থাক, তবে ভয় করো না; চরিত্রের দ্বারা তুমি যে সম্মানের যোগ্য তা তুমি একদিন নিশ্চয় লাভ করবে।

চরিত্রশক্তির কাজ ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য, মানব-রচিত সমাজ সমিতি শ্রেণী সঙ্ঘ জাতি প্রভৃতির সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। ভাবী ব্রাহ্মসমাজের সফলতা-বিফলতা, সবলতা-দুর্ব্বলতা, জয়-পরাজয় বিষয়ে

একটিমাত্র ভাববার বিষয় আছে; তা এই যে, আমরা জীবন ও চরিত্রের সাধনা করতে পারছি কি না। জনকোলাহলের দ্বারা, সভাসমিতির দ্বারা, অথবা সংবাদপত্রের ঘোষণার দ্বারা মানবসমাজে কোন স্থায়ী বস্তু গড়ে না অথবা মানবসমাজের স্তরসকল স্থায়ী ভাবে সজ্জিত হয় না। কিন্তু জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ক্রিয়ার ন্যায়, মানবজগতে চরিত্র-শক্তির এক বিশাল গূঢ় অথচ অপ্রতিহত ক্রিয়া নিরন্তর চলেছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়; জাতি সকলের উত্থান ও পতন তার সাক্ষ্য দেয়; সভ্যতার উদয় ও বিলয় তার সাক্ষ্য দেয়। সেই শক্তির ক্রিয়ার ফলে, মানবজগতে যা সারবান তা রক্ষা পায়, অন্তে তা-ই জয়যুক্ত হয়; যা অসার তা লুপ্ত হয়, তার চিহ্ন ইতিহাস হতে মুছে যায়। যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তবে মানবজগতের ভিত্তিগত এই চরিত্র-শক্তিতে বিশ্বাস কর। মানবজগতে তাঁর ক্রিয়ার ইহাই প্রধান ধারা। তাঁর দিকে তাকিয়ে জীবনগত চরিত্রগত ধর্ম্মের সাধনা কর। ভয় নাই! শতাব্দী পূর্ব্বে রামমোহন রায় আপনাকে বিধাতার হাতে সমর্পণ করেছিলেন; তাই বিধাতা রামমোহনের মধ্য দিয়ে তাঁর এক নব সৃষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। এই যুগে যদি আমরা তাঁর হস্তে আপনাদিগকে তেমনি করে সমর্পণ করি, তবে তিনি এই আমাদের মধ্য দিয়েই আবার নব যুগে তাঁর নব শক্তি নব সৃষ্টি প্রকাশ করবেন।

১২ই মাঘ, ১৩৪০

আত্মপরীক্ষা ও আত্মবিলোপ

যাঁরা ঈশ্বরের সেবক হ'তে ইচ্ছা করেন, তাঁদের ধর্ম্মসাধনে আত্ম-পরীক্ষা ও আত্মবিলোপ, এ দুটির বড়ই প্রয়োজন হয়। আজকালকার যুগে এ বিষয়গুলি সাধারণতঃ বড়ই অনাদৃত। পূর্ব্বে এমন এক সময় ছিল যখন সংসারে সফলতা লাভ করবার জন্যও মানুষেরা ধর্ম্মপ্রাণতা ও নম্রতার প্রয়োজন অনুভব করতেন। আজকাল অনেকেরই মত এই যে, সংসারে সফলতা লাভ করতে হলে, জয়ী হতে হলে জগতের সম্মুখে আপনার শক্তি ও দাবী প্রকাশ করা প্রয়োজন। যারা লাজুক প্রকৃতির মানুষ, যারা নিঃসঙ্কোচে সংসারের সম্মুখে অর্থের সম্মানের অথবা অধিকারের দাবী প্রকাশ করতে পারে না, তারা আজকাল নিন্দিত। Inferiority complex, Defeatist attitude প্রভৃতি কতকগুলি নিন্দাসূচক নূতন বাক্য আজকাল সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি, দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তিকে সবল করবার জন্য যেমন শিক্ষালয় ও শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে, শুনতে পাই, যারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের নিত্য-সঙ্কুচিত, নিরভিমান ও দাবী প্রকাশে অক্ষম মানুষ, তাদের প্রকৃতিতে আত্ম-নির্ভর ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাবটি সঞ্চার এবং বৃদ্ধি করবার জন্যও নাকি আমেরিকাতে সেরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর এই শ্রেণীর মানুষের কাছে আত্ম-ঘোষণার কিছু মূল্য থাকতে পারে; কিন্তু আত্ম-পরীক্ষার অথবা আত্মাবমাননার কোন মূল্য নাই।

আত্মপরীক্ষা

চারিদিকের এই হাওয়ার প্রভাব যেন কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম্মজগতেও প্রবেশ করেছে বলে সন্দেহ হয়। এ যুগে যেন ধর্ম্মসমাজেরও মূল্য হিসাব করা হয় তার প্রতিষ্ঠানের ও কার্য্যের সফলতার দ্বারা; তার মানুষগুলির চিত্তের ব্যাকুলতার ও আত্মসমর্পণের ভাবের দ্বারা নয়।

এ বিষয়ে ধর্ম্মরাজ্যের অভিজ্ঞতা সংসারের ঐ নূতন শিক্ষার ঠিক বিপরীত। ধর্ম্মরাজ্যে আত্মপরীক্ষা, আত্মাবমাননা ও আত্মসমর্পণ হতেই শক্তির জন্ম হয়। আত্ম-ইচ্ছা চূর্ণ করে যে মানুষ ভগবানের ইচ্ছাতে একান্তভাবে আপনাকে অর্পণ করে, সে-ই আত্মাতে বল লাভ করে। যে-মানুষ সকলের পায়ের তলায় নিজেকে ফেলে দিতে পারে, সে-ই ধর্ম্মজীবনে দুর্জ্জয় শক্তি লাভ করে।

ধর্ম্মের দুইটি কাজকে পৃথক করে দেখা বড়ই প্রয়োজন। ধর্ম্মের একটি কাজ, মানবমনে উন্নত ভাব ও আকাঙ্খা সকল সঞ্চার করা; মানব-অন্তরের ভাবরাশিকে উচ্ছ্বসিত করে সে-সকলকে নিম্ন ভূমি হতে তুলে উন্নত ভূমিতে পৌছে দেওয়া। ধর্ম্মের এই ক্রিয়া আমাদের জীবনে আছে বলে আমরা আমাদের অভ্যস্ত জীবনের নিম্ন স্তরেই চিরকাল পড়ে থাকি না; উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করবার এবং উর্দ্ধে উঠবার অধিকারও লাভ করি।

ধর্ম্মের দ্বিতীয় একটি কাজ, মানুষের জীবন ও চরিত্র যে-স্তরে অবস্থিত রয়েছে, তাকে সেই স্তর সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন রাখা; সেই স্তরের সংগ্রাম সম্বন্ধে তার চিত্তকে ব্যাকুল রাখা; সেই স্তরের কর্ত্তব্যসকল বিশ্বস্ত ভাবে সম্পন্ন করতে তাকে বল দান করা।

১৮৯৭ সালে আমি ও ভাই সুন্দর সিংহ্জী শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে

প্রচার-যাত্রায় করাচী নগরে গিয়েছিলাম। একদিন আমরা দুজনে সমুদ্রতীরে বন্দরের বাঁধটি (breakwater) দেখতে গেলাম। বাঁধের দুই দিকের দুই দৃশ্যের মধ্যে আশ্চর্য্য পার্থক্য! বাঁধের এক দিকে বন্দর, অপর দিকে উন্মুক্ত সীমাহীন সমুদ্র। সমুদ্রের দিকে জল নিত্য তরঙ্গময়। এক এক বার সে তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠে সেই উচ্চ বাঁধের উপর পর্য্যন্ত আসতে লাগল, আমাদের বস্ত্রাদি ভিজিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু বন্দরের দিকে জল শান্ত এবং সে জল প্রায় বিশ হাত নীচে রয়েছে।

আমি তখন যুবক; আমার বয়স তখন ২৩ বৎসর। তারপর ৩৭ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। সেদিন সমুদ্রের যে-দৃশ্যটি দেখেছিলাম, আমার জীবনের এই ৩৭ বৎসরের বহু সংগ্রামে বার-বার সে দৃশ্য মনে এসেছে। সাগরজলের স্থায়ী স্তর কত নীচে; কিন্তু তরঙ্গের শীর্ষদেশ কত উচ্চ পর্য্যন্ত ওঠে! তেমনি এক একবার যেন ঈশ্বরের করুণা-বায়ু মানুষের সমগ্র প্রকৃতিতে তরঙ্গোচ্ছ্বাস উৎপন্ন ক'রে তাকে কত ঊর্দ্ধে তুলে দেয়; আবার ক্ষণ পরেই প্রকৃতিগত মাধ্যাকর্ষণ যেন তাকে নীচে নামিয়ে নিজের অভ্যস্ত স্তরে নিয়ে আসে। বিশেষ বিশেষ শুভ মুহূর্ত্তে জীবনে শুভ অনুপ্রাণন আসে; তা না হলে ধর্ম্মজীবন বাঁচতে পারত না। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের পক্ষে আত্মপরীক্ষার দ্বারা নিরন্তর ইহা নির্ণয় করবার প্রয়োজন হয় যে আমার চরিত্র, আমার স্থায়ী জীবন, কোন স্তরে আছে। এমন কি, "আমি কত দূর নীচু হতে পারি" এ-দিকেও মানুষের সর্ব্বদা প্রখর দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন হয়। স্বীয় চরিত্রের নিম্নতম ধাপ পর্য্যন্ত যার অন্তর্দৃষ্টি না থাকে, অনেক সময়ে সে-মানুষকে আত্মপ্রতারিত হতে হয়।

ভগবান আমাদের বাসনা-সংগ্রামে আমাদিগকে সাহায্য করবার

জন্ত তাঁর এই দয়ার বিধি রেখেছেন যে, নানা অনুপ্রাণনের দ্বারা তিনি আমাদের মানবীয় প্রকৃতিকে বার বার উত্তোলন করেন। আমরা উঠি, পড়ি, উঠি পড়ি। অবশেষে আমাদের উঠবার মুখে একবার হয়তো তাঁর দয়ার এমন একটি তরঙ্গোচ্ছ্বাস আসে, যা আমাদিগকে সেই সংগ্রাম হতে একেবারে উর্দ্ধে উত্তোলন করে নিয়ে যায়; তার পর আর সে-সংগ্রামে নামতে হয় না। কিন্তু যতদিন না সে-অবস্থা লাভ হয়, ততদিন নিরন্তর আত্মপরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়; আপনার স্থায়ী স্তরটি কোথায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন হয়।

কলিকাতার গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটা খেলে। ভাঁটার সময় নৌকার আরোহীদের পক্ষে ডাঙ্গায় নামা যে কিরূপ কষ্টকর, তা অনেকেই দেখে থাকবেন। যে-কাদা, যে ইট-পাটকেল ও খোলামকুচি, যে-সকল বিবিধ আবর্জ্জনা জোয়ারের সময় জলমগ্ন হয়ে অদৃশ্য থাকে, ভাঁটার সময় তা প্রকাশ পায়। নৌকার যাত্রীকে ভাঁটার সময় সেই কাদার মধ্যেই নামতে ও হাঁটতে হয়।

তেমনি ধর্ম্মরাজ্যের ব্যাপার। উৎসবের জোয়ারে জীবনের ও চরিত্রের কত পঙ্কিলতা, কত কদর্য্যতা, কত কর্কশতা আবৃত হয়ে যায়। কিন্তু দৈনিক জীবন আরম্ভ হওয়ামাত্র আবার সে-সকল প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। তখন মন হাহাকার করে বলে ওঠে, "হায় রে, যদি আমি সারা বৎসর উৎসবের প্রবাহেই থাকতে পারতাম!"

কিন্তু উৎসবের প্রবাহও তো সেই দয়ালেরই পরম দয়া! তিনি যে তাঁর করুণা-বায়ুতে আমার মতন অধমের অন্তরের ভাবরাশিকেও এক এক বার উচ্ছ্বসিত করে তোলেন, আমাকে আমার অভ্যস্ত পঙ্কিলতা হতে এক এক বার উর্দ্ধে উঠবার অধিকার দান করেন, এ তো তাঁরই পরম দয়া! আপনারা সকলেই জানেন, আমি উৎসবাদিতে ভক্তদের

পবিত্র মধুর বচন ও সঙ্গীত আস্বাদন করতে ও পরিবেশন করতে কত ভালবাসি। সে সময়ে যেন আমরা স্বর্গে বাস করি। কিন্তু তা বলে কি আমি কখনও ভুলতে পারি যে আমার অভ্যস্ত জীবন কোন্ স্তরে রয়েছে, এবং সে-স্তরে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রতিদিন কত সংগ্রাম করতে হবে?

১৯১৪ সালে আমি যখন বাঁকিপুরে রামমোহন রায় সেমিনারীর প্রধান শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত ছিলাম, সে সময়ের একটি ঘটনা বলি। তখন ভক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় পরলোকগত।

হিমালয়ের শোভা চিরদিনই আমার মনকে মুগ্ধ করে; সেখানে লব্ধ দেবপ্রসাদ আমি আমার বন্ধুগণকে বিতরণ করে বড় আনন্দ পাই। সে বৎসর মনে করলাম, আমি আমার পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে দার্জ্জিলিঙে যাব; পত্নীকেও আমার সেই আনন্দের অংশভাগী করব। একদিন প্রত্যুষে বাঁকিপুর থেকে যাত্রা করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছয়বার গাড়ী বদল করে এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভিড়ের ক্লেশ সহ্য করে অবশেষে দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা শিলিগুড়ি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। রাত্রি জাগরণে ও পথশ্রমে তখন আমার শরীর অস্থির। একটা কুলি আমার কাছ থেকে একবার পয়সা নিয়ে আবার দ্বিতীয় বার পয়সা আদায় করবার জন্য বড়ই অযথা গোলমাল আরম্ভ করে দিল; চোখ রাঙিয়ে আমার সঙ্গে মুখোমুখি করতে লাগল; লোক জমে গেল। অবশেষে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। লোকটিকে একটা চড় অথবা গলাধাক্কা (আমার এখন ঠিক মনে নাই) দিলাম।

কিন্তু আমার মন তৎক্ষণাৎ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। কোথায় আমি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ও ভগবানের দয়ার অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত অবস্থায় থাকব এবং তার আবেগে পূর্ণ হয়ে প্রিয়

সহধর্ম্মিণীকে কত কি দেখাব ও বলব, এই আশা মনে নিয়ে উৎসাহিত হয়ে দার্জ্জিলিঙের গাড়ীতে বসেছিলাম; তার পরিবর্ত্তে এ কি ঘটল! ভগবান যেন এক পলকে আমাকে দেখিয়ে দিলেন যে আমি কি-দরের মানুষ, আমার জীবন কোন স্তরে আছে। আত্ম-ধিক্কারের স্রোত যেন বাঁধ ভেঙ্গে এসে আমার মনকে প্লাবিত করতে লাগল। আমি আপনাকে আপনি বলতে লাগলাম, "তুমি যে একটা স্কুলে প্রধান শিক্ষকতার কাজ কর, তুমি একটা সমাজে আচার্য্যের কাজ কর, তুমি যে অমুক অমুক ধার্ম্মিক মানুষের দলে থাক, তুমি যে তোমার পত্নীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি গ্রহণ কর,—আজ দেখ, তুমি আসলে কি-মানুষ!" বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তর্য্যামী প্রভুর চরণে প্রার্থনা করলাম, "আমাকে দণ্ড দাও।" এই প্রার্থনা করতে করতে অনেক ক্ষণ পরে মন শান্ত হল। শেষে আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে পথের যা কিছু দ্রষ্টব্য, তা পত্নীকে দেখাতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু সেদিন ভগবান আমাকে দেখিয়ে দিলেন যে আমি এখনও ক্রোধের অধীন হতে পারি এবং বহু দূর নীচে নামতে পারি।

যেমন ক্রোধ, তেমনি প্রশংসাপ্রিয়তা ধর্ম্মজীবনের এক অতি কুটিল রিপু। ঈশ্বরের সেবায় পথে এসে এই শত্রুর সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করতে হয়। ব্রাহ্মসমাজের সেবাক্ষেত্রে যে-মানুষ নামে, তাকে সাধারণতঃ ভগবান প্রচুর নিন্দা ও গঞ্জনার দ্বারা শক্ত করে নেন। আমি মনে করি তা ভগবানের দয়ারই বিধি।

আবার আমি আমার নিজের জীবনের একটি কথা বলি; এটি তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি মনে করেছিলাম যে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আমার এত বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে; এখন আর নিন্দাতে আমাকে ক্লেশ দিতে পারবে না। মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তার মধ্যে এক দিন শুনতে পাওয়া গেল যে, আমার এক জন অতি প্রিয় বন্ধু,

যিনি আমাকে বড়ই ভালবাসেন, কোন একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ সংবাদ জানবার জন্য চেষ্টা না করে আমাকে ভুল বুঝেছেন এবং আমাতে কর্ত্তব্যের শিথিলতা আরোপ করে আমার তীব্র সমালোচনা করেছেন। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। সে বন্ধু আমার বড়ই প্রিয়; তিনি এমন বলেছেন! সেদিন এক বেলা আমার মন বড়ই অন্ধকার হয়ে রইল। রাত্রিতে অন্তর্য্যামীর চরণে অন্তরের সব দুঃখ ঢেলে দিয়ে শান্তি ভিক্ষা করে শয়ন করলাম। ভাবলাম, মনের সে গ্লানি দূর হয়ে গেল; আর দেখা দেবে না। পরের দিন সকাল বেলা সাধনাশ্রমের উপাসনায় যোগ দিতে দিতে দেখি যে, কোথা দিয়ে অলক্ষিত ভাবে সেই নিন্দার কথাটি আমার মনে আবার প্রবেশ করেছে, মনকে আবার পীড়া দিচ্ছে!

তখন মনে বড়ই ধিক্কার এল। আপনাকে আপনি বললাম, "এই না তুমি ঈশ্বরের জন্য সব ছাড়বে বলে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছ? ধিক্ ধিক্! তুমি কোথায় রয়েছ, তা একবার দেখ!" ভাঁটার সময় যে-কাদা দেখা যায়, আমার অন্তরে তাই যেন দেখা গেল। মনে বড় খেদ হ'ল,—সেই কাদায় কি আমাকে এখনও হাঁটতে হবে? অবশেষে বললাম, "আচ্ছা, প্রভুর নাম নিয়ে কাদা ভেঙ্গেই হাঁটব, চলব! আমি যে এখনও কাদার মানুষ, তা ভুলব না। আবার আমি নূতন করে প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করব

জীবনের এ-সকল সংগ্রামের সময়ে এমন মানুষদের দিকে তাকিয়ে বড় বল পাই যাঁরা এইরূপ বিষয়ে আত্মশাসনের দ্বারা দৃঢ় হয়েছেন। আমি আমার সেই সংগ্রামের দিনে বড়ই শান্তি পেয়েছিলাম, আমাদের সাধনাশ্রমের পরিচারক কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে স্মরণ করে। এক দিন একজন তাঁর মুখের উপরে তাঁকে তীব্র নিন্দা করেন। কাশীবাবু তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি আর আমায় কত মন্দ বলবেন? আপনি

যত বলছেন, তার চেয়েও আমি মন্দ। আমি তা আমার নিজের মনে জানি, কিন্তু আপনি তো তা জানেন না! জানলে আরো অনেক মন্দ বলতে পারতেন।"

অনেক ভাল লোক স্বীয় জীবনের নিম্নতম স্তরের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না ব'লে তাঁদের এক একটি অশোভন ব্যবহার লক্ষ্য করে মানুষ বিস্মিত হয়ে যায়। হয়তো সাধারণতঃ তিনি ধার্ম্মিক পুরুষ বলে, এমন কি ভক্ত বলেই পরিচিত। কিন্তু এক এক সময়ে এমন একটি খলতা কিম্বা কুটিলতার পরিচয় দেন যে, অন্য লোকেরা বলে উঠে, "লোকটার ধর্ম্মভাব ভক্তিভাব সবই ভণ্ডামি!" আমি বলি, "না; সে-সব ভণ্ডামি নয়। ধর্ম্মসাধনের দুই অঙ্গ; প্রথম, মনকে অনুপ্রাণনের সাহায্যে উচ্চ স্তরে তুলে রাখা; দ্বিতীয়, মনটি সাধারণতঃ কোন্ স্তরে বিচরণ করে এবং নামতে আরম্ভ করলে কত নীচে পর্য্যন্ত নেমে যেতে পারে, সে বিষয়ে মনকে সতর্ক রাখা। ঐ ধার্ম্মিক মানুষটি ভণ্ড নন; কিন্তু ধর্ম্মের এই দ্বিতীয় সাধন বিষয়ে তিনি অমনোযোগী। তাই তাঁর জীবনে এই অসামঞ্জস্য।"

এক দিকে উন্নত ভাবের ও আকাঙ্খার অনুপ্রাণন, অপর দিকে নিজ অভ্যস্ত স্তরের প্রতি নিরন্তর সজাগ দৃষ্টি ও তদুৎপন্ন সতেজ সংগ্রাম,—এ উভয়ের সমাবেশে সেণ্ট পলের জীবন পরিপূর্ণ। তাঁর সমান তেজস্বী প্রচারক, আত্মোৎসর্গে জলন্ত প্রচারক বোধহয় আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আবির্ভূত হন নাই। 'প্রচারক' শব্দটি উচ্চারণ করলেই সেণ্ট পলের ছবি আমাদের মনে উদিত হয়। যীশুর অগ্নিময় জীবন ও আশ্চর্য্য মরণের কথা স্মরণ ক'রে তিনি নিজে সর্ব্বদা মত্ত থাকতেন, মানুষকেও মাতিয়ে রাখতেন। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি রক্ত মাংসের ঊর্দ্ধে উঠবার সংগ্রামের আর্ত্তনাদে তাঁর উক্তিসকল পরিপূর্ণ। তিনি বলছেন, "O wretched man that I am! Who shall deliver me

from the body of this death ? হায় হতভাগ্য আমি! কে আমাকে এই পাপ-মৃত্যুময় দেহ হতে মুক্তি দান করবে?"—যদি এই আত্মপরীক্ষা ও সংগ্রাম অবহেলা করে সেণ্ট পল কেবল মানুষ মাতানো কাজটি নিয়েই থাকতেন, তবে তিনি কখনও সেণ্ট পল হতে পারতেন না।

সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শিবনাথের জীবনেও আমরা ধর্ম্মের উক্ত উভয় ব্যাপারের সমাবেশ দেখতে পাই। এক দিকে তাঁর কি অগ্নিগর্ভ বাক্য! আবার অপর দিকে শিবনাথের ভিতরে কি কঠোর আত্মদৃষ্টি, কি প্রবল আত্মশাসন ও আত্মধিকার ছিল! তাঁর এই আত্মশাসন ও আত্মধিক্কারের কথা তাঁর অন্তরঙ্গ মানুষেরাই জানতে পারতেন। এখানে তার একটি ছোট দৃষ্টান্ত বলি। শিবনাথ তাঁর বাবার মতন বন্ধুসঙ্গে বসে গল্প করতে ভালবাসতেন। কোন কোন দিন গল্পে বেশী সময়ক্ষেপ হয়ে যেত। এক দিন এরূপ হওয়াতে নিজের ডায়েরীতে লিখছেন, "অমুক অমুকের সঙ্গে গল্প করতে জোটা গেল, আর অমনি আমি ধুকুড়ী এলিয়ে বসলাম।" 'ধুকুড়ী এলানো' অর্থ, ছেঁড়া কাপড়খানি ছড়িয়ে দেওয়া; কেউ নিজের গল্প বেশী করলে মেয়েলি ভাষায় ঐরূপ বলা হয়। শিবনাথ তার পরেই ডায়েরীতে লিখছেন, "আমি একটা অসার অপদার্থ মানুষ; আমার মতন হাল্কা লোকের হাতে ব্রাহ্মসমাজের কাজের ভার না পড়লেই ভাল ছিল।" কি কঠোর আত্মভর্ৎসনা! সেণ্ট পলের সম্বন্ধে যেমন বলা যায়, শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধেও তেমনি বলা যায়, যদি তিনি কেবল উচ্চ অনুপ্রাণনের স্তরেই ভাসতেন, যদি তাঁর মধ্যে এই কঠোর আত্মদৃষ্টি না থাকত, তবে তিনি 'শাস্ত্রী মহাশয়' হতে পারতেন না।

১৮৯২ ও ১৮৯৩ সালে যে-সময়ে শাস্ত্রী মহাশয় সাধনাশ্রম স্থাপন

ক'রে তাঁর উপদেশাদির দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে তোলপাড় করছেন, যখন তাঁর প্রবল বাণীর তরঙ্গাঘাতে কত প্রাণকে ব্রাহ্মসমাজের সেবার ক্ষেত্রে টেনে আনছে, ঠিক সেই সময়েই তিনি নিজ অন্তর্জীবনের সংগ্রামের কথা কতকগুলি কবিতার আকারে পরমেশ্বরকে নিবেদন করেছিলেন। তার একটিতে আছে, "সহে না সংগ্রাম! আমি নারিনু রোধিতে দুরন্ত প্রবৃত্তিকুলে মোর।" আমি তখন ১৮।১৯ বৎসরের যুবক। প্রবৃত্তি-সংগ্রাম কাকে বলে, তা আমি ও আমার সঙ্গীরা তখন খুব জেনেছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ কবিতা পড়ে আমাদের হৃদয় ভূকম্পের ন্যায় আন্দোলিত হয়ে উঠত। ঐ কবিতার মধ্যে অন্তরের সংগ্রামের কি প্রচণ্ড প্রকাশ! আবার ঐ সকল কবিতা হতে আমরা আত্মার নিগূঢ় স্থানে কত বলও লাভ করতাম! সত্য বলতে কি, আমরা সেই সময়ে তাঁর উপদেশ ও অগ্নিগর্ভ বাক্যে যত উপকার লাভ করতাম, তাঁর অন্তরের আত্মপরীক্ষার ও সংগ্রামের এই সকল প্রকাশ দেখে তদপেক্ষা অধিক উপকৃত হতাম।

সেবায় আত্মবিলোপ

আত্মবিলোপ ও সাত্ত্বিক সেবার বিষয়ে কিছু বলবার আগেই মনে এই প্রশ্ন আসে যে, ব্রাহ্মসমাজে কি এরূপ সেবা উৎপন্ন হবার পক্ষে অনুকূল হাওয়া (atmosphere) বিদ্যমান আছে? উত্তপ্ত হাওয়ার মধ্যে যেমন সুকোমল ফুল ফুটতে পারে না, তেমনি সমাজমধ্যে যদি আত্মগৌরব ও অহংভাবের উষ্ণ হাওয়া প্রবাহিত থাকে, তবে তদ্দ্বারা বেষ্টিত তরুণদের প্রাণে সাত্ত্বিক ও আত্মবিলোপযুক্ত সেবার ভাব প্রস্ফুটিত হতে পারে না। এ বিষয়ে সমাজের হাওয়ার প্রতি, বিশেষতঃ এর কর্ম্মকেন্দ্রের হাওয়ার প্রতি সকলের সতর্ক দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

সাত্ত্বিক সেবার প্রতিকূল হাওয়া সৃষ্টি হয় কিসে? প্রধানতঃ কর্ত্তৃত্বস্পৃহা ও দলাদলির ভাব হতে।

মানুষের সেবাকে নিষ্ফল করে দেবার পক্ষে অহংবৃত্তি বা কর্ত্তৃত্বস্পৃহার মতন এমন শত্রু আর বোধ হয় কিছু নাই। একবার যদি মনে এ-ভাবকে স্থান দাও, তবে তোমার ধর্ম্মজীবন চিরকালের জন্য নষ্ট! মানবচরিত্রের অনেক শত্রু কালক্রমে আপনি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই শত্রু, যতই দিন যায় ততই প্রকৃতিতে অধিক বদ্ধমূল হয়। আমি এমন মানুষ দেখেছি, যিনি সারা জীবনে অনেক ভাল কাজ করলেন, বড় বড় অনেক কাজ গড়লেন, কাজ করতে করতে বৃদ্ধ হলেন; কিন্তু হায়, অহং ভাবের দুর্গন্ধ তাঁর আত্মা হতে কখনও দূর হল না। এই প্রকৃতির মানুষ যতক্ষণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে কাজ করতে পান, ততক্ষণ সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করেন; কিন্তু যেই তাঁর কর্ত্তৃত্ব-পরিচালনে কোন বাধা উৎপন্ন হয়, অমনি প্রকৃতিগত অহংভাবের নানা কদর্য্য প্রকাশ হতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্মজীবনের হিসাবে এমন মানুষের সারা জীবনের সেবাও পণ্ডশ্রম মাত্র।

কর্ত্তৃত্বস্পৃহার ন্যায় দলাদলির ভাবও সেবাক্ষেত্রের হাওয়াকে দূষিত করে। বস্তুতঃ দলাদলির ভাব কর্ত্তৃত্বস্পৃহা হতেই প্রসূত। আমার প্রাধান্যের জন্য ব্যস্ততা এবং আমার দলের প্রাধান্যের জন্য ব্যস্ততা, এ উভয় ভাবই সাত্ত্বিক সেবার আদর্শ দিয়ে বিচার করলে সমান হেয়। কিন্তু দলাদলির ভাব মানুষের ধর্ম্মচক্ষুকে আরও নষ্ট করে; কে কতটা ভাল, কে কতটা মন্দ, কোন্ কাজের ফল কি-পরিমাণে কল্যাণকর অথবা অকল্যাণকর, এ সকলের বিচার করতে মানুষকে একান্তই অক্ষম করে তোলে।

এই দুই ভাবের যে-কোনটি থাকলেই সেবাক্ষেত্রের হাওয়া দূষিত

হয়ে যায়। ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য যদি কোন নূতন মানুষকে ডাকতে হয়, অথবা ডেকে এনে যদি তাকে কাজ শেখাতে হয়, তবে তাকে সর্ব্বাগ্রে এমন শিক্ষাক্ষেত্রে স্থাপন করা প্রয়োজন, যেখানে ঐ সকল দূষিত হাওয়া প্রবেশ করতে পারে না। শাস্ত্রী মহাশয় সাধনাশ্রমের প্রথম নামকরণের সময়ে ইংরেজীতে shelter শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এক অর্থে এই নামটি অতি মূল্যবান। সাধনাশ্রম এমন স্থান, যেখানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, ব্রাহ্মসমাজের কোন দলাদলি হতে, কিংবা মানুষের কোন কর্ত্তৃত্বস্পৃহা হতে উত্থিত কোন দূষিত হাওয়াকে এর মধ্যে আসতে দেব না; সে সকল হতে একে sheltered রাখব। সাধনাশ্রমে আমরা যৌবন হতেই এই শিক্ষা লাভ করেছিলাম যে, সর্ব্বস্ব দিয়েও এবং দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত খেটেও একবারও একথা মনে আসতে পাবে না যে, আমাকে কেউ দেখছে কি না, আমার নাম কোথাও করা হচ্ছে কি না, আমার জন্য সমাজমধ্যে কোন পদ নির্দ্দিষ্ট আছে কি না। এরূপ কল্পনা যদি নিমেষের জন্যও মনে আসে, তৎক্ষণাৎ তাকে মনের প্রাঙ্গণ থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বাহির করে দিতে হয়। ছি ছি! সেবকের পক্ষে কর্ত্তৃত্বস্পৃহাকে মনে স্থান দেওয়াও যা, পায়ের জুতোকে মাথার ভূষণ করে বেড়ানোও তা।

সেবায় আত্মবিলোপের আদর্শটি ভাবতে গেলেই সাধনাশ্রমের পরলোকগত সেবক সুন্দর সিংহ্জীকে মনে পড়ে, যাঁকে আমরা 'সেবানন্দ' আখ্যা দিয়েছিলাম। বাঁকিপুরের আশ্রমে একদিন জল আনবার চাকরটি আসে নাই, সুন্দর সিংহ্জী অমনি বাঁক কাঁধে করে নদী থেকে জল নিয়ে এলেন। একদিন মেথর আসে নি, সুন্দর সিংহ্জী মেথরের কাজ সমাধা করে এলেন। তাঁর সেই সেবায় আত্মবিলোপের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসকল আমাদের সাধনাশ্রমের নানা পুণ্যস্মৃতির

মধ্যে অমূল্য রত্নস্বরূপ। ঈশ্বর করুন যেন সেই ভাবটি আমরা ভাল করে সাধন করতে পারি।

ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য এমন একটি শিক্ষাক্ষেত্র থাকা আবশ্যক, যেখানে কর্ত্তৃত্ব চালনার কোন সুযোগই নাই; যেখানকার হাওয়াতেই মানুষের মন 'আমি দাস' এই ভাবে গঠিত হয়ে যায়।

অর্থদানে আত্মবিলোপ

আত্মবিলোপ বিনা সেবা নিষ্ফল, আত্মবিলোপ বিনা অর্থদানও নিষ্ফল। সফল অর্থদানের দু' একটি দৃষ্টান্ত আপনাদের কাছে নিবেদন করি।

ভবানীপুর সম্মিলন-সমাজের একজন সভ্য আছেন, তাঁর কথা স্মরণ করলেই আমার হৃদয় উন্নত হয়। তিনি লেখাপড়া প্রায় কিছুই জানেন না, শুদ্ধরূপে বাংলাও লিখতে পারেন না। তাঁর মাসিক আয় অতি সামান্য; তিনি খোলার ঘরে থাকেন। মন্দিরের উপাসনায় ও সঙ্গতে তিনি অতি নিয়মিতরূপে আসেন, কিন্তু উপাসনার সময় অনেক পিছনের বেঞ্চিতে বসেন। তাঁকে একদিন সম্মুখে এসে বসবার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "আমি নরকের মানুষ; স্বর্গে এসে যে আমি এক কোণে বসতে পাই, এতেই আমি ধন্য।"

এই মানুষটির অর্থদানও অতি আশ্চর্য্য। ঐ সমাজের মন্দির নির্ম্মাণের সময় তিনি ২৫৲ টাকা দান স্বাক্ষর করেছিলেন; তাতে আমরা আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। কারণ, ধনীদের মধ্যেও অনেকে ঐ পরিমাণ টাকা স্বাক্ষর করেন নাই। কিন্তু তিনি ২৫৲ টাকা মাত্র স্বাক্ষর ক'রে পাঁচ বারে ২৫৲ টাকা হিসাবে মোট ১২৫৲ টাকা দান করলেন! তাঁর হাত থেকে প্রত্যেক বার ২৫৲ টাকা গ্রহণ করতে গিয়ে আমি বিস্মিত ও

সঙ্কুচিত হয়ে পড়তাম; কিন্তু তিনি এমন ভাব প্রকাশ করতেন যে তাঁর টাকা গ্রহণ করে আমরাই তাঁকে অনুগৃহীত করছি।

এক দিন তিনি আমাকে বললেন, "আমার বাড়ীতে একবার পদধূলি দিতে হবে।" কি জন্য ডাকছেন তা ভেঙ্গে বললেন না। আমি গিয়ে দেখি, একটু উপাসনার আয়োজন করা হয়েছে। উপাসনার পর তিনি ১০০০৲ টাকার একখানি নোট ও একটি টাকা এবং তাঁর হাতের লেখা এই মর্ম্মের একখানি দানপত্র আমার হাতে দিলেন যে এই টাকা তিনি ঐ সমাজে দান করছেন। আমি বার বার নোটখানির দিকে দৃষ্টিপাত করেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে সত্য সত্যই এইখানি ১০০০৲ টাকার নোট। মনে হচ্ছিল আমি কি চক্ষে ভুল দেখছি? অবশেষে আমি বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেলাম। তাঁকে বললাম, "আপনার পদধূলি দিন।"—যে দানে আত্মগৌরবের ছায়ামাত্র নাই, 'দিয়েই আমি ধন্য হলাম' এই ভাব, সে-ই তো সাত্ত্বিক দান!

সাত্ত্বিক দানের আর একটি দৃষ্টান্ত বলি। বঙ্গদেশে সুপরিচিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণের নামে এক লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী ফণ্ড করে দিলেন; তার সুদ থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বৃত্তি দেওয়া হবে। বৃত্তির জন্য নির্ব্বাচিত পণ্ডিতগণকে কোন দিন টাকা নেবার জন্য তাঁদের চুঁচুড়ার বাড়ীতে ডাকা হবে, এ বিষয়ে পুত্রগণের সঙ্গে পরামর্শ করে পুত্রদের মধ্যেই একজনকে ভূদেব বাবু ভার দিলেন যে একটি বিজ্ঞাপন লিখে পত্রিকায় মুদ্রিত করে দাও। এরূপ স্থলে সাধারণতঃ যেরূপ ভাষায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, পুত্র সেই ভাবেই লিখে পিতাকে তা দেখাতে গেলেন। ভূদেব বাবু বললেন, ছি ছি! এ কি করেছ! লেখ, "যে সকল পণ্ডিত মহাশয় অনুগ্রহ করে আমাদের বৃত্তি গ্রহণ অঙ্গীকার করে আমাদের কৃতার্থ

করেছেন, তাঁরা কষ্ট স্বীকার করে অমুক দিন আমাদের বাড়ীতে পদধূলি দিবেন।"

ভগবানের কৃপায় এমন মহামনা মানুষ এদেশে এখনও অনেক আছেন। মাঝে মাঝে এমন মানুষের সংস্পর্শে এসে আমাদের হৃদয় মন স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

শ্রমবোধ লোপ

সাত্ত্বিক সেবার প্রকৃত আদর্শ সেখানেই দেখতে পাওয়া যায় যেখানে প্রেম আছে। প্রেম থাকলে শুধু যে আত্মগৌরববোধ লুপ্ত হয়, তাই নয়, "আমি কত খাটছি" এই বোধও লুপ্ত হয়। মা সন্তানের জন্য কত বাধা বিঘ্ন জয় করেন! কিন্তু সে-সকলের অনুভূতি তাঁর মনে জাগে না। দুটি মা যখন পরস্পরের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন, তখন 'আমাদের কত খাটতে হয়' এ কথা তাঁরা বলেন না। কোন কোন সময়ে এ-কথা মুখে বললেও তাঁদের মনে তা স্থান পায় না। 'বাছাদের জন্য খেটে আমাদের কি-আনন্দ, খেটে আমরা কত ধন্য' এই ভাব মনে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারেন বলেই মায়েদের একত্র হতে ভাল লাগে। যতক্ষণ শ্রমবোধ আছে, ততক্ষণ প্রকৃত প্রেমের জন্ম হয় নাই। পতিপ্রেমে মুগ্ধা দুই গৃহিণী একত্র হলেও এই কথাই ওঠে যে, 'খেটে আমরা কত তৃপ্ত!' এমন কি, পরিশ্রম যতই অধিক হোক না কেন, পরিশ্রমের প্রসঙ্গ করতেই ইচ্ছা হয় না; 'আমরা কত তৃপ্ত,' এই কথাই বলতে ইচ্ছা হয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে একটি অতি প্রসিদ্ধ কবিতা আছে। রাধাকে একদিন তাঁর এক সখী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কৃষ্ণপ্রেম তোমার কেমন লাগছে? আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে পার?" রাধা উত্তর দিয়েছিলেন, "এ সখি, কি পুছসি

অনুভব মোয় ! সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে পলে পলে নূতন হোয়। জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।” এইরূপে নানা ভাবে রাধা বললেন, “জীবন এত অধিক নিত্য-নবীন তৃপ্তিতে পূর্ণ যে তার বর্ণনা হয় না।”

আপনাতে নির্ভর লোপ

সাত্ত্বিক সেবার আর একটি লক্ষণ এই যে, সেবকের নিকটে পার্থিব আয়োজনসকল প্রচুরই হোক কি সামান্যই হোক, কর্ম্মের বাহ্য ব্যবস্থাসকল সবলই হোক কি দুর্ব্বলই হোক, তাঁর নির্ভর নিজের উপরে নয়, আয়োজনের উপরে নয়, ব্যবস্থার উপরে নয়। তাঁর নির্ভর কেবল ঈশ্বরের উপরে। সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শাস্ত্রী মহাশয় ইহার স্থাপন অবধি আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে এসেছেন যে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এবং কর্ম্মে সফলতার জন্য একমাত্র প্রভুর উপরেই নির্ভর করতে হবে। তখন সাধনাশ্রমে এবং সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে যত দারুণ অর্থাভাব ছিল, এখন তা নাই। ব্রাহ্মসমাজের হাতে ঈশ্বর অর্থ দিয়েছেন, মানুষের মনে এর প্রতি আস্থা সঞ্চার করে দিয়েছেন, সত্য বটে ; কিন্তু আমাদের নির্ভর সে-সকলের উপরে নয়; নির্ভর একমাত্র ঈশ্বরের উপরে। সে-সকল আছে বলে আমাদের দায়িত্ব আমরা অনুভব করব বটে, কিন্তু আমাদের নির্ভর থাকবে ঈশ্বরের উপরে।

“আমাদের এত আয়োজন, এত ভাল ব্যবস্থা; আমাদের কে হারাতে পারে?” এরূপ ভাব যার মনে থাকে, এরূপ বাক্য যার মুখে আসে, সে মানুষের প্রকৃতি রাজসিক। তার সেবা তাকে উন্নত করে না। বাঁকিপুরে ভীখম দাস (অর্থাৎ ভীষ্মদাস) বাবাজী নামক এক সাধুর একটি প্রসিদ্ধ আশ্রম আছে। অনেক তীর্থযাত্রী, অনেক সাধু

সন্ন্যাসী সে আশ্রমে আসেন। সাধারণের শ্রদ্ধা-দত্ত কিন্তু অনিয়মিত দানে আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। একবার এক মেলা উপলক্ষে হঠাৎ প্রায় তিন শত যাত্রী এসে উপস্থিত হলেন। ভক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন করে এ সব অতর্কিত ব্যয় নির্ব্বাহ হয়?" বাবাজী হেসে বললেন, "বহ্‌তী গঙ্গা, হাথ ধো লেনা, অর্থাৎ, গঙ্গা প্রবাহিতই রয়েছে; যে হাত ধুতে আসে, তার কি ভাবনা হয় যে জল কোথা হতে আসবে?"—কি আশ্চর্য্য উত্তর! কি আশ্চর্য্য নির্ভর! অথচ, ঐ বাবাজীকেই এত যাত্রী ও অতিথির জন্য সব ব্যবস্থা করতে হয়।

আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বহন করেও মানুষ ঈশ্বরের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর রাখতে পারে। কর্ম্মজীবনে এই দায়িত্ব পালন ও ঈশ্বর-নির্ভরের সামঞ্জস্যই প্রধান সাধন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে দেখা যায়, বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে উপদেশ দিচ্ছেন, "কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তঃ" হয়ে কাজ করবে; অর্থাৎ বাহির হতে কেউ তোমার কাজ দেখলে যেন মনে করে যে তুমিই কর্ত্তা, তোমারই উপরে সম্পূর্ণ দায়িত্ব। অথচ ভিতরে তুমি জানবে যে ঈশ্বরই কর্ত্তা; তাঁর আদেশেই তুমি চলছ এবং তাঁর উপরেই তোমার নির্ভর।

ত্যাগের ও দুঃখের অনুভূতি লোপ

ঈশ্বরসেবকের মনে কেন এ অনুভূতি থাকবে যে, 'আমি ত্যাগের পথ দিয়ে এসেছি?' ঈশ্বরের জন্য যে যতটুকু ক্ষতি স্বীকার করে, তিনি কি তাকে তার সহস্রগুণ ক্ষতিপূরণ করে দেন না? পৃথিবীর রাজা যুদ্ধে মৃত সৈনিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে-টাকা দেন, ঈশ্বর তার চেয়ে অনেক বেশী গুণ ক্ষতিপূরণ করে দেন। রামমোহন রায়

বলেছিলেন, "দেশবাসিগণের সকল অত্যাচার আমি শান্ত চিত্তে বহন করতে পারব ; কারণ, আমার নির্ভর সেই ঈশ্বরের উপরে যিনি গোপনে দর্শন করেন, কিন্তু প্রকাশ্যেই ক্ষতিপূরণ করেন।"

ঈশ্বরের দয়ার বিধানকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিচার করলে অবশ্যই নিকৃষ্ট ভাবে বিচার করা হয়। কিন্তু সে-ভাবে দেখলেও তো অভিযোগ করবার কিছু নাই! রামমোহনের জীবনে মানব-কৃত অপমানের কি-আশ্চর্য্য ক্ষতিপূরণ এখন সমগ্র পৃথিবী করে দিয়েছে।

যিনি ঈশ্বরকে বরণ করেন, যিনি ঈশ্বরের হাতে আপনাকে সমর্পণ করেন, ঈশ্বর তাঁকে প্রার্থনার অতীত দান দিয়ে কল্পনার অগোচর আত্মিক সম্পদ দিয়ে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর তো ত্যাগ দুঃখ ক্ষতি, এ সকলের বোধ থাকেই না ; তিনি কিছু ভিক্ষা করতেও ভুলে যান। ধ্রুবের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান যখন বললেন "বর চাও," ধ্রুব তখন বললেন, "আমি চেয়েছিলাম পৃথিবীর পদ, কিন্তু পেলাম তোমাকে : যেন কাচ খুঁজতে গিয়ে পেলাম দিব্য রত্ন। আমি কৃতার্থ ; আর আমি কিছুই চাই না।"

লৌকিক দুঃখ তো অতি তুচ্ছ! জীবনের তীব্রতম দুঃখ যে অনুতাপ, তার মধ্য দিয়েও সেই দয়াল তাঁর কত প্রসাদ দান করেন! গানে আছে, "অশ্রুপাত করে বীজ কর রে বপন রে, যদি মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্ত্তন রে।" এক দিন আমরা অনুতাপের যন্ত্রণাতে আর্ত্তনাদ করেছিলাম , কিন্তু ভেবে দেখ তো, তার দ্বারা তিনি জীবনে কত অমূল্য শস্য দান করেছেন!

শোকের ব্যথার বিষয়েও সেই কথা। গল্পে আছে, দাতা কর্ণের পরীক্ষার জন্য ভগবান তাঁর বাড়ীতে ব্রাহ্মণ অতিথির মূর্ত্তি ধরে এসে তাঁকে বললেন, "তোমার পুত্র বৃষকেতুকে তোমরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলে

বিনা অশ্রুপাতে বলিদান কর; তার মাংস আমাকে ভোজন করাও।" দাতা কর্ণ সে আদেশ পালন করলেন। ভোজনান্তে অতিথিরূপী ভগবান তাকে বললেন, "একবার রাজপথে বাহির হও।" রাজপথে গিয়ে দাতা কর্ণ দেখেন যে পথচারী প্রত্যেকটি বালকই বৃষকেতু। শৈশবে এই গল্পটি পড়ে আমি শোকাকুল হতাম। এখন দেখি, দয়ালের এই অলৌকিক লীলা জীবনে সত্য সত্যই ঘটে: সন্তানশোকের মধ্য দিয়ে তিনি চিত্তকে এমন করে বিকাশ করে দেন যে, সংসারের সব ছেলেমেয়েকে "আমার ছেলে মেয়ে" বলে বুকে ধরতে ইচ্ছা হয়।

জীবনে কি এমন কোনও দুঃখ আছে যার অমৃতময় ক্ষতিপূরণ তিনি করে দেন না? প্রত্যেক দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে দান করেন, তিনি নিজ সঙ্গকে আরও গাঢ় করে দান করেন। তবু কি আমরা বলব যে 'জীবনে ত্যাগের পথ দিয়ে এলাম, কিছু বঞ্চিত হলাম?' বরং ব্যথা পাবার অধিকার না থাকলেই বঞ্চিত হতাম। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে রায় রামানন্দের যে কথোপকথন হয়, তাতে রায় রামানন্দ একবার বলেছিলেন, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধনীয়; অর্থাৎ সুখদুঃখে সমত্ব ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্মবোধমূলক যে জ্ঞান, তার সাহায্যে ঈশ্বরের ভজনা করা শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। চৈতন্যদেব এ উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না। সুখ দুঃখ যদি সমান হয়ে গেল, মন যদি পাথরের মত হয়ে গেল, তবে ভগবান আমাদের জীবনে লীলা করবেন কি করে? রায় রামানন্দ তখন বললেন, জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই সাধনীয়; অর্থাৎ, যে মানুষ সুখদুঃখের অতীত হবার চেষ্টা করে না, ঈশ্বর তাকে যে অবস্থায় রাখেন তাতেই সন্তুষ্ট থেকে যে তাঁকে ভক্তি করে, সেই তাঁকে পায়।" চৈতন্যদেব এই উত্তরটিতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

ঈশ্বরসেবক "ত্যাগ ত্যাগ, দুঃখ দুঃখ" বলে কখনও অভিযোগ করেন না; মানুষের কাছে ও-কথা বলতেই তিনি ভালবাসেন না। তাঁর মন দয়ালের দয়াতে চিরতৃপ্ত।

১৩৪১

শাসন, বিচার, দরদ, শ্রদ্ধা

মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যা করা যাঁদের জীবনের ব্রত, তাঁরা কিরূপ মনের ভাব নিয়ে মানুষের সঙ্গে মিশবেন?

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথক করবার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে থাকে। এই দু'য়ের কার্য্যপ্রণালী পৃথক। শুধু তাই নয়; প্রজাকুলের প্রতি শাসকের দৃষ্টি ও বিচারকের দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য অতি গভীর। শাসকসম্প্রদায় প্রজাকুলের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করেন, বিচারকের মনোভাব তদপেক্ষা উন্নত ও বিশুদ্ধ হবে, ইহা আশা করা যায়। এই কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথক করা একান্ত প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এই দুই প্রকার দৃষ্টির, দুই প্রকার মনোভাবের পার্থক্য উপলব্ধি করাই যথেষ্ট। কিন্তু আত্মিক পরিচর্য্যার ক্ষেত্রে আরও উন্নত মনোভাবের দ্বারা চালিত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব এবং প্রয়োজন। তাই শাসন, বিচার, দরদ ও শ্রদ্ধা, এই চারি প্রকার মনোভাবের বিষয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমে একটি সাংসারিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব; সেটি আমার নিজ পরিবার হতে গৃহীত।

একটি সাংসারিক দৃষ্টান্ত

আমার একটি আত্মীয়কন্যা আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ও আমার গৃহে আমার কন্যাস্থানীয়া হয়ে বহু বৎসর বাস করেন। পরে তাঁর বিবাহ

হয়। এখন তিনি কয়েকটি সন্তানের জননী। সুশীলতা ও কোমল প্রকৃতির দ্বারা তিনি বালিকা বয়স হতেই আমার হৃদয়কে অতিশয় আকৃষ্ট করেছিলেন। বালিকা বয়সে যখন তিনি আমার বাড়ীতে থাকতেন, প্রকৃতির কোমলতা হেতু তাঁর দ্বারা কোন ত্রুটি হলে তখন তাঁকে আমার শাসন করতে হ'ত। বিবাহ হয়ে যাবার পর যখন আর আমার শাসন করবার অধিকার রইল না, তখনও আগ্রহের সঙ্গে আমি তাঁর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করতাম; মনে মনে তাঁর গৃহিণী-জীবনের দোষ-গুণের বিচার করতাম। সেই কন্যার সম্বন্ধে আমার মনে প্রথমতঃ শাসনের ও পরে শাসনবিহীন বিচারের ভাবের উদয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই দুই অবস্থার উল্লেখ করা গেল।

তিন সন্তানের জননী হবার পর সেই কন্যা এক বার আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর দুটি সন্তানের গুরুতর পীড়া হয়। এরূপ স্থলে মাতার কোন্ কোন্ ত্রুটির দরুন সন্তানদের অসুখ করল, তার বিচার করা অভিভাবকগণের পক্ষে স্বাভাবিক হয়; প্রথম প্রথম কয়েক দিন আমার মনে সেরূপ চিন্তাও যে আসত না, তা নয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রোগ যখন কঠিন আকার ধারণ করল, যখন চিকিৎসকগণ উদ্বিগ্ন, বাড়ীতে আমাদের সকলের মন শঙ্কাকুল, তখন কি আর সেরূপ চিন্তা মনে থাকতে পারে? তখন আমার একমাত্র কাজ হল সেই কন্যাকে ভরসা দেওয়া, তাঁর ভাবনার বোঝা নিজের স্কন্ধে লওয়া, তাঁর দারুণ উদ্বেগ ও শ্রমের উপরে সর্ব্বদা আমার স্নেহের ও দরদের স্পর্শ দান করা।

এই অবস্থার মধ্যে এক দিন আমি ভাবতে লাগলাম, "এই কন্যার জীবনে ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য লীলা! তাকে আমি এক দিন হামাগুড়ি দিতে দেখেছি, কোলে কাঁখে নিয়েছি; তখন সে কি ছিল; আর আজ

মাতৃত্বের দ্বারা তার মধ্যে এ কি নবজীবন বিকশিত হয়েছে! সন্তানের রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে বলে তার সেই অতি-কোমল হৃদয়ে আজ কত বল এসেছে! দিন রাত্রি নিজের আহার নিদ্রা তুচ্ছ করে কত ধৈর্য্যের সঙ্গে, কত আত্মহারা প্রেমে সে সন্তানের শুশ্রূষা করে যাচ্ছে!”

ঈশ্বরের এই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় এবং সেই কন্যার এই ধৈর্য্য ও আত্মবিসর্জ্জন দর্শন করে তার প্রতি শ্রদ্ধায় সেদিন আমার হৃদয় উচ্ছলিত হয়ে উঠল। সেই কন্যাকে যেন নূতন চক্ষে দেখলাম। তাকে সেদিন আমার দরদ ও আমার শ্রদ্ধা উভয়ই জানিয়ে আমি তৃপ্তি লাভ করলাম। এইরূপে আমার অন্তরে শাসন, বিচার, দরদ ও শ্রদ্ধা, এই চারি প্রকার মনোভাব এই কন্যার প্রতি পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিচার

আত্মিক পরিচর্য্যার ক্ষেত্রে শাসনের কোন স্থান আছে বলে আমার মনে হয় না। সুতরাং তার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করে অন্য তিনটির বিষয়েই ক্রমশঃ আলোচনা করা যাক।

আমরা মানুষের দোষ-গুণের বিচার আদৌ করব কি না? যদি বিচার করা নিষিদ্ধ না হয়, তা হলেও কিরূপ সম্বন্ধ থাকলে তা করব? যদি স্থির হয়ে যায় যে অমুক অমুকের দোষ গুণ বিচার করবার অধিকার আমার আছে, তা হলেও তাদের কোন্ শ্রেণীর আচরণের বিচার আমি করব?—এর প্রত্যেকটি প্রশ্ন ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে জড়িত। এ-সকল বিষয়ে অসাবধান হলে ধর্ম্মজীবনের অনেক ক্ষতি হয়।

কিন্তু বিচার বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন এই যে, আমি কি-ভাবের দ্বারা চালিত হয়ে অন্যের বিচার করতে প্রবৃত্ত হব।

মানুষের অন্তরে ভগবান যে ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি দিয়েছেন, যাকে আমরা 'বিবেক' নাম দিয়ে থাকি, তার একমাত্র কাজ, নিজের দোষ গুণ বিচার করা। বিনা প্রয়োজনে ভগবান মানব-অন্তরে সেই বিচারশক্তি দেন নাই। সেই শক্তির অতি প্রয়োজনীয় ব্যবহার,—ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য ব্যবহার,—তার সাহায্যে আত্মপরীক্ষা করা ও আপনার বিচার করা। মানুষ আপনার অন্তরকেই নিশ্চিত ভাবে জানে; আপনার আকাঙ্ক্ষা অভিপ্রায় অভিসন্ধি প্রভৃতিই তার কাছে সাক্ষাৎ ভাবে বিদিত। সুতরাং এই ক্ষেত্রেই এই বিচার-শক্তির প্রয়োগ করা সম্ভব; এই ক্ষেত্রে তার ব্যবহার না করাই মানুষের পক্ষে অপরাধ।

অনেক স্থলে দেখা যায় যে অপরের দোষ-গুণ বিচার করবার সময় মানুষেরা 'বিবেক' কথাটির ব্যবহার করছেন। ইহা এই শব্দের অপব্যবহার। কারণ, বিবেক কেবল আপনার দোষ-গুণ বিচারের জন্য প্রদত্ত একটি শক্তি। এই বিচার সম্যক ভাবে করতে হলে অন্তরের সমুদয় গূঢ় অভিপ্রায় জানা প্রয়োজন, অবস্থা ও ঘটনা হতে উৎপন্ন সমুদয় দুর্ব্বলতা প্রলোভন প্রভৃতি অবগত হওয়া প্রয়োজন। অপরের বিষয়ে কি সে-সকল জানা সম্ভব? অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কে অপরের অন্তরের এই সব কথা জানতে পারে? এই জন্য অপরের বিচারের ক্ষেত্রে 'বিবেক' শব্দটির প্রয়োগ অপপ্রয়োগ মাত্র। এরূপ স্থলে 'বিবেক' কথাটি পরিত্যাগ করে বলা উচিত যে, মানুষের মনে একটি 'বিবেচনাশক্তি' আছে; মানুষ তার ব্যবহার করে অপরের দোষ-গুণ বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়।

মানব অন্তরের প্রত্যেক শক্তির ব্যবহারেই মানুষ সুখ পায়। ঐ বিবেচনাশক্তির ব্যবহার করে যখন আমরা অপরের আচরণের বিশ্লেষণ

ও বিচার করি, তখনও মনে এক প্রকার সুখের উদয় হয়। এই সুখের জন্য অনেকের মন এমন লালায়িত হয়ে থাকে যে, তাদের পক্ষে অপরের দোষ-গুণ বিচার করা একটি অতি প্রিয় কার্য্য হয়ে দাঁড়ায়। তারা 'বিচারপ্রবণ' মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। এই 'বিচারপ্রবণতা' বস্তুটি নিন্দাপরায়ণতার ন্যায় তেমনি গর্হিত না হলেও ইহা অনেক স্থলেই নিন্দাপরায়ণতার জন্মদাতা। মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যা করা যাঁদের জীবনের ব্রত, তাঁদের এই 'বিচারপ্রবণতা' হ'তে সযত্নে দূরে থাকতে হবে। এ কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না যে, কোন মানুষ যত দিন 'বিচারপ্রবণ' থাকে, ততদিন তার পক্ষে অপরের আত্মিক পরিচর্য্যা করবার উপযোগী নিম্নতম মনোভাবটি (mental attitude) সাধন করাও সুকঠিন।

বিচারের দৃষ্টি ও দরদের দৃষ্টি

অপরের অন্তরের সব কথা জানা যায় না বলে অপরের বিচার করা কঠিন, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু অপরের বিচার করা বিষয়ে এই জ্ঞানের অভাবই একমাত্র বাধা নয়। অপরকে বুঝতে হলে জ্ঞানের দৃষ্টি যথেষ্ট নয়, দরদের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সেই দৃষ্টি কয়জনের মধ্যে থাকে? তাই যীশু বলেছিলেন, Judge not! তাই তিনি বলেছিলেন, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her। বস্তুতঃ যীশুর সমুদয় শিক্ষা যেন এই ভাবে পরিপূর্ণ, —মানুষকে বিচারের চক্ষে নয়, দরদের চক্ষে দেখো।

স্কুলে একটি ছেলের হাতের লেখাতে লাইন কেবলই বেঁকে যায়। মাষ্টার মহাশয় অনেক চেষ্টা করলেন, কিছুতেই তার সে অভ্যাস ছাড়াতে পারলেন না। অবশেষে তাঁর আর ধৈর্য্য রইল না। তিনি মনে করতে

জাগলেন যে, এ ছেলেটির দ্বারা ক্লাসের কাজের বড়ই ব্যাঘাত হচ্ছে, এ ছেলেটি না থাকলেই ক্লাস ভাল চলে। কেন যে তার লাইন বাঁকা হয়, তার কারণ মাষ্টার মহাশয় জানেন না; কারণ অনুসন্ধান করবার সময়ও তাঁর নাই, কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য বিলম্ব করতেও তিনি অক্ষম।

কিন্তু সেই ছেলের মা কারণটি জানলেন। ছেলেটির হাতের কব্জিতে বংশগত বাতের দোষ আছে; তাই, খাতাখানির বাঁ পাশ থেকে ডান পাশ পর্য্যন্ত সমস্ত লাইনটির উপর দিয়ে সোজা ভাবে আঙ্গুল চালিয়ে যাবার শক্তি ছেলেটির হাতে নেই। মা নিজের দরদের দ্বারা চালিত হয়ে কারণ অনুসন্ধান করলেন, কারণটি জানলেন। কারণ অনুসন্ধান করতে যতখানি ধৈর্য্যের প্রয়োজন, কারণ জানার পর ছেলেকে যতখানি ক্ষমা করা প্রয়োজন, মায়ের দরদের দৃষ্টি হতে তা সম্ভব হল। শিক্ষকের বিচারের দৃষ্টি হতে তা সম্ভব হত না।

প্রেমের একটি লক্ষণ এই যে, প্রেম অপেক্ষা করতে প্রস্তুত। সেণ্ট পলের প্রেম সম্বন্ধীয় অমৃতময় উপদেশটির (1 Cor. 13) এক অংশে আছে, (Love) beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things। এর মধ্যে endureth কথাটির মর্ম্ম এই যে, প্রেম সকলের চেয়ে অধিক দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করতে পারে। আর সকলে যখন অসহিষ্ণু হয়ে ছেড়ে দেয়, প্রেম তখনও ছেড়ে দেয় না। এই প্রেমের দৃষ্টি, দরদের দৃষ্টি আছে বলেই মা সন্তানকে বুঝতেও পারেন, সন্তানের ভাল করতেও পারেন। কিন্তু যাঁর মধ্যে সেই দরদের দৃষ্টি নেই, তাঁর পক্ষে অপরকে বুঝতে পারা এবং অপরের ভাল করতে পারা দুইই অত্যন্ত কঠিন।

এই দরদের দৃষ্টির অভাববশতঃ ধার্ম্মিক মানুষদের 'সদিচ্ছা', 'মঙ্গল

কামনা' প্রভৃতি অনেক সময়ে শুষ্ক বিচারপরায়ণতার আকার ধারণ করে আপনাকে ব্যর্থ করে ফেলে। দরদবিহীন, মমতাবিহীন, বিচার-প্রবণ 'হিতৈষিগণকে' সাধারণতঃ লোকেরা বড়ই ভয় করে চলে; এমন 'হিতৈষিগণের' সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হলে মানুষ তাদের এড়িয়ে চলে। হে ঈশ্বরের সেবক, তুমি যদি মানুষের পক্ষে ঐরূপ ভয়ের বস্তু হতে না চাও, তবে বিচারের দৃষ্টি পরিত্যাগ কর; দরদের দৃষ্টি লাভ করবার জন্য যত্ন কর।

ঈশ্বর বিচারক, না দরদী ?

আপনার সম্বন্ধে বিবেকের দ্বারা চালিত হয়ে সূক্ষ্ম ও অনমনীয় বিচার, এবং অপরের সম্বন্ধে বিচার-বিমুখতা ও দরদ,—এই উভয় নিয়মে না চললে ধর্ম্মজীবন রক্ষা করা এবং মানুষের সেবক হওয়া দুইই অসম্ভব হয়।

আমি যখন আত্মপরীক্ষা করব, ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করব,—আমি যখন প্রবৃত্তি-সংগ্রামে, শুদ্ধতার সংগ্রামে, বিবেকের সংগ্রামে নিযুক্ত হব, তখন আমি ঈশ্বরের দিকে চেয়ে বলব, "আমায় একটুও ছেড় না; আমি ছাড়া পেতে চাই না। আমাকে পূর্ণ অধীনতার শিক্ষা দাও; আমাকে চূর্ণ করেও তোমার অধীন করে নাও!" এই ভাব থেকেই একদিন আমি বলেছিলাম, "চল ভাই বোন, প্রভুর কাছে গিয়ে প্রভুর পদাঘাত ভিক্ষা করি।"

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মনোভাব (mental attitude) এইরূপই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঈশ্বর যে-দৃষ্টিতে তাঁর মানবসন্তানকে দেখেন তা কিরূপ? মানবমন যেমন যেমন উন্নত হতে থাকে, এ প্রশ্নের উত্তরও তেমনি অধিক অধিক উন্নত হতে থাকে। ঈশ্বর কি মানুষের বিচারক? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে তিনি বিচারক বটে, কিন্তু শুধু বিচারক

নন। এ প্রশ্নের আরও উন্নত উত্তর আছে। মানবের প্রতি তাঁর দৃষ্টি কেবল বিচারের দৃষ্টি নয়, কেবল অধীনতা আদায় করবার দৃষ্টি নয়। তা যে করুণার দৃষ্টি, তা যে দরদের দৃষ্টি, তা-ও অনুভব করা প্রয়োজন। একদিকে ঈশ্বর রাজার ন্যায়, প্রভুর ন্যায় আদেশ দেন, বাধ্যতার দাবী করেন; অপর দিকে তিনি পিতার ন্যায়, জননীর ন্যায় মানুষকে দরদের চক্ষে দেখেন। তিনি আমাদের সকল গূঢ় দুর্ব্বলতা জানেন। তিনি জানেন যে বংশগত অথবা দেহগত অথবা অভ্যাসগত কোন কোন গূঢ় কারণে, অথবা ঘটনাচক্রে কোন কোন নির্ম্মম আঘাতের ফলে, আমার চরিত্র কোন কোন দিক দিয়ে পঙ্গু হয়ে রয়েছে। তিনি জানেন যে তাঁর এক একটি আদেশ আমি কত গোপন অশ্রুপাতের সঙ্গে, অন্তরের কত অব্যক্ত আর্ত্তনাদের সঙ্গে বহন করে যাচ্ছি। আমাকে বিচার করবার সময় তিনি এ সকল কথা মনে রাখেন।

মানবের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি সম্বন্ধে যীশু যখন এই নূতন শিক্ষাটি তাঁর সমসাময়িক লোকদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন, তখন তাদের কাছে এটা বড় নূতন লেগেছিল। ঈশ্বর শুধু বিচারক নন, তাঁর কাজ শুধু দণ্ড ও পুরস্কার দান মাত্র নয়, তিনি নিজে ব্যাকুল হয়ে তাঁর হারানো মেষকে খুঁজতে বাহির হন,—ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সকল কথা তখনকার মানুষের কাছে বড় নূতন বোধ হয়েছিল।

"মানুষের কাছে ঈশ্বর কি চান," এবং "মানুষ কি-ভাবে মানুষের বিচার করবে," এই দুই প্রশ্নের যে-উত্তর যীশু দিয়েছিলেন, ধর্ম্মরাজ্যে সে উভয় উত্তরই অমূল্য। (১) ঈশ্বর মানুষের কাছে চান বিবেকানুগতা, মনুষ্যত্ব, তাঁর ইচ্ছা পালন,—পূজা নয়; এবং (২) মানুষ মানুষকে বিচারের দৃষ্টিতে নয়, কিন্তু দরদের দৃষ্টিতে দেখবে; এই দুই নব আদর্শের সমাবেশে যীশুর ধর্ম্মশিক্ষাটি কেমন সুন্দর, কেমন সুমহৎ হয়ে প্রকাশিত

হল! এই দিয়েই যীশু মানবহৃদয় জয় করেছিলেন, এখনও করছেন। এই আদর্শ, এই মনোভাব, ঈশ্বরসেবকের পক্ষে এ যুগেও অপরিহার্য্য।

শ্রদ্ধা

মানুষের প্রতি মানুষের মনোভাবের যেন একটি সোপান-পরম্পরা আছে; তার মধ্যে দরদের চেয়েও উর্দ্ধতর স্তরে থাকে শ্রদ্ধা। আমি এখানে বড়র প্রতি ছোটর দেয় যে শ্রদ্ধা, তার কথা বলছি না। আমি যে-শ্রদ্ধার কথা বলছি, তা সম্বন্ধের উচ্চ-নীচ ভেদ হতে প্রসূত নয়। যখনই কোনও মানুষের মধ্যে প্রেমের আচরণ, আত্মত্যাগের আচরণ, মহত্ত্বের আচরণ, বীরত্বের আচরণ দেখতে পাওয়া যায়, তখনই ধার্ম্মিক মানুষের মন সেখানে সম্ভ্রমে স্তব্ধ ও শ্রদ্ধায় নত হয়। সে আচরণ যাঁর মধ্যে প্রকাশিত হল, তিনি বড় হোন্ কি সমান হোন্, কি ছোট হোন্, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রকৃত ধর্ম্ম-ব্যাকুলতার একটি নিশ্চিত লক্ষণ,—বড় ছোট সকলের প্রতি শ্রদ্ধাদানের জন্য এই ঔৎসুক্য।

মানুষ সম্বন্ধে দরদের দৃষ্টিরও উর্দ্ধে এই শ্রদ্ধার দৃষ্টি। বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম স্বীয় স্বীয় প্রচারকগণের অন্তরে মানবের প্রতি যে করুণার দৃষ্টি, যে দরদের দৃষ্টি সঞ্চার করে দিতেন, বর্ত্তমান যুগে ঈশ্বরের সেবকের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে তাও যথেষ্ট হয় না; তাকে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে যেতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যত্বের ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব বিকাশের ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের একটি আদেশ এই যে, সেবকরূপে যাঁর কাছে আমি যাব, তাঁর মহত্তম ভাব ও আকাঙ্ক্ষা কি কি, তাঁর চরিত্রের মহত্তম স্তরটি কোথায়, এ সকল আমি অন্বেষণ ও আবিষ্কার করব; এবং সেই মহত্তম ভূমিতে দণ্ডায়মান হয়ে কেবল দয়ার সঙ্গে নয় কস্তু শ্রদ্ধারও সঙ্গে তাঁকে নিজ সেবা অর্পণ করব। সেবকের চিত্তে

জগতের প্রতি করুণা থাকা যথেষ্ট নয়; কারণ বর্ত্তমান যুগে মানুষ সব সময় করুণার ভিখারী হয় না, করুণা গ্রহণ করতেও প্রস্তুত হয় না। সেবকের মনোবৃত্তির মধ্যে দরদ অপেক্ষাও শ্রদ্ধাদানের ঔৎসুক্য প্রবলতর হওয়া আবশ্যক।

উন্নত পরিবার মাত্রের একটি লক্ষণ এই যে, সকলের দিক থেকে সকলের দিকে,—বড় এবং ছোট উভয় হতে উভয়ের দিকে,—এই শ্রদ্ধার ভাবটি নিরন্তর প্রবাহিত ও প্রকাশিত হয়। চারি বৎসর বয়স্ক শিশু থিওডোর পার্কার যখন তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা আমার মনের ভিতরে কে বলে দিল যে কচ্ছপটিকে মারতে নেই," তখন সেই পরিবারে একটি পরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হল। সেই পরম মুহূর্ত্তে থিওডোরের মায়ের মন সম্ভ্রমে কেমন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, আমরা তা মনে মনে অনুভব করতে পারি। তিনি নিজ শিশু পুত্রের অন্তরে প্রথম-উদিত সেই বিবেক-বাণীটির প্রতি কত শ্রদ্ধা, কত সমাদর প্রকাশ করেছিলেন! যে-পরিবারে ধর্ম্ম-ব্যাকুলতা হতে উৎপন্ন শ্রদ্ধা এইরূপ প্রবল নয়, যেখানে উপযুক্ত স্থলে ছোটদের প্রতি, সন্তানদের প্রতি, এমন কি দাস দাসীদের প্রতিও নত হয়ে এই ভাবে শ্রদ্ধা দান করা হয় না, যে পরিবারে শ্রদ্ধার এই 'নিম্নগামিনী' মূর্ত্তিটি কখনও প্রকাশিত হয় না, সেই পরিবারকে উন্নত পরিবার কিছুতেই বলা যায় না। কোন ধর্ম্মমণ্ডলীতে এই লক্ষণটি না থাকলে তাকে 'ধর্ম্মপরিবার' কিছুতেই বলা যায় না।

সাধনাশ্রমের অতীত ইতিহাস এইরূপ 'নিম্নগামিনী শ্রদ্ধার' প্রকাশের দ্বারা পরিপূর্ণ; সাধনাশ্রমে এই হাওয়ার মধ্যে আমরা বর্দ্ধিত। আমাদের যৌবনকালে আমরা ভাল হবার জন্য, আত্মজয় করবার জন্য, সেবাক্ষেত্রে সেবার কাজটি অথবা ঘরের ভিতরে ঘরের সামান্য কাজটি নিখুঁত করে করবার জন্য, যখনই প্রাণপণে যত্ন করেছি, তখনই গুরুজনদের কাছ থেকে

কত যে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করেছি, তার নানা স্মৃতিতে আমাদের মন পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে, ভাই প্রকাশ দেবজীর কাছে, সাধনাশ্রমের অন্যান্য পূজ্য গুরুজনদের কাছে, আমরা শুধু স্নেহই লাভ করি নাই; তাঁরা দয়া করে তাঁদের স্নেহের সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশ্রিত করে দিয়ে আমাদের ধর্ম্মজীবনকে কত অনুপ্রাণনে পূর্ণ করে দিতেন! এমন একটি হাওয়ার মধ্যে বদ্ধিত হবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

মানুষের প্রতি ঈশ্বরের শ্রদ্ধা

মানুষের প্রতি মানুষের দৃষ্টিতে দরদের চেয়ে ঊর্দ্ধে থাকে শ্রদ্ধা; মানুষের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি সম্বন্ধেও ইহা সত্য। ঈশ্বর আমাদের উপরে আশা স্থাপন করেন, শ্রদ্ধা রাখেন। আমরা কেমন করে কর্ত্তব্য বহন করি, কেমন করে দুঃখকে গ্রহণ করি, কেমন করে সংগ্রাম সহ্য করি, তা তিনি পরম কুতূহলে, পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন। আমরা কেবল তাঁর করুণার পাত্র নই; আমরা তাঁর আশার ভাজন, আমরা তাঁর শ্রদ্ধার বস্তু। আমরা দুঃখ পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে কাঁদব, আমাদের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক বটে; কিন্তু তিনি আমাদের কাছে এর অতিরিক্ত আরও কিছু আশা করেন। আমরা তাঁর দেওয়া দুঃখগুলি বীরের মত বহন করব, ইহাও তিনি দেখতে চান; আমরা দুঃখ বহন বিষয়ে তাঁর শ্রদ্ধার যোগ্য সন্তান হয়ে গড়ে উঠ্ছি, ইহাও তিনি আশা করেন। দুঃখ পেয়ে তাঁর কাছে কাঁদা এবং দুঃখকে বীরের মত বহন করা,— ধর্ম্মরাজ্যে এই দু'য়েরই স্থান আছে বটে; কিন্তু এ উভয়কে ঈশ্বর সমান মর্য্যাদা দেন, তা যদি আমরা মনে করি, তবে অত্যন্ত ভুল করব।

এমন কি, তাঁর প্রদত্ত দণ্ড বহন বিষয়েও তিনি আমাদের কাছে

মনুষ্যত্বের আশা করেন। আবার আমি একটি সাংসারিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব ; এটিও আমার নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

পাটনায় আমি যখন রামমোহন রায় সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক ছিলাম, তখন মাঝে মাঝে আমাকে অপরাধী ছাত্রদের দণ্ডদান করতে হ'ত। কে কি ভাবে দণ্ড গ্রহণ করছে, তা লক্ষ্য করে দেখতে আমার খুব আগ্রহ হ'ত ; কারণ দণ্ডগ্রহণের দ্বারা মানুষের মনুষ্যত্বের খুব পরীক্ষা হয়। অপদার্থ প্রকৃতির মানুষ অপরাধের অনুভূতিতে কাঁদে না ; যখন দণ্ডভয় উপস্থিত হয়, তখন কাঁদতে আরম্ভ করে। সারবান প্রকৃতির মানুষ অপরাধের জন্যই কাঁদে, কিন্তু দণ্ডকে অম্লান চিত্তে বরণ করে। এই পার্থক্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও লক্ষ্য করতে পারা যায় ; ইহা লক্ষ্য করা আমার একটি আগ্রহের বিষয় ছিল। এক দিন একটি ছাত্রকে ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহ প্রকাশের জন্য বেত্রদণ্ড দিতে হয়েছিল। নৈতিক হিসাবে অতি গর্হিত না হলেও স্কুলের discipline রক্ষার জন্য এই শ্রেণীর অপরাধে প্রধান শিক্ষককে অনেক সময়ে বেত্রদণ্ড প্রয়োগ করতেই হয়। এই অপরাধী ছেলেটির পরিবারের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ ছিলাম। ছেলেটি ছিল মাতৃহীন ; বাড়ীতে অনেক কষ্ট করে তাদের সকলকে চলতে হ'ত ; কিন্তু তার মেজাজটি একটু উদ্ধত ছিল। আমি সে-দিন ছেলেটিকে বুঝিয়ে দিলাম যে, টিফিনের সময়ে অন্যান্য ছাত্রদের সম্মুখে একজন শিক্ষকের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করাতে আমার পক্ষে তাকে বেত মারা অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। সে বেশ সহজ ভাবে অপরাধ স্বীকার করল, এবং বেত্রদণ্ড গ্রহণের জন্য হাতখানি বাড়িয়ে দিল। আমি দেখলাম, সে-দিন বাড়ীতে সে নিজের হাতে বাটনা বেটে এসেছে, হলুদের দাগ তখনও তার হাতে লেগে রয়েছে। এই অল্প বয়সে কেমন প্রসন্ন মনে সে দৈনিক জীবনের কঠোর সংগ্রাম বহন করছে এবং আমার সম্মুখে

কেমন প্রসন্ন মনে অসঙ্কুচিত ভাবে সে দণ্ডগ্রহণ করতে এগিয়ে এল,—এতে আমার মন তখনই তার প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে গেল। আমি তার হাতে এক ঘা বেত মারলাম; কিন্তু তার পরক্ষণেই সেখান থেকে আর সকল লোকদের সরিয়ে দিয়ে স্নেহার্দ্র-নয়নে তার প্রতি আমার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা উভয়ই প্রকাশ করলাম। আমিই বিচারক, আমিই দণ্ড দিলাম,—আবার আমিই সম্মান দিলাম, শ্রদ্ধা প্রকাশ করলাম,—এ উভয়ের সমাবেশ সম্ভব; এ উভয়ের সমাবেশ এরূপ ক্ষেত্রে সত্য।

তেমনি ঈশ্বরে-মানুষে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যত্বের ধর্ম্ম। অপরাধের জন্য অনুতাপে আমরা নিশ্চয়ই কাঁদব: নইলে আমরা মানুষ নই। কিন্তু দণ্ডগ্রহণের সময়েও কি কেবলই কাঁদতে থাকব? নিজ কৃত অপরাধের ১০০টা দণ্ডের মধ্যে যদি ৯৯টা দণ্ডের সময়ে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে কেবলই কাঁদি তাতে আপত্তি নাই,—অন্ততঃ একটি দণ্ডকে যদি তাঁর বীর সন্তানের ন্যায় বহন করতে শিখে থাকি। তা-ও কি হবে না? আমাদের ধর্ম্ম কি ঈশ্বরের কাছে গিয়ে আমাদের কেবল কাঁদতেই শিক্ষা দেবে? তবে এমন ধর্ম্মের দ্বারা আমরা কখনই মানুষ হব না।

ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ শিখর,—ধর্ম্মজনিত মনুষ্যত্ব; মানুষে-মানুষে সম্বন্ধের সর্ব্বোচ্চ শিখর,—মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা। হে ঈশ্বরের সেবক, এই উন্নত ধর্ম্মাদর্শ প্রচার কর; এই উন্নত শ্রদ্ধার দ্বারা মানুষের সঙ্গে মেশ। এই শ্রদ্ধাযোগ্য মনুষ্যত্ব মানবচরিত্রে সঞ্চার কর; এই শ্রদ্ধাযোগ্য মনুষ্যত্বের বীজ মানব-অন্তরে বপন কর; যেখানে সে-বীজ আছে, তাকে সযত্নে বিকাশ কর। শ্রদ্ধা নিয়ে মানুষের কাছে যাও, শ্রদ্ধাযোগ্য মনুষ্যত্ব তার কাছে দাবী কর, আশা কর। এমন কি, এই শ্রদ্ধাযোগ্য মনুষ্যত্ব মানুষের মধ্যে আছে বলে ধ'রে নিয়েই মানুষের কাছে যাও। কেন তুমি মানুষকে সুখ-দুঃখ-অনুভূতিসম্পন্ন জীবমাত্র

বলে দেখবে ? কেন তুমি তাকে দরদ মাত্র দিয়ে সন্তুষ্ট হবে ? মানুষকে শুধু enjoying and suffering being বলে দেখলে তাকে হীন করা হয়। মানুষ 'মানুষ'; মানুষ উন্নত অন্তরে সুখ দুঃখ গ্রহণ করবার অধিকারী; মানুষ স্বীয় আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ করবার অধিকারী। মানুষ ঈশ্বরেরও শ্রদ্ধার পাত্র।

শাসন, বিচার, দরদ ও শ্রদ্ধা,—মানুষের প্রতি মানুষের মনের ভাবের এই চারিটি ধাপ আছে। আমরা যেন আমাদের মনকে সর্ব্বদা সর্ব্বোচ্চ স্তরে রাখতে সমর্থ হই, ঈশ্বর আমাদের এই আশীর্ব্বাদ করুন।

১।৪২

আত্মিক পরিচর্য্যা

পরিচর্য্যার সফলতার উপাদান কি কি ?

যাঁরা মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যা করবেন, তাঁদের জীবনে কি কি ধর্ম্ম-সম্বল ও কি কি গুণ থাকা আবশ্যক ?

যাঁরা প্রচারক বা সেবক বলে চিহ্নিত, কেবল তাঁরাই যে আত্মিক পরিচর্য্যার কাজ করে থাকেন, তা নয়। সংসারের মানুষেরাও এ কাজ করেন। সংসারে আমরা কেবল পরস্পরের দেহ নিয়ে বাস করি না; পরস্পরের আত্মাকে নিয়ে বাস করি। পরস্পরের আত্মিক পরিচর্য্যা সংসারের সম্বন্ধগুলিরও প্রধান কথা। সংসারের মানুষ এবং ধর্ম্মসমাজের পরিচারক, উভয়ের জন্য মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যার শিক্ষা গ্রহণ সমান প্রয়োজনীয়।

বক্তৃতা বা শিক্ষাদান নয়

যাঁরা মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যা করবেন, তাঁদের মধ্যে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক ?—যখন আমাদের দৃষ্টি ব্রাহ্মসমাজের অতীতের দিকে পড়ে এবং অতীতের শক্তিশালী বাগ্মী নেতাদের প্রভাবের সঙ্গে তুলনা ক'রে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে ম্লান ও শক্তিহীন বলে মনে হয়, তখন স্বভাবতঃ এই ভ্রম হয় যে বাগ্মিতা, নানা প্রকার কর্ম্ম গঠন করবার শক্তি ও দেশ আলোড়িত করবার উপযোগী প্রভাব,—এ সকল বুঝি মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যার পক্ষে অপরিহার্য্য। 'আত্মিক পরিচর্য্যা'

বললেই অনেকের মনে বিজয়-যাত্রার মতন একটি ছবি উদয় হয়। ব্রাহ্মসমাজে সেণ্ট পলের দৃষ্টান্ত অনেক সময়ে এই সূত্রে উল্লেখ করা হয়; তাঁর মত প্রচারক জগতের ইতিহাসে বিরল। তিনি দেশ-বিদেশে নিরন্তর ভ্রমণ করে করে তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের বহু স্থানে খ্রীষ্টধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু অনেকের মনে হয়তো এই ভুল ধারণা আছে যে, তিনি বর্ত্তমান যুগের বাগ্মী প্রচারকদের মতন বক্তৃতার দ্বারা দেশ আলোড়িত করে বেড়িয়েছিলেন। তা নয়। পরিচর্য্যাক্ষেত্রে এরূপ বক্তৃতাশক্তির মূল্য অতি অল্প; সেণ্ট পলও সেরূপ করেন নাই। তিনি জ্ঞানী মানুষ ছিলেন বটে, এবং তিনি অনেক ভ্রমণও করেছেন বটে; কিন্তু তাঁর সে ভ্রমণ দেশ-মাতানো বক্তৃতা করবার জন্য নয়; ব্যক্তিগত আত্মিক পরিচর্য্যার জন্য। তখন কোথাও বা এক জন মাত্র, কোথাও বা চারি পাঁচ জন মাত্র মানুষ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। এইরূপ ক্ষুদ্র গ্রামে বা নগর প্রান্তে অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা বেষ্টিত ও নানা সংগ্রামে ভারাক্রান্ত খ্রীষ্টীয়দের কাছে তিনি বারে বারে যেতেন; সেই সকল অতি দরিদ্র মানুষের অন্তরে বিশ্বাসের শক্তি সঞ্চার করবার জন্য তাদের নিভৃত কুটিরে তিনি যেতেন; আত্মিক সঙ্গদানের দ্বারা তাদের ক্লিষ্ট জীবনকে স্নিগ্ধ করবার জন্য তিনি তাদের কাছে যেতেন। সেণ্ট পলের দেশ ভ্রমণের মূল কথা এই। মানুষের ধর্ম্মবিষয়ক পরিচর্য্যা করতে দাঁড়ালে ভাল বক্তা হওয়া চাই, এ ধারণা আমাদের মন থেকে একেবারে মুছে ফেলা দরকার।

যাঁরা শিক্ষাদান কার্য্যের শ্রেষ্ঠ প্রণালী আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন যে শিক্ষকদিগকে প্রথম হ'তেই সাবধান করে দেওয়া হয়,—"শিক্ষাদান ও বক্তৃতা যে এক নয়, তা ভাল করে বুঝে নাও।" কলেজের শিক্ষকদের 'lecturer' বলা হয়, স্কুলের শিক্ষকদের 'teacher' বলা হয়।

বক্তব্য বিষয়টিকে বিশদ করা ও সুন্দর ভাষায় তা পরিস্ফুট করা, ইহা lecturer-এর কাজ। কিন্তু teacher-এর নিকটে তা অবান্তর লক্ষ্য মাত্র। তাঁর প্রধান লক্ষ্য, ছাত্রের মনের বিকাশ। তিনি দেখেন, —ছাত্রের মনটি কোন অবস্থায় আছে; আমি যে প্রণালীতে শিক্ষাদান করছি, তা সে গ্রহণ করতে পারছে কি না, পারবে কি না; না পারলে, আমি কোন প্রণালীতে বিষয়টিকে তার সম্মুখে ধরব? ছাত্রের প্রতি এই দরদপূর্ণ, ঔৎসুক্যপূর্ণ ভাব,—শিক্ষাদান কার্য্যের নানাবিধ যোগ্যতার মধ্যে ইহাই প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান। এই ভাব যে-মানুষের প্রকৃতিতে নাই, তাকে শিক্ষক নিযুক্ত করা বিড়ম্বনা মাত্র। বক্তৃতা করা যাদের স্বভাব, এমন মানুষকে কখনও শিক্ষকতা কার্য্যে গ্রহণ করা হয় না।

এ বিষয়ে বক্তা অপেক্ষা শিক্ষক অনেক শ্রেষ্ঠ। আত্মিক পরিচর্য্যার কাজের সঙ্গে বক্তৃতাদানের অণুমাত্র মিল নাই; শিক্ষকতা কার্য্যের সঙ্গে বরং কিছু কিছু মিল আছে। পরিচারক ও শিক্ষক উভয়কে দরদী হতে হয়; "কি করে আমি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করব"—এজন্য উভয়কে ব্যাকুল থাকতে হয়।

তবে কি ভাল শিক্ষক হবার উপযুক্ত দরদপূর্ণ মনোভাবটিই ভাল আত্মিক পরিচারক হবার উপযোগী? না, তা-ও নয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর অপেক্ষা উন্নততর ভূমিতে দাঁড়ান। কিন্তু উঁচু-নীচু বোধের লেশমাত্র অন্তরে থাকলেও পরিচারকের কাজ করা অসম্ভব। সেবকের কাজ জ্ঞান দান নয়, শিক্ষা দান নয়,—তাঁর কাজ 'পরিচর্য্যা'। জ্ঞান দান খুব প্রয়োজনীয় কাজ, অতি শ্রেষ্ঠ কাজ; কিন্তু তা হলেও তাহা সেবকের প্রধান কাজ নয়, আনুষঙ্গিক কাজ মাত্র। পরিচারকের মনের কথা এই হবে যে, আমি ভাই হয়ে মানুষের কাছে যাব, বন্ধু হয়ে তাদের সঙ্গ করব ও সঙ্গ দান করব, দাস হয়ে তাদের সেবা করব।

সংসারে আমাদের যে-সকল অনুগত ও স্নেহশীল ভৃত্যেরা আমাদের পরিচর্য্যা করেন, তাঁরা আমাদের আদর্শ।

উপলব্ধির প্রাচুর্য্য

ভাল আত্মিক পরিচারক হবার জন্য কি কি চাই? সকলের আগে চাই, উপলব্ধির প্রাচুর্য্য। যার জীবনে ধর্ম্মোপলব্ধির প্রাচুর্য্য নাই, তার উপাসনা ও উপদেশ ভাষায় ও চিন্তায় যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, তা শীর্ণ ও শুষ্ক হতে বাধ্য। ধর্ম্মোপলব্ধির দৈন্য হেতুই আমাদের দ্বারা আচার্য্য ও পরিচারকের কাজ ভাল করে হচ্ছে না। এ বিষয়ে যাঁর অভাব আছে, তিনি সে-অভাবকে জ্ঞানের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা, বাগ্মিতার দ্বারা, কিছুরই দ্বারা পূরণ ক'রে নিতে পারবেন না। সতেজ প্রেমের তাজা অনুভূতি যার অন্তরকে স্নিগ্ধ ক'রে বর্ত্তমান নাই, প্রেমের কথা সে মিষ্টি করে বলুক দেখি! উপলব্ধি বিষয়ে অভাব থাকলে কিছু দিয়ে ঢাকা দেওয়া যায় না। ধর্ম্মোপলব্ধি নাই, অথচ জ্ঞানী অথবা বাগ্মী, এমন মানুষের বলবার প্রণালীটি যদি ভাল হয়, তবে লোকে তাঁর কথা শুনতে দু বার কি তিনবার আসবে; কিন্তু তার পর আর শুনতে চাইবে না। সংসারের মানুষেরা আমাদের কাছে কেবল কিছু শুনবার জন্য আসে না; আমাদের কাছে শ্রবণযোগ্য ভাল কথাই তারা প্রতিদিন চায় না; তারা চায় আত্মিক পরিচর্য্যা।

'উপলব্ধি' কথার অর্থ experience। ধর্ম্মোপলব্ধি কার আছে? জীবন দিয়ে যে ধর্ম্মকে জেনেছে; নিজ জীবনে মানব-জীবনের অমৃতসকল যে আস্বাদন করেছে; দুঃখে ব্যথায় যে ভুগেছে; নানা বিপদ অতিক্রম যে করেছে; নানা বিপদে ঠেকে যে শিখেছে। ধর্ম্মোপলব্ধি কার আছে? ঈশ্বরের উপলব্ধি, পরলোকের উপলব্ধি ও সংসারের মানুষের সুখ-দুঃখ-

সংগ্রামের উপলব্ধি,—ইহার সবই যে নিজ জীবনে লাভ করেছে। এই তিনটির মধ্যে প্রথম দুটির প্রয়োজন সহজেই বুঝতে পারা যায়; কিন্তু সংসারের সুখ-দুঃখ-সংগ্রামের উপলব্ধিও সে দুটির সঙ্গে সমপরিমাণে প্রয়োজন।

সংসার-জ্ঞান

সংসারে মানুষের জীবনে দারিদ্র্য আছে; উপার্জ্জনে অক্ষমতা; কর্ত্তব্যে অপারগতা আছে; রোগ আছে; মৃত্যু-শোক আছে; পারিবারিক অশান্তি আছে। পরিচারককে এই সমুদয় অবস্থায় পতিত মানুষের সেবা করতে হবে; এ জন্য এ সমুদয়কে হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার শক্তি তাঁর থাকা চাই। আজকাল মানুষের জীবনে দারিদ্র্যের সংগ্রাম কি কঠোর আকার ধারণ করেছে! বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে এ সংগ্রাম যে কত তীব্র হয়ে উঠেছে, তা ভাবতেও কষ্ট হয়। অর্থোপার্জ্জনে অক্ষমতাবশতঃ, অথবা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগের অভাবে নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকা হেতু কত মানুষের জীবন তিক্ত! কত মানুষের জীবনে কত উন্নত আকাঙ্ক্ষা বিফল হয়ে যাচ্ছে কেবল শারীরিক ব্যাধির জন্য! মৃত্যু-শোক তো সব পরিবারেই আছে। তার পর, কত পরিবারে পারিবারিক অশান্তি যেন স্থায়ী কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। হয়তো ভাইয়ে-ভাইয়ে বিরোধ আছে; হয়তো পিতায়-পুত্রে বিরোধ আছে; হয়তো পতি-পত্নীতে মনোমালিন্য পরিবারটির উপর ছায়াপাত করে রেখেছে। পরিচারককে এ সকলের সম্মুখীন হতে হবে।

এ সকল ছাড়া, যা মনের গোপনে থাকে, এমন কত সংগ্রাম মানুষের জীবনে আসে। পাপ-প্রলোভনের সঙ্গে কত দারুণ সংগ্রাম কত

মানুষের অন্তরের গোপনে লুক্কায়িত থাকে। আবার, কত ব্যাকুলাত্মা মানুষ কত রূপ চিন্তাগত সংশয়ে জর্জ্জরিত। পরিচারককে এই সব অবস্থার মানুষের সহায়তা করতে হবে। অর্থসাহায্য করতে না পারলেও, জ্ঞান দান করতে না পারলেও দরদের সাহায্যটি করতে পারা চাই; "ভয় পেয়ো না, ভগবান আছেন," এই অনুভূতিটি হৃদয়ের স্পর্শের দ্বারা সংগ্রামে পতিত মানুষের অন্তরে জাগিয়ে দিতে পারা চাই। কিন্তু এর জন্য বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা যথেষ্ট নয়। এর জন্য চাই উপলব্ধি এবং উপলব্ধি-প্রসূত দরদ ও আত্মীয়তা।

যাদের জীবনে দুঃখশোকের সংগ্রাম আছে এবং যাদের জীবনে পাপসংগ্রাম আছে, পরিচারকগণকে এই উভয় শ্রেণীর অতিরিক্ত তৃতীয় এক শ্রেণীর মানুষের সম্মুখীন হতে হয়। এই তৃতীয় শ্রেণীর মানুষেরা পাপাচারী নয়, কিন্তু তাদের প্রকৃতিটি যেন অসম্পূর্ণ। মানব-মনের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ ভাব যেন তাদের মধ্যে ফোটেই নাই। তাদের আত্মার growth যেন stunted। পাপে লিপ্ত মানুষের পরিচর্য্যা অপেক্ষাও এই শ্রেণীর মানুষের পরিচর্য্যা করা অধিক কঠিন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করা যাক।

যীশুর বর্ণিত prodigal sonএর কাহিনী স্মরণ করুন। সে কাহিনীতে ছোট ভাইটি পাপাচারী মানুষ, কিন্তু বড় ভাইটি প্রেমহীন মানুষ। ছোট ভাইর হৃদয় ছিল; বাবার মুখ ও বাবার বাড়ীর ছবি মনে পড়াতে সে পাপের পথ হতে ফিরে এল। হারাধন বাড়ীতে ফিরে এসেছে বলে পিতা বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন করলেন। ক্ষেত হতে ফিরবার পথেই বড় ভাই সে উৎসবের সংবাদ পেল; সংবাদ পেয়ে সে আর বাড়ী আসতে চায় না। "আমি বরাবর বাবার বাধ্য হয়ে বাড়ীতে থেকে খাটছি; কই, আমার জন্য তো কখনও উৎসব হয় না;

আর এ হতভাগা বাবার টাকা নষ্ট করে বাড়ী ফিরে এল, তার জন্ম উৎসব হচ্ছে !"—এই চিন্তাতে বড় ভাইর মন বিষাক্ত হয়ে উঠল।

এই দুই ভাইর মধ্যে কার অবস্থা বেশী কঠিন? বড় ভাইয়ের। যার হৃদয় বিকশিত, পাপ-পঙ্কে পতিত হলে তাকে হৃদয়ের পথ দিয়ে তোলা যায়। কিন্তু বড় ভাইর মনে ভ্রাতৃবৎসলতা বস্তুটিই নাই। সে দুরাচার নয় বটে; কিন্তু তার আত্মার growth stunted; সে শুধু নিজেকেই দেখে।

এরূপ অবিকশিত-হৃদয় মানুষদের আত্মিক পরিচর্য্যা করা অতিশয় কঠিন। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, অন্যান্য সব শ্রেণীর মানুষের অপেক্ষা এই শ্রেণীর মানুষের পরিচর্য্যা করা অধিক কঠিন। আমার পরিচিতা এক জন মহিলা আছেন; তাঁর জীবন বড় সংগ্রামময়; শরীরে নানা রোগ, মনে নানা অশান্তি। তাঁর মনের অশান্তির কথা আমাকে তিনি প্রায়ই বলেন; আমি আমার যথাশক্তি তাঁর মনে শান্তি দেবার জন্য যত্ন করি। তাঁর আত্মিক পরিচর্য্যার জন্য আমাকে বড় ব্যগ্র থাকতে হয়। একবার আমি তাঁকে বললাম, "আপনি কিছুকাল কেবল 'দয়াময়ী মা' বলে ঈশ্বরকে খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকুন; 'দয়াময়ী মা' এই নাম জপ করুন। মা বলে ডেকে আমি আমার মনের কষ্টে ও শরীরের রোগের ক্লেশে বড় আরাম পেয়েছি।" এ বিষয়ে আমি আমার জীবনের কোন কোন অভিজ্ঞতা সেই মহিলার কাছে নিবেদন করলাম। তিনি চুপ করে রইলেন। কিছু দিন পরে পত্রে তিনি আমাকে লিখলেন,—"আপনি আমাকে বলেন, ঈশ্বরকে 'মা' বলে ডাকলে শান্তি পাওয়া যায়; কিন্তু আমার পক্ষে তা অসম্ভব। আমার মা-ই আমাকে সকলের চেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছেন। 'মা' বললে আমার মনে কোন ভাল ভাব আসে না। ঈশ্বরকে 'মা' বলতে আমার মন কিছুতেই চায় না।" তাঁর পত্র

পেয়ে আমি বিপন্ন হয়ে পড়লাম। চিকিৎসকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওষুধটি ব্যর্থ হলে চিকিৎসক যেমন বিপন্ন হন, আমার মনের অবস্থা সেইরূপ হল। ভাবতে লাগলাম,—মায়ের জন্য ভালবাসা প্রত্যেক সুস্থ-প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ের একটি অতি শ্রেষ্ঠ ভাব। এই ভাবটি অবলম্বন করে ঈশ্বর মানব-হৃদয়কে স্পর্শ করেন, মা হয়ে দেখা দিয়ে তার দুঃখ-বেদনা প্রশমিত করেন। হায়, এই দুঃখিনী নারীর হৃদয়ে সেই স্থানটি শূন্য; ইহাকে তবে আমি কি করে শান্তির পথ দেখিয়ে দেব? তাঁর জন্য ঈশ্বরের চরণে ব্যাকুল প্রার্থনা ভিন্ন অন্য উপায় রইল না।

এইরূপ অবিকশিত-প্রকৃতি মানুষের পরিচর্য্যা করা বড়ই কঠিন। "স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ"; যাদের প্রকৃতিতে এই সুকোমল বৃত্তিসকল শুষ্ক, এমন মানুষদের কাছে গিয়ে পরিচারককে বিপন্ন হতে হয়, অনেক সময়ে ব্যর্থ হতে হয়। তখন তাদের জন্য কাতর প্রার্থনাই একমাত্র উপায়।

অন্তরের বিকাশ

যিনি মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যা করবেন, তাঁকে এইরূপ নানা শ্রেণীর মানুষের সংশ্রবে আসতে হবে। নানা শ্রেণীর মানুষের চিত্তের সঙ্গে তাঁকে নিজ চিত্ত মিলিত করতে হবে। এজন্য পরিচারকের পক্ষে যথাসম্ভব বহুভাবাপন্ন মানুষ হওয়া প্রয়োজন; তাঁর চিত্তের যত বেশী দিক, যত বেশী phases বিকশিত থাকে ততই ভাল। মণিকারেরা প্রায়ই গোলাকৃতি মণিকে কেটে কেটে তার 'পল' অর্থাৎ facets তৈরী করে। কোন মণির আটটি, কোন মণির বারোটি 'পল' তৈরী হয়। তখন সেই মণিকে টেবিলের উপরে রাখলে সে নিজের আটটি বা বারোটি পাশ দিয়ে টেবিলকে স্পর্শ ক'রে দণ্ডায়মান থাকতে পারে;

গড়িয়ে পড়ে যায় না। পরিচারকের অন্তরে এইরূপ মানব-প্রকৃতির নানা দিক বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। যে-মানুষটির কাছেই তাঁকে রাখ, তিনি যেন সে-মানুষটির অবস্থার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে মিলিয়ে পূর্ণ ভাবে তার অন্তরকে স্পর্শ ক'রে তার সেবা করতে পারেন। হে, পরিচারক, তোমার সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করবার বিষয় এই যে, তোমার অন্তর যেন বিচিত্র ভাবে বিকশিত হয়; তুমি যেন বিভিন্ন অবস্থার মানুষের চিত্তকে স্পর্শ করে তাদের সঙ্গে মিশতে পার।

'অন্তরে বিকাশ'—এটি একটি বড় বিষয়। এর কয়েকটি মাত্র দিকের আলোচনা করা সম্ভব। প্রথমেই মনে আসে, মানব-অন্তরের কর্ত্তব্যের দিকটি। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে এ-সংসার কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র। যিনি মানুষের আত্মিক পরিচারক হবেন, তিনি নিজে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ হবেন। কঠিন কর্ত্তব্যের সংগ্রামে পতিত মানুষকে তিনি শুধু সান্ত্বনাই দান করবেন না, তাকে তিনি সে কর্ত্তব্যে দৃঢ় হবার জন্য উৎসাহ এবং প্রেরণাও দান করবেন। সংসারের কঠিনতম কর্ত্তব্যসঙ্কটে পতিত মানুষকেও যেন পরিচারক বলতে পারেন, "ভয় নাই! আমি কর্ত্তব্যে অবহেলা না করে এ রকম সঙ্কট পার হয়ে এসেছি; তুমিও তা পারবে।" কিন্তু যদি স্বয়ং পরিচারকের চরিত্রে কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা ও তৎপরতা না থাকে, সংসারের লোক যদি জানে যে তিনি স্বয়ং দায়িত্বপূর্ণ কাজে শিথিল, তবে তার কথা তারা কিরূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবে? তাঁর দ্বারা তারা কিরূপে সাহায্য লাভ করবে? যার কর্ত্তব্যজ্ঞান শিথিল, যার দায়িত্ববোধ নাই, এবং সেই ক্রটির জন্য সংসারের কর্ত্তব্য-ক্ষেত্রে যে-মানুষ অক্ষম বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, আত্মিক পরিচর্য্যার ক্ষেত্রে তার কখনও আসা উচিত নয়। সংসার যে-পরীক্ষার দ্বারা কর্ম্মী বেছে নেয়, আগে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার পর আত্মিক পরিচর্য্যার ক্ষেত্রের উন্নততর পরীক্ষার জন্য

পরিচারককে প্রস্তুত হতে হবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ বলেন, সংসারে যে-মানুষ কর্ত্তব্যে শিথিলতা হেতু অকর্ম্মণ্য ও অযোগ্য, ধর্ম্মক্ষেত্রেও সে-মানুষ অকর্ম্মণ্য ও অযোগ্য। প্রাচীন হিন্দু আদর্শে এরূপ ধারণা ছিল বটে যে কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে অযোগ্য হয়েও মানুষ ধর্ম্মের ক্ষেত্রে গুরু বা পুরোহিতের কাজ করতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ তা নয়। অন্তরের যে যে বিকাশের দ্বারা পরিচারকগণ সংসারের মানুষের জীবনকে নানা ভাবে স্পর্শ দান করবেন, তার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উপাদান কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

পরিচারকের অন্তরের বিকাশের আর একটি বড় দিক, জ্ঞানচর্চ্চা। ফুল কি করে ফোটে, তাতে কি করে রং হয় গন্ধ হয়, পরাগকেশরের সাহায্যে কি করে ফুল হতে ফল হয়,—এ সকলের একটু পরিচয় লাভ কর; দেখবে, ফুল তোমার কাছে কত প্রিয় হয়ে যাবে, ফুল দেখে দেখে ঈশ্বরের হাত, ঈশ্বরের প্রেম কত বেশী অনুভব করতে পারবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই জন্য উদ্ভিদ্‌বিদ্যার আকাশতত্ত্বের ও ভূ-তত্ত্বের এত চর্চ্চা করেছিলেন। জ্ঞান আমাদের নব চক্ষু দান করে, জ্ঞান আমাদের ব্রহ্মসঙ্গ কত প্রসারিত করে দেয়! ফুল দেখা, চাঁদ দেখা, ঝরনা দেখা, উষা সন্ধ্যা দেখা, পাহাড়ে বেড়ানো,—জ্ঞান এ-সকলকে কত অধিক সার্থক করে তোলে। কবি কামিনী রায়ের একটি কবিতায় একটি নারী তাঁর পতিকে বলছেন,

> কিবা গূঢ়তর দৃষ্টি লভিয়াছে আঁখি তব,
> ভূতলে গগনে হের কত কিছু অভিনব!

জ্ঞান আমাদিগকে সেই নব চক্ষু দান করে, যার সাহায্যে ভূতলে গগনে কত কি নূতন দেখতে পাই। নিজ চিত্তকে বহু ভাবে বিকশিত করতে যিনি উৎসুক, সংসারের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগ রাখতে যিনি

উৎসুক, মানুষকে নানা পথ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে যিনি উৎসুক, জ্ঞান তাঁর পরম সহায়।

মানব-হৃদয়ে ভক্তির ও প্রেমের স্বাদ কত বিচিত্র! চৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখতে পাই, চৈতন্যদেবের সঙ্গিগণ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর, এই পাঁচ প্রকার রস ভক্তিতে আস্বাদন করেছিলেন। এর মধ্যে সব রসেরই স্বাদ গ্রহণ করতে মানুষের প্রাণ চায়। পরিচারকের অন্তরে এই সব রসেরই আস্বাদন থাকা চাই। সংসারের মানুষদের জীবনে হৃদয়ের বহুবিধ বৈচিত্র আছে। জ্ঞানের বৈচিত্র এবং কর্ম্ম ও ব্যবসায়ের বৈচিত্র্য তা আছেই; কিন্তু তাদের মধ্যে হৃদয়ের বৈচিত্র্যও অল্প নয়। সংসারে যিনি জ্ঞানের হিসাবে, কর্ম্মের হিসাবে, পদমর্য্যাদার হিসাবে অতি সামান্য মানুষ, তাঁরও অন্তর হয়তো ভক্তির কোন কোন ভাবের দ্বারা বেশ সরস। এ সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের হৃদয়কে স্পর্শ করা,—পরিচারকের পক্ষে ইহা অতি পবিত্র ও অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ-কাজ উপযুক্ত ভাবে সম্পন্ন করতে হলে পরিচারকের নিজের হৃদয়খানি ভক্তি ও প্রেমের বিবিধ রসে আর্দ্র থাকা আবশ্যক।

বাগ্মিতা-সর্ব্বস্ব প্রচারক যেমন মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যার অযোগ্য, এই হৃদয়গুণের অভাব বশতঃ আর এক শ্রেণীর প্রচারকও এ কাজের অযোগ্য হয়ে পড়েন। সংসারের বহু কর্ম্মবিভাগে পরিদর্শক বা inspector নিযুক্ত থাকেন। তাঁদের কাজ, মানুষের ত্রুটি আবিষ্কার করা ও নিয়ম পালনের জন্য মানুষকে চাপ দেওয়া। যাঁরা মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যা করবেন, তাঁরা যেন এই প্রকৃতির লোক না হন। "উপাসনা করেছ তো? উপাসনায় আস নাই কেন?" প্রভৃতি প্রশ্ন করে মানুষকে যিনি তাগাদা করেন বা চাপ দেন, অথচ যাঁর হৃদয়খানি দরদে প্রেমে ভক্তিতে বিকশিত হয় নাই, পরিচর্য্যার কাজে তিনি সফলতা লাভ

করতে পারবেন না। যাঁকে তাগাদা করছেন, তাঁর জীবনে কোনও প্রচ্ছন্ন বেদনা আছে কি না, অথবা তাঁর হৃদয়খানি কোনও দিক দিয়ে গূঢ় ভক্তিরসে সিক্ত কি না, এ সকল না বুঝে মানুষকে তাগাদা করলে সে-পরিচারককে শুধু যে ব্যর্থ হতে হয় তা-ই নয়, তিনি মানুষের গুরুতর ক্ষতির কারণ হন। ভক্তিহীন প্রচারক ভক্তিরসার্দ্র গৃহীর হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেন না; কবিত্ববোধহীন প্রচারক কবি-প্রকৃতিসম্পন্ন গৃহীর হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেন না। পরিচারকের পক্ষে হৃদয়ের বিকাশ অতি গুরুতর ভাবে প্রয়োজন।

আমি যে সংসারকে দরদ দিয়ে জানার কথা বলেছি, তারও মূল কথা হৃদয়ের বিকাশ। মানবীয় প্রেম যাঁর অন্তরে খুব সূক্ষ্ম ও কোমল আকারে বিদ্যমান নাই, এমন মানুষের পক্ষে আত্মিক পরিচর্য্যার কাজ করা অতি কঠিন। এমন মানুষ বোধ হয় এ ক্ষেত্রে না এলেই ভাল হয়। যে-মানুষ কখনও গাঢ় মানবীয় প্রেম আস্বাদন করে নাই, যে-মানুষ প্রেমের মিলনের আনন্দ জানে নাই, প্রেমের বিরহের ক্লেশ জানে নাই, যার হৃদয় কখনও মানুষের ভালবাসায় বিহ্বল হয় নাই, পাগল হয় নাই—, তা সাংসারিক ভালবাসাই হোক, কিংবা কোনও সাধুভক্তের প্রতি হৃদয়ের উচ্ছলিত ভক্তির আবেগই হোক, সে-মানুষ কি করে সংসারের হৃদয়বান মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যা করবে? সংসারের মানুষ কি-করে তাকে নিজ হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে নিবে যাবে?

অপ্রাপ্ত উপলব্ধির পূর্ব্বাস্বাদ

এই জন্যই বলি, আত্মিক পরিচারকের ব্যাকুলতম প্রার্থনা এই যে, "দয়াল, দয়া করে আমাকে মানব-হৃদয়ের সব অনুভূতির আস্বাদ দাও। মানব-হৃদয়ের সব অনুভূতি বোঝবার জন্য আমাকে অনুভবশক্তি দাও।"

যে পরিচারক এ বিষয়ে ব্যাকুল, যাঁর প্রাণটি দরদে পরিপূর্ণ, যাঁর হৃদয় খুব তাজা, সেই দয়াময় তাঁর এই প্রার্থনা নানা ভাবে পূর্ণ করেন। কেমন করে পূর্ণ করেন? কোনও এক জন মানুষের পক্ষে তো সংসারের নানা অবস্থায় পতিত মানুষদের সব অভিজ্ঞতা নিজ জীবনে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়; তবে যে-দুঃখ সে বহন করে নাই, যে-সুখ সে আস্বাদন করে নাই, তার অনুভূতি সে কেমন করে লাভ করবে? এ বিষয়ে সেই পরম দয়ালের অপূর্ব্ব নিয়ম এই যে, যার হৃদয় তাজা, প্রাণ ব্যাকুল, সে-মানুষ তাঁর কৃপায় জীবনের বহু উপলব্ধিতে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই তার পূর্ব্বাস্বাদ লাভ করতে সমর্থ হয়।

দেখা যায়, বিবাহ করেন নাই এমন সহৃদয় পুরুষ, এমন সহৃদয়া নারী দাম্পত্য জীবনের অতি পবিত্র চিত্র উপন্যাসে অঙ্কিত করেছেন। কেমন করে তাঁরা তা পেরেছেন? তাজা ও দরদী হৃদয়ে ভগবান অনেক বস্তুর আভাস অনুভূতি দান করেন, অনেক বস্তুর পূর্ব্বাস্বাদ দান করেন; তাই তা সম্ভব হয়। এমন কি, মানব-হৃদয়কে ভগবান এমন শক্তি দিয়েছেন যে, যাঁর জীবনে ঘটনাবশে কোনও মানবীয় প্রেম ব্যর্থ হয়ে তাঁর আজীবনের দারুণ ক্লেশের কারণ হয়েছে, এমন মানুষও দরদী হয়ে অপরের জীবনের সেই প্রেমের সাহায্য করতে পারেন, অপরের জীবনের সেই প্রেমকে মধুময় ভাবে আস্বাদন করতে ও মধুময় বর্ণনা দ্বারা জগৎকে তা আস্বাদন করাতে সমর্থ হন। মানুষের তাজা হৃদয়ে এমন বল আছে যে, সংসারের ব্যর্থতা তার প্রেমানুভব-শক্তি ও প্রেমদান-শক্তিকে নষ্ট করতে পারে না। প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক ডিকেন্স পারিবারিক জীবনের অতি সুকোমল ও সুমধুর চিত্রসকল অঙ্কিত করেছেন; আত্মবিসর্জ্জনশীল ও মহৎ আকাঙ্ক্ষায় চালিত প্রণয়ের ছবি তাঁর লেখনীতে চমৎকার হয়ে ফুটে উঠেছে। অথচ তাঁর পত্নীর প্রকৃতিটি এমন ছিল

যে, সে জন্য তাঁর নিজের দাম্পত্য জীবন অতি ক্লেশময় হয়েছিল। সারা জীবন সেই গূঢ় বেদনা বহন করেও তিনি নিজের প্রাণটি এমন তাজা রেখেছিলেন! মানব-হৃদয়কে পরমেশ্বর কত আশ্চর্য্য শক্তির আধার করে সৃষ্টি করেছেন!

হৃদয়ের জীবনে 'পূর্ব্বাস্বাদ লাভ' এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, দয়ালের এক আশ্চর্য্য বিধি! মায়েরা রান্না-ঘরে যা রান্না করেন, অনেক সময়ে পরিবেশন করে খেতে বসাবার আগেই সন্তানদের তিনি সে-বস্তু একটু একটু চাখিয়ে দেন। পরমজননীও যেন তেমনি, মানবের সমুদয় হৃদয়ামৃতের একটু একটু পূর্ব্বাস্বাদ আমাদিগকে দান করেন; পরে উপযুক্ত সময়ে তার পূর্ণাস্বাদ আমরা লাভ করি। আবার, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে জগৎকে সে-বস্তু পরিবেশন করবার অধিকারও আমরা প্রাপ্ত হই।

নিজ অভিজ্ঞতা অতিক্রম

সেবাক্ষেত্রে গিয়ে অনেক সময়ে এমন ঘটে যে, যে-দুঃখ যে-বেদনা আমি নিজে এখনও প্রাপ্ত হই নাই, সেরূপ দুঃখে সেরূপ বেদনায় আহত মানুষের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। দরদী মানুষকে ভগবান এ-শক্তি দেন যে, সে নিজ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করেও এরূপ অবস্থায় অপরের সেবা করতে পারে। আমাকে যখন ভগবান আত্মিক পরিচর্য্যার কাজে প্রথম নিযুক্ত করেন, তখনও আমি জীবনে কোন গুরুতর শোক প্রাপ্ত হই নাই। ক্রমে সেরূপ দিন এল। একুশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন অতিশয় অতর্কিত ভাবে সামান্য অসুখে আমার কন্যার দেহত্যাগ ঘটে। তখন আমি ও আমার পত্নী সেই আঘাতকে বড় নিদারুণ বলে অনুভব করেছিলাম। কিন্তু মন যখন শোকের আঘাতে মুহ্যমান, তার মধ্যেই অনুভব করলাম যে, ভগবান সেই শোক দিয়ে

আমাকে তাঁর সেবাক্ষেত্রের আর একটু যোগ্য করে নিলেন; শোকার্ত্ত মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যার অধিকার আমার একটু বাড়ল; ঈশ্বর যেন আমাকে তাঁর সেবাক্ষেত্রের উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দিলেন। এই সময় হতে আমি সন্তানহারা পিতা মাতার ব্যথা নিজ হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার শক্তি লাভ করলাম; এই সময় হতে আর আমাকে এ-বিষয়ে নিজ অভিজ্ঞতা অতিক্রম করতে হয় না।

বারো বৎসর পূর্ব্বে একজন উচ্চপদস্থ শিক্ষিত বন্ধুর পত্নী অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে পরলোকগত হন। পতি সেই আঘাতে প্রথম প্রথম অতি অধীর হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে তিনি অতি ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "আমি তাঁকে পাব তো?" যাঁর মন এমন ব্যাকুল, যাঁর প্রশ্ন এমন স্পষ্ট, তাঁকে উত্তর দিতে কি দ্বিধা করা যায়? তাঁকে কি অস্পষ্ট উত্তর দেওয়া যায়? অথবা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা বাগ্‌বিন্যাস করে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়? পত্নীবিয়োগের অভিজ্ঞতা তখনও আমার হয় নাই। ভক্ত প্রকাশচন্দ্রের শিষ্যত্বের ফলে আত্মিক অনুভূতির যেটুকু সম্বল তখন আমার ছিল, তাই নিয়ে সাহস করে আমায় বলতে হ'ল, "হাঁ, তাঁকে আপনি পাবেন।" তিনি আমার হাতখানি দু হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, "পাব? নিশ্চয়ই পাব?" আমি বললাম, "হাঁ, নিশ্চয়ই পাবেন।" তাঁকে আমি প্রকাশচন্দ্রের পদ্ধতি বলে দিলাম। সে-পদ্ধতিতে সেই বন্ধু আশ্চর্য্য ফল লাভ করেছেন। প্রতি বৎসর তাঁর পত্নীর স্মরণের দিনে তিনি উৎসাহের সঙ্গে সাক্ষ্য দান করেন যে, তিনি কেমন উজ্জ্বল ভাবে পত্নীর আত্মার সঙ্গ ও তৎপ্রসূত অনুপ্রাণন অনুভব করছেন। বারো বৎসর পূর্ণ হলে তিনি বললেন, "আমার সহধর্ম্মিণী আমার কাছে এখন এত সত্য যে, আমি কেবল তাঁর সঙ্গই অনুভব করি না, তাঁর পরামর্শও আমি প্রাপ্ত হই!"

যেদিন সেই বন্ধুর পত্নীবিয়োগ হয়, সেই এক দিন, আর এই এক দিন! সেই দিনটি আমার পরিচারক-জীবনের একটি চিহ্নিত দিন। ভগবান মাঝে মাঝে তাঁর দাসকে বড় কঠিন অবস্থায় ফেলেন; নিজ অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করে সেবার কার্য্য করতে আদেশ করেন। সেইরূপ অতি কঠিন একটি সেবার কার্য্যে তিনি সেদিন আমাকে নিযুক্ত করেছিলেন। বন্ধুর ঐ প্রশ্নে প্রথমটা আমি নিজকে বড়ই বিপন্ন বলে অনুভব করেছিলাম। কিন্তু দয়ালের নাম স্মরণ করে, তাঁর দয়ার ভিখারী হয়ে, তাঁর চরণে লুণ্ঠিত হয়ে আমার উপরে অর্পিত এ গুরুভার আমি স্বীকার করে নিলাম। ঐ ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে আমার পত্নীবিয়োগ হয়। আমার সেই বন্ধুকে তখন আমি লিখলাম, "আজ আপনিই আমাকে সাহায্য করুন। আপনার সঙ্গে আমার যোগ এখন হতে আরও কত গভীরতর হবে।"

যে পরম-প্রভু তাঁর দাসকে অতর্কিত অভাবিত অননুভূত অবস্থার মধ্যে ফেলে তাঁর সন্তানদের সেবার গুরুভার অর্পণ করেন, তিনিই আবার দয়া করে সে-দাসকে সে ভার-বহনের বলও দান করেন। একটি অভিজাত পরিবারের একজন বধূর জীবন বড় দুঃখময় হয়েছিল। পতি অবিশ্বস্ত হওয়াতে তাঁদের বিবাহচ্ছেদ হয়। বংশ রক্ষার জন্য কোর্ট আদেশ করেন যে, অল্পবয়স্ক সন্তান দুটি পিতার অভিভাবকত্বে থাকবে, কিন্তু বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কয়েক মাস মার কাছে থাকতে পাবে। এক বার সন্তানদের মধ্যে একটির টাইফয়েড জ্বর হল। সে সময়ে মাতার কাছে সন্তানদের থাকবার কথা ছিল না; মাতাকে রোগীর পার্শ্বে আসতেও দেওয়া হল না। একে অভিজাত পরিবার, তাতে বিবাহচ্ছেদের মামলা হওয়াতে সে-গৃহের সকলের মনে বধূর প্রতি আক্রোশের ভাব ছিল। অবশেষে যখন আর রোগীর বাঁচবার আশা রইল না, তখন তার

ক্রন্দনে মাকে দিবসের মধ্যে অল্প সময় তার কাছে আসবার অধিকার দেওয়া হল। যেদিন রোগী মুমূর্ষু, সেদিন ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে বলে মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে অতি নির্ম্মম ভাবে মাতাকে সে বাড়ী থেকে বাহির করে দেওয়া হল। অল্পকাল পরেই সে সন্তানের মৃত্যু হল।

এই নারীকে সান্ত্বনা দানের জন্য আমাকে তার কাছে যেতে হয়েছিল। আমি তখন সন্তান-শোক জেনেছি বটে, কিন্তু এই নারীর দুঃখ সাধারণ সন্তানহারা পিতামাতার দুঃখের চেয়ে কত অধিক তীব্র! তার দুঃখের গভীরতা আমার প্রাণ, বিশেষতঃ আমার পুরুষের প্রাণ, কিরূপে পরিমাণ করবে? "ইহার এত বেদনা তো আমি পরিমাণ করতেই পারছি না, আমার মন যেন ইহার দুঃখের গভীরতার থা পাচ্ছে না"—এইরূপ একটি ভাব মনে এসে ক্ষণকাল আমার বাক্য রুদ্ধ করে দিল। পরে ঈশ্বরকে স্মরণ করে এবং যতখানি দরদের শক্তি আমাতে আছে তা জাগরিত করে নিয়ে আমি সেই নারীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম এবং তার জন্য প্রার্থনা করলাম। আমি আমার কর্ত্তব্য করলাম বটে, কিন্তু সেদিন "going beyond my depth"-এর অনুভূতিতে আমার প্রাণকে ত্রস্ত ও কম্পিত করে দিয়েছিল। পরিচারককে এইরূপ অবস্থাতে অনেক সময় পড়তে হবে। এইরূপ অবস্থায় পরিচারকের একমাত্র সম্বল দরদপূর্ণ ব্যাকুল প্রার্থনা,—"হে দয়াল, যেন দুঃখীর সব দুঃখ নিজ হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার শক্তিটি আমি লাভ করি!"

নিজের পাপ-সংগ্রাম

আত্মিক পরিচর্য্যার ক্ষেত্রে যে কত বিভিন্ন শ্রেণীর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, তা বলে শেষ করা যায় না। এমন কি, পাপের সংগ্রামের

অভিজ্ঞতা থাকাও পরিচারকের পক্ষে প্রয়োজন। পাপের সঙ্গে যিনি কখনও ভাল করে সংগ্রাম করেন নাই, অনুতাপে বিদীর্ণ হওয়া যে কিরূপ, তা যিনি জানেন নাই, সংসারের অনেক মানুষকে আত্মিক সাহায্য দান করতে তিনি অক্ষম হবেন। মানবজীবনের এমন কোন অভিজ্ঞতা নাই, ঈশ্বরের বিধানে যা তাঁর সেবাক্ষেত্রে কাজে লাগে না। হে ঈশ্বরের সেবক! পাপের সংগ্রামে যে-মানুষ বড়ই পরিশ্রান্ত, অথচ শুদ্ধতার জন্য ব্যাকুল, তাকে নিজ অভিজ্ঞতার কথা, নিজ জঘন্যতম পাপের ও তা হতে উদ্ধারের কথা মন খুলে বলে সাহায্য করতে কখনও সঙ্কুচিত হয়ো না; উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিজ জীবনের পঙ্কময় তমোময় অংশ খুলে দেখাতে ভয় পেয়ো না। "মানুষ আমাকে নীচু বলে জানবে," এ সঙ্কোচ যেন মনে না আসে। ঈশ্বর-সেবক মানুষের সেবার জন্য নিজ জীবনের সব বস্তু ব্যবহার করতে বাধ্য; জীবনের যে-সকল পাপের উপরে ব্রহ্মের করুণা পড়েছে, তাকেও এ কাজে ব্যবহার করতে তিনি বাধ্য।

বিনয় ও দরদ

পরিচারকেরা যেন কখনও আপনাদিগকে সংসারের মানুষদের থেকে পৃথক-শ্রেণীভুক্ত বলে না দেখেন। তাঁরাও সংসারেরই মানুষ। নিজেদের পৃথক-শ্রেণীভুক্ত বলে ভাবতে আরম্ভ করলেই সেবা-কার্য্যের মূল ছিন্ন করা হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মনে করতেন, "আমি গৃহী মানুষ, আমি কি বেদীতে বসবার যোগ্য?" আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁকে জোর করে বেদীতে না বসালে তিনি হয়তো কখনও বসতেন না। তাঁর এই বিনয়ই তাঁকে এত উঁচু করেছিল। ভক্ত প্রকাশচন্দ্র গৃহী-শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই গৃহিগণ গৃহী হয়েও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারকগণের শিক্ষাগুরু ছিলেন।

দরদ ও নম্রতা, এই দুই মন্ত্র পরিচারকের প্রধান সাধন। পরিচারক

নম্রভাবে সংসারের সকলকেই গুরু বলে স্বীকার করবেন। আমাদের দৈহিক পরিচর্য্যাকারী ভৃত্যেরাও আমাদের গুরু।

সংসার এমনি বহু গুরুতে পরিপূর্ণ। সংসারকে ভগবান এমন করে রচনা করেছেন যে, সকলের কাছেই সকলের কিছু না কিছু শিক্ষণীয় আছে। বিশেষ করে, হে পরিচারক, যেখানে তুমি পরিচর্য্যা করতে যাবে, সেখানে তুমি নিজে শিষ্য-ভাবে যেও। সর্ব্বাগ্রে দেখ, তাদের কাছে তোমার কিছু শিখবার আছে কি না। তার পর ভৃত্য হয়ে, দরদী বন্ধু হয়ে, দরদের সঙ্গে, মমতার সঙ্গে, নিজ জীবনের সত্য উপলব্ধিতে যা পেয়েছ তাই দিয়ে তাদের সেবা করবার চেষ্টা করো।

১৩৪১

তারুণ্য কারুণ্য লাবণ্য

চৈতন্যচরিতামৃতের এক স্থানে 'কারুণ্য তারুণ্য ও লাবণ্য' এই তিনটি গুণের কথা আছে; সেবকের পক্ষে এই তিনটি গুণ অর্জ্জন করা বিশেষ আবশ্যক। তার মধ্যে 'কারুণ্য' গুণটির নানা দিক যীশু নিজ উপদেশের ভিতরে অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

যীশুর একটি শিক্ষা,—নির্ভরযোগ্য হও, নির্ভরশীল হও

যীশু তাঁর অধিকাংশ উপদেশে মানুষের অন্তরের প্রকৃতির দিকে, বিশেষতঃ কারুণ্য, কোমলতা ও নম্রতার দিকেই প্রধান দৃষ্টি রেখেছিলেন। কিন্তু প্রভুর কার্য্য যাতে ভালরূপে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে ভৃত্যকে যে সর্ব্বদা অবহিত থাকতে হবে, এ কথাটিও যীশু স্পষ্ট ভাবেই বলে গিয়েছেন। তাঁর তিন জন ভৃত্য সম্বন্ধীয় উপদেশটি (Matt. 25, 14—30) ইহার দৃষ্টান্তস্থল। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সেবকদের মনে তাঁর এই উপদেশটি সর্ব্বদা জাগরূক থাকা উচিত। ঈশ্বরের কোনও কাজ শিথিল হস্তে ধরা, অসাবধান ভাবে সম্পন্ন করা কর্ম্মীর পক্ষে গুরুতর অপরাধ। প্রভু যেন সর্ব্বদা দেখতে পান যে আমরা তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রের নির্ভরযোগ্য কর্ম্মী।

দ্বিতীয়তঃ, সেবকের অন্নবস্ত্রের অভাব এবং ঈশ্বরের আদেশে সেবকের দ্বারা আরব্ধ কল্যাণকর্ম্মগুলির সর্ব্ববিধ অভাব স্বয়ং ঈশ্বরই পূর্ণ করবেন, এই বিশ্বাস ও নির্ভর সেবকের অন্তরে সর্ব্বদা জাগরিত থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে যীশুর উপদেশ কি চমৎকার! তিনি

বলেছেন, "ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের জন্য ও পুণ্যজীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষাকেই তুমি অন্তরে সর্ব্বপ্রথম স্থান দাও; অন্য যাহা যাহা কিছু তোমার প্রয়োজন, তাহা তুমি নিশ্চয় প্রাপ্ত হবে।" তিনি বলেছেন, "কল্যকার জন্য অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন হইও না।" আবার বলেছেন, "বায়ুচারী পাখীদের দিকে তাকাও; পরমেশ্বর তাহাদিগকে আহার দিতেছেন। বনজাত ক্ষুদ্র ফুলগুলির দিকে তাকাও; পরমেশ্বর তাহাদিগকে সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত করিতেছেন। তবে কি তিনি তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব পূরণ করিবেন না?" যীশুর এই নির্ভরশীলতার উপদেশ সেবকের জীবনে অতি মূল্যবান।

কারুণ্যের ভিত্তি,—চরিত্র ও হৃদয়-প্রধান ধর্ম্মজীবন

যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ধর্ম্মে বাহ্য অনুষ্ঠানের বিশেষ মূল্য নাই; এমন কি, বহুবার ঈশ্বরকে ডাকারও বিশেষ মূল্য নাই; ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। নম্র, অদ্রোহী, ক্ষমাশীল, প্রেমানুগত ও দরদী প্রকৃতিকে এবং অন্তরের বিশুদ্ধতাকে তিনি তাঁর উপদেশাবলীর মধ্যে ধর্ম্মজীবনে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। আমাদেরও সর্ব্বদা এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন এবং প্রচার করা প্রয়োজন যে, ধর্ম্মসাধনের সার্থকতা ও ধর্ম্মসাধনের পরীক্ষা মানুষের প্রকৃতির কোমলতা ও মহত্ত্বের দ্বারাই হয়। প্রাচীন কালে এক শ্রেণীর ধর্ম্মচিন্তা কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি ঝোঁক দিয়েছিল; তা অতি নিকৃষ্ট। আবার এক শ্রেণীর ধর্ম্মচিন্তা পূজা ও নামজপ প্রভৃতির বাহুল্যের প্রতি ঝোঁক দিয়েছিল। তা-ও নিকৃষ্ট; কারণ ধর্ম্মসাধনের মূল্য গণিতের সংখ্যার দ্বারা নির্ণয় করা যায় না; চরিত্রের মহত্ত্ব, মাধুর্য্য ও কোমলতার দ্বারাই তার মূল্য নিরূপণ হয়।

যদি চিন্তা করা যায়, যীশু তাঁর সমুদয় ধর্মোপদেশের দ্বারা মানব-মনে যত আলোক প্রদান করেছেন, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় আলোকটি কি, তবে বলতে হয় তা শাস্ত্রালোক নয়; তা প্রচলিত সুরীতির অনুজ্ঞাও নয়; তা প্রেমিক ও সহৃদয় প্রকৃতির অন্তর্জ্যোতি। শাস্ত্রকে নয়, সদাচারকে নয়, কিন্তু মানবের নির্ম্মল হৃদয়কেই তিনি ধর্ম্ম-মন্দিরের দীপ বলে প্রকাশ করেছিলেন। এরূপ করাতেই সে যুগের মানুষের কাছে তাঁর শিক্ষা এত নূতন ব'লে বোধ হয়েছিল।

মার্থা ও মেরী দুটি বোন তাঁর অনুগত শিষ্যা। তাদের বাড়ীতে তিনি এসেছেন। মার্থা কেবল কাজে ব্যস্ত; সে একবারও যীশুর কাছে বসে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ সৃষ্টি করে করে সে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। মেরী প্রয়োজনীয় কাজগুলি করে বটে কিন্তু সে যীশুর কাছে বসে তাঁর বচনসুধা পান করাকেই প্রাধান্য দান করে। যীশু মার্থাকে বললেন, "তুমি অনেক ব্যস্ততার দ্বারা নিজ জীবনকে উদ্বিগ্ন করে ফেলছ; মেরীই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ধরেছে। সে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিটির সুফল তার জীবন হতে কখনও মুছে যাবে না।"

যে-কর্ম্মপ্রিয়তা ও কর্ম্মব্যস্ততা মানুষের প্রকৃতিকে এমন করে তোলে যে সে আর শেষে ঈশ্বরের কাছে বসতেই অবসর পায় না, তা হতে আমাদের সযত্নে আত্মরক্ষা করতে হবে। নিশ্চয়ই এমন এক দিন ছিল যখন মার্থাও যীশুর কাছে বসতো ও বসে তৃপ্তি লাভ করতো। কিন্তু অতিরিক্ত কর্ম্মপ্রবণতার ফলে ক্রমে তার অন্তরের সেই রুচি চলে যেতে লাগল। সেদিন সে শুধু যে কাছে বসলো না, তা-ই নয়; সে মেরীকে অনুযোগও করতে লাগল। "আমি খেটে খেটে মরছি, আর তুমি আমায় সাহায্য করছ না,"—মার্থার এই অভিযোগের বাণী, এই তিক্ত স্বর যেন এখনও ভগবানের কর্ম্মক্ষেত্রে নানা কর্ম্মশ্রান্ত মানুষের

মুখে শুনতে পাওয়া যায়। অতি-ব্যস্ততার এই যে দুটি দারুণ কুফল, (১) ঈশ্বরের ঘন সাহচর্য্যে বসবার রুচি লুপ্ত হওয়া, এবং (২) অপরের প্রতি অভিযোগের ভাব,—আমাদিগকে এই দুই কুফল হতে অতি সাবধানে আত্মরক্ষা করতে হবে।

এ বিষয়ে আরও একটি কথা আছে। হৃদয়ের মূল্য কর্ম্ম অপেক্ষা অনেক অধিক। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমযোগই ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য; কর্ম্ম তা একটি উপায় মাত্র; কর্ম্মকে ধর্ম্মসাধনের চরম উদ্দেশ্য মনে করা কখনও উচিত নয়। মেরীর মতন পরম প্রভুর সাহচর্য্যে বসতে শিখব, ইহাই ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য। কর্ম্মের দ্বারা মানব-প্রকৃতি বলশালী হয়, গভীর হয়; মানবজীবন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগের জন্য অধিক প্রসার লাভ করে। ইহাই কর্ম্মের সার্থকতা। যিনি মার্থার ন্যায় কর্ম্ম করবেন, তিনি মেরীর ন্যায় ভগবানের সঙ্গ-সুধায় মগ্ন হবেন, এই উদ্দেশ্য অন্তরে ধারণ করেই যেন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। যীশু ঠিকই বলেছিলেন, Mary hath chosen the better part.

ব্রাহ্মসমাজের অনেক কর্ম্মীর জীবনের সাক্ষ্য এই যে, কর্ম্ম ও ব্রহ্মযোগ, এই উভয়ের পূর্ণ সামঞ্জস্য করা সম্ভব। মার্থা-প্রকৃতি ও মেরী-প্রকৃতি আপনাতে মিলিত করা সম্ভব। আমরাও যেন এই সামঞ্জস্যের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখতে পারি।

কারুণ্যের ছবি,—দরদী ঈশ্বর, দরদী সেবক

হৃদয়কে দীপ্ত করার আর একটি সুফল যীশুর শিক্ষার ভিতরে অতি সুস্পষ্ট। ঈশ্বরকে আমরা কি ভাবে চিন্তা করব? মানবজীবনের ভাল ও মন্দ নানাবিধ আচরণের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টিটি কিরূপ? যীশুর পূর্ব্বে জুডিয়া দেশে এই ভাবই প্রধান ছিল যে ঈশ্বর মানবের বিচারক।

আদালতের বিচারকের ন্যায় একদিকে পক্ষপাতশূন্য, অপর দিকে মমতাশূন্য দৃষ্টিতে তিনি মানবকুলের সমুদয় পাপ পুণ্যের বিচার করতে নিত্য নিযুক্ত। যীশু বললেন, "তা নয়। ঈশ্বর বিচারক নন। তিনি স্নেহময় ও ক্ষমাশীল পিতা।" এই স্নেহময় পিতার ভাবটি এখন ধর্ম্মরাজ্যে কেমন প্রচলিত! কিন্তু যীশুর সময়ে সে দেশের মানুষের কাছে এটি বড় নূতন বলে মনে হয়েছিল।

যীশুর শিক্ষার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে কারুণ্য বা দরদের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা বলা যাক্।

যীশু বললেন, পাপীর সম্বন্ধে ঈশ্বরের দৃষ্টি বিচারকের দৃষ্টির মত নয়, স্নেহময় ও দরদী পিতার দৃষ্টির মত। এই জন্য, জগতের দুঃখী ও পাপীদের প্রতি ধার্ম্মিক মানুষের দৃষ্টিটিও দরদের দৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

দরদ—দুঃখীর প্রতি

যীশুর জীবন-কাহিনীতে তাঁহার কৃত যতগুলি কাজের বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়, তার প্রায় সবগুলিই দুঃখীর দুঃখমোচন সম্বন্ধীয় কাজ। রোগী, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, দরিদ্র, এবং শোকার্ত্ত,—এই চারিশ্রেণীর মানুষের সেবাতেই প্রধানতঃ তিনি নিজ সময় ব্যয় করেছেন। তিনি রোগীর রোগযাতনা দূর করতেন, (যদিও বাইবেলে এই শ্রেণীর কাজের বর্ণনায় অনেক অত্যুক্তি আছে)। তার পর, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত মানুষদিগকে শান্তি দান করা যেন তাঁর জীবনের একটি বিশেষ ব্রত ছিল। তাঁর সেই অমৃতময় আহ্বান,—"যাঁরা পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, আমার কাছে এস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দান করিব",—যুগে যুগে কত দুঃখী তাপীর প্রাণকে শীতল করেছে! এই বাণীই যেন যীশুর জীবনের প্রধান বাণী; তাঁকে বুঝতে হলে প্রধানতঃ

এই বাণী দিয়েই বুঝতে হবে। যাঁরা যীশুর অনুবর্ত্তী হয়ে এত যুগ ধরে এত দেশে দেশে তাঁর ধর্ম্ম প্রচার করে এসেছেন, যীশুর এই বাণীই তাঁদের প্রধান ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আবার যাঁরা যুগে যুগে দেশে দেশে যীশুর ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, প্রধানতঃ এই বাণীটিই তাঁহাদের যীশুর দিকে আকৃষ্ট করেছে। তার পর দেখা যায়, দরিদ্রের জন্য, বিশেষতঃ বিধবা ও পিতৃমাতৃহীনদের জন্য যীশুর হৃদয় কিরূপ সমবেদনায় পরিপূর্ণ ছিল। সর্ব্বশেষে, শোকার্ত্ত ও ব্যথিতদের সান্ত্বনা দান করা যীশুর জীবনের বিশেষ ব্রত ছিল। দেখা যায়, তিনি শোকার্ত্তকে শুধু উপদেশ দান করতেন না, কিন্তু তার অশ্রুতে নিজের অশ্রু মেশাতেন।

একখানি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইংরেজী উপন্যাসে পড়েছিলাম, একজন আচার্য্য তত্ত্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রথম প্রথম ঈশ্বরকে কেবল অনন্ত জ্ঞানময় ও অনন্ত শক্তিময় বিশ্বনিয়ন্তা বলে এবং মানবের জীবনে কর্ম্ম-ফলদাতা বলে নিজ congregationএর কাছে ব্যাখ্যা করতেন। তার ফল এই হল যে, তাঁর উপাসকমণ্ডলীর অনেকের মন ঈশ্বরের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠল। অবশেষে একটি ধর্ম্মজ্ঞানহীনা নারী তাঁকে বললেন, আপনি একবার আমার সঙ্গে একত্রে Lazarusএর মৃত্যুকাহিনীটি পাঠ করুন তো! সেই মৃত্যুকাহিনীর মধ্যে একটি verse আছে, 'Jesus wept'; এইটিই সমগ্র বাইবেল গ্রন্থের ক্ষুদ্রতম verse। যে যীশুকে অবতারবাদী খ্রীষ্টানগণ সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অবতার বলে বিশ্বাস করেন, যে যীশুর সম্বন্ধে এ মৃত্যুকাহিনীর ভিতরে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি ক্ষণকাল পরেই মৃত Lazarusকে জীবন দান করলেন, তাঁরও চক্ষে সে সময়ে শোকার্ত্তের প্রতি দরদের ভাব হতে অশ্রুর উদয় হল। "অশ্রুর উদয় হ'ল কেন," এই আলোচনা করতে করতে তাঁরা উভয়ে অনুভব করলেন, ঈশ্বর কেবল অনন্ত শক্তিময় নন, তিনি অনন্ত দয়াময়; এবং

ঈশ্বর কেবল দুঃখীর দুঃখ মোচনই করেন না, তিনি দুঃখীর দুঃখ অনুভবও করেন। "অনন্তের চক্ষে দরদের অশ্রু"—এই নব শিক্ষাটি তাঁরা দুজনে সেদিন একত্রে গ্রহণ করলেন; এবং তাঁরা বললেন, সমগ্র বাইবেল গ্রন্থের এই ক্ষুদ্রতম verseটিই সমগ্র বাইবেল গ্রন্থের প্রদীপ।

দরদ—পাপীর প্রতি

পাপীর প্রতি ধর্ম্মরাজ্যে কি-ভাব পোষণ করা হবে,—এ প্রশ্নে যীশুর প্রদত্ত উত্তরটি অতি আশ্চর্য্য; ধর্ম্মজগতে সে উত্তর অতুলনীয়। যীশু বলছেন, পাপীর পাপ যতই গর্হিত হোক না কেন, তার আচরণের জন্য সংসারের চক্ষে সে যতই দণ্ডার্হ হোক না কেন, তাকে তুমি সর্ব্বাগ্রে দুঃখীর শ্রেণীতে ফেল; তাকে তুমি সর্ব্বাগ্রে পরম দুঃখী বলেই দেখ। পাপীর প্রতি এই দরদের ভাবটিই যেন খ্রীষ্টধর্ম্মের শিক্ষামালার মধ্যমণি। যীশুর অমৃতোপম দুইটি দৃষ্টান্ত, (১) হারানো মেষের অন্বেষণ ও (২) বৃদ্ধার হারানো টাকার অন্বেষণ,—এই ভাব হতেই উৎসারিত। হায় হায়, আমরা যখন এই আদর্শের সঙ্গে আমাদের আচরণকে মেলাই, লজ্জায় অধোবদন হতে হয়: ধর্ম্মক্ষেত্রে থাকবার অযোগ্য বলে সে ক্ষেত্র হতে সরে দাঁড়াতে ইচ্ছা হয়। মানুষের কোনও দোষ প্রকাশ হওয়া মাত্র তাকে বিচার করবার জন্য, ফাড়া-ছেঁড়া করবার জন্য আমরা কিরূপ ব্যগ্র হয়ে উঠি! এই আমরাই আবার মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যা করব বলে স্পর্দ্ধা করি।

ধর্ম্মরাজ্যে হৃদয়কেই দীপ করে নিয়ে চলতে হবে, এ সত্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যীশুর অনুতাপ-তত্ত্বে। একটি নারীর সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "তার জীবনে বহু পাপ আছে বটে, কিন্তু তার অন্তরে প্রচুর প্রেম আছে; তাই তার সব পাপের ক্ষমা হয়ে যাবে।"

এই উক্তিটি অবলম্বন করে Dr. James Martineauর একটি সুন্দর উপদেশ আছে ; তার নাম "Forgiveness to Love"। পাপীর দণ্ড ও দণ্ডমুক্তির বিষয়ে আলোচনা করে কোন লাভ নাই ; বিধাতাই তার বিধান করেন ; মানুষ তার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত অনুতাপের লক্ষণ বিষযে যীশুর ঐ উক্তি হতে সুন্দর আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃত অনুতাপের লক্ষণ, দণ্ডের ভয় নয়। আমি কোন্ উচ্চ স্থান হতে কোন্ নিম্ন স্তরে পড়ে গেলাম, এই অনুশোচনা নয়। ভবিষ্যৎ জীবনে কত দীর্ঘ দিনে আমার আত্মসংশোধন সম্ভব হবে, তার হিসাবও নয়। উচ্ছ্বাসময় আত্মধিক্কারও নয়। এ সমুদয় ব্যাপারই অনুতাপের অন্তর্গত হয়ে বিদ্যমান থাকে বটে ; কিন্তু এর কোনটিই অনুতাপের মূল কথা নয়। অনুতাপের মূল কথা এই,—"তুমি আমাকে এত ভালবাস ; কিন্তু আমি আমার আচরণের দ্বারা তোমার সেই প্রেমে কত ব্যথা দিয়েছি !" প্রেমের অনুভূতি যার অন্তরে নাই, তার অন্তরে অনুতাপ পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাপারগুলির আকারে উদয় হয় বটে ; কিন্তু এই প্রকৃত অনুতাপ, এই প্রেমের অনুশোচনা, হৃদয়োত্থিত এই দারুণ বেদনা, প্রেমিক ভিন্ন অন্য কেহ জানে না।

দরদ—সুখীর প্রতি

যীশু কেবল মানুষকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন না। তিনি অনুরাগী মানুষদের ও শিষ্যদের সঙ্গে বসে কেবল ধর্ম্মপ্রসঙ্গই করতেন না। সংসারের সাধারণ মানুষের সরল আনন্দকে তিনি অবজ্ঞা করতেন না। বিশ্বাসের অযোগ্য অলৌকিক কাহিনীতে পূর্ণ হলেও বিবাহ-বাড়ীতে গিয়ে গৃহবাসীদের সঙ্গে আনন্দ করা এবং পানীয় দ্রব্যের অভাব পূর্ণ করে তার ব্যাপারে এর একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের অন্তর পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই, দুঃখীর প্রতি দরদী হওয়া আমাদের পক্ষে তো কঠিনই ; যে মানুষ আনন্দ করছে, তার সঙ্গে আনন্দ করাও আমাদের পক্ষে সব সময় সহজ হয় না। নানা কারণে এরূপ মনের অবস্থা হয়। কখনও মনে হয়, আমাদের পরিবারে বা আমাদের মণ্ডলীটির মধ্যে আমার চেয়ে আমার অমুক প্রিয়জনের আদর বেশী হল কেন ? পিতামাতার প্রথম সন্তানটি বহুদিন পিতামাতার ভালবাসা একা একা ভোগ করে। তার পরে যখন গৃহে আর একটি শিশুর আবির্ভাব হয় এবং নূতন ব'লে তার বেশী আদর হয়, তা দেখে অনেক সময়ে সেই প্রথম সন্তানের মুখ ম্লান হয়। ভালবাসার স্থলে এইরূপ অভিমানজনিত ক্ষুদ্রতার প্রকাশ বয়স্ক জীবনেও দেখতে পাওয়া যায়। নিরন্তর আত্মপরীক্ষা দ্বারা ধর্ম্মসাধককে এই অভিমান থেকে সাবধান হতে হয়। যীশু-বর্ণিত অপব্যয়ী পুত্রের (prodigal son) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এইরূপ অভিমান পোষণ করেছিল।

যাঁরা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কাজ করেন অথচ অন্তরে যশঃস্পৃহা পোষণ করেন, তাঁদের বিপদ আরও অধিক। উকীল, ডাক্তার ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ব্যবসায়ক্ষেত্রে যশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে উত্থিত মানসিক অশান্তি অনেক সময়ে তাঁদের মনের মহত্ত্বের ও তাঁদের পরস্পরের উদার বন্ধুতার হানি করে। পরিচারকগণকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হতে হয়। কি বড় কি ছোট, কি প্রাচীন কি সমসাময়িক, সকল মানুষেরই সদ্‌গুণের কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নত করা, সকলেরই সদ্‌গুণের স্মরণে আনন্দিত হওয়া, —ইহা ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আনন্দের অভ্যাস করা ধর্ম্মজীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় সাধন। কিন্তু অনেক সময়ে গূঢ় যশঃস্পৃহাজনিত ক্ষুদ্রতা এ সাধনে ব্যাঘাত ঘটায়।

ধর্ম্মরাজ্যে কখনও কখনও প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ মানুষেরা অন্ধ ভক্তের

ও স্তাবকের দলে বেষ্টিত হয়ে পড়েন। তাঁদের পক্ষে অপরের সুখ-সৌভাগ্য অথবা অপরের গুণ-যশ আনন্দের সঙ্গে নিত্য স্মরণ ও চিন্তনের সাধনটি করা বড়ই কঠিন হয়। এর সমান দুর্ভাগ্য ধর্ম্মজীবনে অতি অল্পই আছে। সরল ও সরস ধর্ম্মজীবন রক্ষার জন্য শুধু ঈশ্বরে ভক্তি যথেষ্ট নয়; যুগে যুগে উদিত সাধু ভক্তদের ভক্তি করা যথেষ্ট নয়; লোকোত্তর-প্রতিভাশালী মহাপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা দানও যথেষ্ট নয়। কিন্তু যাঁরা আমাদের সমসাময়িক, যাঁদের দ্বারা আমরা পৃথিবীতে বেষ্টিত, তাঁদের সকলের প্রতিভার ও সদ্‌গুণের জন্য আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ও প্রশংসা-সম্বলিত সতেজ শ্রদ্ধা নিত্য জাগরিত থাকা প্রয়োজন।

কবি বলেছেন, "স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ।" প্রেমজনিত কোমলতা বিনাও দুঃখীর দুঃখে সহায়তা করা সম্ভব; কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রেমজনিত কোমলতা বিনা সুখী সম্পদবান ও গুণবানের আনন্দে আনন্দ করা কঠিন। উচ্চ ধর্ম্মজীবনের ক্ষেত্রে এই সম-আনন্দের পরীক্ষা অতি কঠিন পরীক্ষা।

কারুণ্য তারুণ্য ও লাবণ্য

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের যে কথোপকথন বর্ণিত আছে, তার শেষ ভাগে একটি সুন্দর কথা আছে। ভক্ত যে-যে সাধনার দ্বারা আপনাব জীবনকে অনন্ত প্রেমময়ের নিত্য সহবাসের জন্য প্রস্তুত করেন, তার চরম সাধনাগুলি কিরূপ,—রূপকচ্ছলে তার এরূপ প্রসঙ্গ করা হয়েছে যে, তিনটি ধারায় রাধার (অর্থাৎ ভক্তের) স্নান হয়; তাহা কারুণ্যামৃত ধারা, তারুণ্যামৃত ধারা এবং লাবণ্যামৃত ধারা।

এতক্ষণ দরদী হবার বিষয়ে যে প্রসঙ্গ করা গেল, তা-ই ঐ রূপকের

ভাষায় বলতে গেলে কারুণ্যামৃতধারায় স্নান। 'স্নান' কথাটি এই প্রসঙ্গে বড় সুন্দর লাগে। সমগ্র আত্মাকে এই দরদী ভাবের দ্বারা, এই কারুণ্যের সাধনার দ্বারা আর্দ্র করতে হয়, স্নাত করতে হয়, কোমল ও সরস করতে হয়। তা হলে ভক্ত হবার পথে এক পা অগ্রসর হওয়া হয়।

তারপর সাধককে নিত্য তরুণ হতে হয়। সেই অনন্তস্বরূপ নিত্য নব নব ভাবে বিশ্বজগতে ও মানব-জগতে ও প্রতি মানবের জীবনে নিত্য লীলা করছেন। তাঁর এই নিত্য-নূতন নিত্য-সরস লীলাধারার বিষয়ে উদাসীন থাকলে, এর প্রতি হিল্লোলের ও প্রতি তরঙ্গের স্পর্শলাভ মাত্র তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর (response) দিতে না পারলে বুঝতে হয় যে সে-মানুষের অন্তর জরাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের ধর্ম্মের একটি বিশেষ বার্ত্তা এই যে,—জগতে ও মানবজীবনে যত নব নব জ্ঞান, যত নব নব আদর্শ, যত নব নব প্রয়াস উদিত হচ্ছে, সকলেরই মধ্যে সেই পরম একের বিচিত্র লীলা-তরঙ্গ। এই লীলাধারার সঙ্গে নিত্য যোগে যুক্ত থাকাই মানবাত্মার নিত্য তারুণ্য। ভক্ত হবার অধিকার লাভ করতে হলে এই তারুণ্যামৃত ধারায় নিত্য স্নান করতে হবে।

শেষ স্নান লাবণ্যামৃতধারায়। প্রেমই আত্মার লাবণ্য, আত্মার সৌন্দর্য্য। সেই পরম প্রেমময়ের প্রেমানন্দে যে আত্মা নিত্য স্নাত, নিত্য মগ্ন, সেই আত্মাই সুন্দর। তার বাক্য সুন্দর, চিন্তা সুন্দর, ভাব সুন্দর; তার কর্ম্ম সুন্দর, দৃষ্টি সুন্দর, ব্যবহার সুন্দর, আকার-ইঙ্গিত সুন্দর। ধর্ম্মজগৎ কেবল জ্ঞান-জ্যোতি চায় না; কেবল দুঃখমোচন চায় না; কেবল কল্যাণকর্ম্ম চায় না। মানব-অন্তর ধার্ম্মিকের কাছে এ সকলের অতিরিক্ত আরও কিছু আশা করে। সেই অতিরিক্ত বস্তুটি কি? তা প্রেমানন্দজনিত লাবণ্য।

সম্বন্ধ সাধন

একজন ধর্ম্মপ্রাণ ইংরেজ জমি কিনে বাড়ী তৈরী করলেন। সে দেশে কন্‌ট্রাক্টরের সাহায্যে বাড়ী নির্ম্মাণ এবং বাড়ীর আস্‌বাব যোগান উভয় কার্য্যই হয়। ভদ্রলোকটি নিজের শিশু পুত্রকে বাড়ীটি দেখাতে নিয়ে গেলেন; কিন্তু তাকে বললেন না যে এটা তাঁদেরই বাড়ী। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে বাড়ীখানি সম্বন্ধে শিশুর সরল মতামত জানবেন। শিশু বাড়ী দেখে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, "এ বাড়ীতে কি কোন রাজা বাস করেন?" গৃহস্বামী ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ; তিনি পুত্রের এই কথাতে বড়ই ক্লেশ পেলেন। বুঝতে পারলেন, বাড়ীখানির ব্যবস্থা তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী হয় নি; আস্‌বাবের কন্‌ট্রাক্টরও তাঁদের আদর্শমত করে বাড়ীখানি সাজায়নি। এবার তিনি নিজে সে কাজ করলেন। কম্পাউণ্ডটিকে ক্রমশঃ তরুলতাদ্বারা তপোবনের মত করে সাজিয়ে তুললেন। বাড়ীর একটি ঘরকে উপাসনার ঘর বলে নির্দ্দিষ্ট করলেন। যাতে মনে উপাসনার ভাব জাগে, এমন অনেক বই ও নানাবিধ সামগ্রী দিয়ে সে ঘরখানি সাজালেন। আগেকার সব ছবি দেয়াল থেকে সরিয়ে ফেলে সাধুভক্তদের ছবি, মহামনা মানুষদের ছবি, এবং ধর্ম্মভাবোদ্দীপক নানা ঘটনার ছবি সব ঘরের দেয়ালে এবং সিঁড়িতে লাগানো হ'ল। এ সকলের পর আবার সেই শিশুকে তিনি সেই বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। এবার সমস্ত বাড়ীখানিতে ছেলেটি সম্ভ্রমপূর্ণ ভাবে নম্র চরণে বিচরণ করল। শেষে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, এ বাড়ীতে কি যীশু বাস করেন?"

যে-রকম বাড়ীতে সহজে এবং স্বভাবতঃ উপাসনার ভাব মনে আসে, এবং যে-রকম বাড়ীতে বাস করলে সহজে মনে হয় আমরা সাধুভক্তদের সহবাসে আছি—যীশুর সহবাসে আছি, চৈতন্যদেবের সহবাসে আছি,—আশ্রমের বাড়ী সেই রকম হলে ভাল হয়।

অনুকূল ক্ষেত্রে আশ্রম স্থাপন করা কেন প্রয়োজন? কেবল কি এই জন্য যে, আশ্রমবাসীরা তাতে নিরুপদ্রবে বসবাস ও সাধন-ভজন করতে পারবেন? তা নয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটি ধর্ম্মসমাজ, এবং প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজেরই সাধনভজনের অনুকূল নানা স্থান এবং নানা তীর্থক্ষেত্র থাকা চাই।

ব্রাহ্মদেরও কি তীর্থ আছে? আছে বই কি? যেখানে কোন ব্রাহ্ম সাধক অথবা ব্রাহ্ম ভক্ত বিশেষ ভগবৎ-স্পর্শ লাভ করেছেন, সে-স্থানই ব্রাহ্মদের তীর্থ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেখানে যেখানে গিয়ে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মস্পর্শ লাভ করেছিলেন, সে সমুদয় স্থান আমাদের তীর্থ। সে সমুদয় স্থানে গিয়ে বসতে, বসে মহর্ষির স্মৃতি-জড়িত ব্রহ্ম-অনুভূতি লাভ করতে আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়। মহর্ষিদেবের দেহত্যাগের পর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার বোলপুর শান্তিনিকেতনে গিয়ে একটি উপাসনার মধ্যে বলেছিলেন, "যে-বাক্সে কিছু কাল কস্তুরী রাখা হয়, তা হতে কস্তুরী অন্তর্হিত হলেও বহু কাল পর্য্যন্ত কস্তুরীর গন্ধ থাকে; সেইরূপ, এই শান্তিনিকেতনে এখনও যেন মহর্ষির সাধনার সৌরভ পাওয়া যাচ্ছে।" হিমালয়ের বহু স্থান ও শান্তিনিকেতন আমাদের পক্ষে মহর্ষি-তীর্থ। তেমনি আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বিশেষ বিশেষ যোগযুক্ত উপাসনাদির সংস্পৃষ্ট কয়েকটি স্থান, যথা গুহপানী, ডুমরাওনের বন, দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গা প্রভৃতি এক একটি তীর্থ। এই সব স্থানে গিয়ে তাঁর স্মৃতি-জড়িত ব্রহ্মানুভূতি লাভ করতে আমাদের মন ব্যাকুল হয়।

তাঁর কমলকুটীরের দেবালয়ও ব্রাহ্মদের জন্য একটি স্মৃতি-পূত স্থান। এ সমুদয় ব্রাহ্মসাধারণের তীর্থস্থান। এ ছাড়া আবার বিশেষ বিশেষ মানুষের জন্য তাঁর বিশেষ তীর্থস্থান আছে। আমার জন্য বাঁকিপুরের অঘোর-প্রকাশ-আশ্রম একটি তীর্থস্থান। প্রত্যেকের নিজের জীবনের নানা ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত নিজস্ব বিশেষ জীবন-তীর্থ থাকে। যেখানে বসে তিনি জীবনের কোনও বিশেষ দিনে,—হয়তো সংগ্রামেরই দিনে বিশেষ ভাবে ভগবৎ-স্পর্শ লাভ করেছেন, অথবা যেরূপ স্থানে বসলে তাঁর মন সহজে ব্রহ্মস্পর্শে বেষ্টিত হয়ে ওঠে, সে-সব স্থান তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের তীর্থস্থান।

সাধনাশ্রমের বাড়ীটি যদি এরূপ হ'ত যে সেখানে বসলে মানুষের মনের পক্ষে ব্রহ্মস্পর্শ অনুভব সহজ হ'ত, এবং মানুষের মন অনুভব করত যে "আমি সকল যুগের সাধুভক্তদের কাছে কাছে আছি, তাঁদের হাওয়ার মধ্যে আছি,"—তা হলে কত ভাল হ'ত!

দ্বিতীয় অভাবটি আমার নিজের জীবন-সংসৃষ্ট। যাঁরা দেশী মিছরির ঢেলা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, চিনি জাল দিতে দিতে তাতে এক গাছি সূতা ফেলে দেওয়া হয়। দানা বাঁধবার সময় সেই সূতার চার দিকে দানাগুলি জমতে থাকে। এই কাজের জন্য শুধু চিনি থাকলেই চলে না, সূতাও চাই। বিজ্ঞান বলেন, crystallization start করে দেবার জন্য সূতার সাহায্য বা ঐরূপ অন্য কোন সাহায্য চাই। তেমনি ধর্ম্মরাজ্যে ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী জমাতে হলে মাঝখানে সূতার মতন একজন মানুষ থাকা চাই। আচাৰ্য্য কেশবচন্দ্রের মণ্ডলীতে কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় এ কাজটি করেছিলেন। এ কাজের জন্য প্রতিভার দরকার নাই; কিন্তু সকলকে টেনে রাখবার শক্তিটি নিশ্চয়ই থাকা চাই।

সম্বন্ধ সাধন ও একাকী সাধন

ধর্ম্মসাধন নানাবিধ। তার মধ্যে এক শ্রেণীর সাধনকে বলা যায় 'সম্বন্ধ-সাধন'। সাধনাশ্রমে আমরা সম্বন্ধ সাধনকে একটু প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

ঈশ্বর আমাদের পিতা, মাতা, অভিভাবক, প্রভু, চিরজীবন-সখা। ঈশ্বরকে এই সকল সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করার উপরে আমরা জোর দিই। এ সকল সম্বন্ধের প্রত্যেকটির মধ্যেই যেন একটি বিশাল রাজ্য আছে, সাধককে এই বিশাল রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়। সে রাজ্যের নব নব অনুভূতি ক্রমে ক্রমে অন্তরে সঞ্চয় করতে হয়, সে রাজ্যের নব নব স্বাদ আত্মার রসনায় গ্রহণ করতে শিক্ষা করে ক্রমে ক্রমে তার দ্বারা জীবনকে সরস ও সবল করে তুলতে হয়। অথবা, এ সকল সম্বন্ধের প্রত্যেকটি যেন একটি বিপুল-পরিসর প্রাসাদ; সাধককে ক্রমে ক্রমে সেই প্রাসাদের গহন হতে গহনতর অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হয়।

আবার, সাধনের এই পথে চলতে হলে মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধগুলিকে ও ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধের সাথে সাথে সমান তালে, ক্রমশঃ অধিক অধিক গূঢ় ও গাঢ় অনুভূতির আকারে বিকশিত করে নিতে হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধ ও সাংসারিক সম্বন্ধ, উভয়ের ক্ষেত্রেই এরূপ করবার প্রয়োজন হয়।

'ঈশ্বর একাকী, ঈশ্বরের সম্মুখে আমিও একাকী' (alone to the Alone),—এ ভাবটি ধর্ম্মরাজ্যের চিরন্তন ভাব নয়। কোন ভ্রমণকারীকে কখনও কখনও অনন্ত প্রান্তরে একা বিচরণ করতে হতে পারে বটে; কিন্তু তা মানুষের দেহজীবনের পক্ষে স্বাভাবিক বা চিরন্তন অবস্থা নয়।

তেমনি ধর্ম্মসাধন-রাজ্যে 'ঈশ্বরের নিকটে আমি একাকী' এ অনুভূতি সাধকের মনোজীবনের পক্ষে চিরন্তন বা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। স্বয়ং ঈশ্বর চান না যে, কোন সাধক সর্ব্বদাই কেবল একাকী হয়ে তাঁর কাছে আসেন। তিনি নিজেই মানুষে-মানুষে নানা সম্বন্ধ বেঁধে দেন; তিনি নিজেই সম্বন্ধ-রাজ্যে বিচরণ করতে ভালবাসেন।

দ্বিতীয় এক প্রস্থ সম্বন্ধ

সংসার-রাজ্যে যেমন আমরা পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যাতে বেষ্টিত হয়ে বাস করি, তা-ই যেমন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও তৃপ্তিপ্রদ, ধর্ম্মরাজ্যেও তেমনি আমরা পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যাতে বেষ্টিত হয়ে বাস করতে পারি; তা-ই আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক ও তৃপ্তিপ্রদ। দেখা যায়, ধর্ম্মসাধকের জীবনে যেন ক্রমে ক্রমে নূতন আর এক প্রস্থ সম্বন্ধ বিকশিত হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মসমাজে আমরা সচরাচর ধর্ম্মভ্রাতা ধর্ম্মভগিনীদের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা কৃতজ্ঞতা-সিক্ত ভাষায় বলে থাকি। কিন্তু সম্বন্ধ-রাজ্যের ধর্ম্মসাধকেরা জানেন, এ রাজ্যে নূতন পিতা মাতার সঙ্গে সম্বন্ধও কিরূপ মধুময়! সে-সম্বন্ধের দ্বারা প্রাণ কত স্নিগ্ধ হয়, কত অনুপ্রাণিত হয়, কত বল লাভ করে! তেমনি আবার, ধর্ম্মরাজ্যের পুত্রকন্যাগণের সঙ্গে সম্বন্ধের ফলে একাধারে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও স্নেহ-বৃত্তি তৃপ্তি লাভ করে, তাঁদের সঙ্গ ও তাঁদের অনুপ্রাণন ধর্ম্মজীবনের অমৃতস্বরূপ। মানুষ পৃথিবীতে তার শেষ জীবনে প্রায়ই ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মমাতাদিগের সঙ্গ লাভ করতে পারে না। অনেকের বেলায় ধর্ম্মভ্রাতা ও ধর্ম্মভগিনীদিগের সঙ্গও আর জীবন-শেষে থাকে না। জীবনের সেই শেষ অবস্থায় যদি কেহ এমন সকল ধর্ম্মপুত্র ও ধর্ম্মকন্যার দ্বারা বেষ্টিত থাকতে পারেন, যাঁদের প্রতি তাঁর অন্তরে যুগপৎ

স্নেহ-সুধা ও শ্রদ্ধা-সুধা উৎসব-ৎ নিত্য উৎসারিত, তবে তিনি কত সৌভাগ্যবান! ইচ্ছা হয়, আমাদের শেষ জীবন যেন এইরূপ ধর্ম্মপুত্র ও কন্যাগণের স্নিগ্ধ বেষ্টনের মধ্যে কেটে যায়!

দ্বিতীয় এক প্রস্থ ইন্দ্রিয়

সাধকের জীবনে শুধু এক প্রস্থ নূতন সম্বন্ধই লাভ হয় না, নূতন এক প্রস্থ ইন্দ্রিয়ও খুলে যায়। ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দেওঘর থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। তাতে (১) এই কথা বলছেন যে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তখন দেওঘরে রাজনারায়ণ বাবুর কাছে রয়েছেন; এবং (২) শাস্ত্রী মহাশয়ের উপস্থিতিতে রাজনারায়ণ বাবু একদিন নিজের পারিবারিক উপাসনা কালে কি কি বলেছিলেন, তার বর্ণনা করছেন। রাজনারায়ণ বাবু উপাসনাতে বলেছিলেন,—ধর্ম্মসাধকের জীবনে দ্বিতীয় এক প্রস্থ ইন্দ্রিয় খুলে যায়। সেই নব ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শন করা যায়; তাঁর বাণী শ্রবণ করা যায়; অন্ধকারে পথচারী যেমন ফুলের সৌরভ আঘ্রাণ করে, তেমনি ঈশ্বরের সৌরভে আকৃষ্ট হওয়া যায়; তাঁর প্রেমরস চাখা যায়, এবং তাঁর ঘন স্পর্শ আত্মাতে অনুভব করা যায়। রাজনারায়ণ বাবু সে পত্রে আরও লিখছেন,—অন্ধকারে ফুলের গন্ধে পথচারীর আকৃষ্ট হবার দৃষ্টান্তটি শ্রবণ করে শাস্ত্রী মহাশয় একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

এ পত্রখানি অতি চমৎকার। সে সময়ে মহর্ষিদেব অসুস্থ ছিলেন; বেশী লিখতে পারতেন না। তিনি ঐ পত্রের উপরেই লাল কালীতে এই উত্তর লিখেছিলেন,—"তোমর কণ্ঠনিঃসৃত এমন সুমধুর ধ্বনি অনেক *দিন শুনি নাই। অদ্য আমার শুভ সুপ্রভাত! 'প্রাণ হইল শীতল*

বিমল সুধায়'। আমার প্রেমালিঙ্গন গ্রহণ কর। তোমাকে ভূয়োভূয়ো নমস্কার।"

এই পবিত্র পত্রখানি হাতে করে কত দিন আমার মন অনুপ্রাণনে পূর্ণ হয়েছে! যেন অতীন্দ্রিয় লোকে দ্বিতীয় এক প্রস্থ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিচরণ করতে অভ্যস্ত তিনটি মহাপ্রাণ আত্মা,—দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ ও শিবনাথ—সেই লোকের অমৃত পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করছেন! পত্রখানি যেন তারই নিদর্শন।

সাধনাশ্রমে আমাদেরও দেহের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত দ্বিতীয় এক প্রস্থ ইন্দ্রিয়ের বিকাশ করা চাই। এ বিকাশ না হলে ব্রহ্মলোকের অমৃতই বা আমরা কেমন করে আস্বাদন করব, সাধুভক্তদের সঙ্গই বা আমরা কেমন করে লাভ করব? সেই দ্বিতীয় এক প্রস্থ ইন্দ্রিয় বিকশিত না হলে বিশ্বজগৎ আমাদের অনুপ্রাণিত করতে পারবে না। ঈশ্বরের প্রতিদিনের অমূল্য দান—আলো, বাতাস, জগৎশোভা, প্রিয়জনের মুখশ্রী,—কিছুই আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করতে পারবে না। আমাদের ধর্ম্মজীবন অতি বিশীর্ণ ও দৈন্যগ্রস্ত হয়ে থাকবে। অদেহী প্রিয় আত্মাগণের সঙ্গ-সাধনও আমাদের ভাগ্যে হবে না।

সম্বন্ধরাজ্যে রুচি-বৈচিত্র্য

মানুষে-মানুষে প্রকৃতিগত কত বৈচিত্র্য থাকে! সম্বন্ধ-সাধককে সে বৈচিত্র্যের সমাদর করতে শিখতে হয়। যে উদারতার দ্বারা ধর্ম্মমতের পার্থক্য, ধর্ম্মসাধনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য, অথবা রুচি ও প্রকৃতির পার্থক্য সহ্য করে লওয়া যায়, সম্বন্ধ সাধনের ক্ষেত্রে সে উদারতা যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে মানবপ্রকৃতির বৈচিত্র্যকে শুধু সহ্য করা নয়, শ্রদ্ধা ও সমাদর করতে শিক্ষা করা প্রয়োজন হয়। যে-পরমেশ্বর সংসারে বৈচিত্র্য

সৃষ্টি ক'রে মানুষের প্রেমসম্বন্ধ সকলকে মিষ্ট করেন, তিনিই আবার সাধন-রাজ্যে মানব-প্রকৃতিতে নানা বৈচিত্র্য দান ক'রে ধর্ম্মসম্বন্ধে সকলকে মিষ্ট করেন। বৈচিত্র্যেই ব্রহ্মের আনন্দ।

সংসারে কোন বাড়ীর ভোজনশালায় গেলে প্রায়ই দেখা যায়, যিনি তিক্ত ভালবাসেন ও যিনি মিষ্ট ভালবাসেন এমন দুই জন মানুষ পাশাপাশি আহার করতে বসেছেন। শুধু তাই নয়; এক জন অপর জনকে তাঁর রুচিকর ভোজ্য বস্তু, নিজের রুচিকর না হলেও, পরিবেশন করেন; এমন কি রন্ধন করেও দেন। বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী সধবা কনিষ্ঠা ভগিনীর জন্য আমিষ রান্না করেও দেন। সাধনক্ষেত্রে যদি কোন ভাই অপর কোন ভাইর বিশেষ সাধনটি নিজে আস্বাদন করতে না পারেন, তথাপি তিনি সে ভাইকে তাঁর সে-সাধনে আনন্দে সাহায্য করেন। প্রকৃতিগত ও রুচিগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সাধকদের পরস্পরের মধ্যে মধুময় প্রেমসম্বন্ধের এইরূপ দৃশ্য ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কত মণ্ডলীতে দেখা গিয়েছে! সে সকল কথা ভাবলেও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। সাধনাশ্রমে আমাদিগকে পরস্পরের রুচিবৈচিত্র্যকে, প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যকে, সাধন-বৈচিত্র্যকে সমাদর করতে শিখতে হবে।

কর্ম্মক্ষেত্রে সম্বন্ধ-সাধনের শুভ ফল

সম্বন্ধ-সাধনের শুভ ফল কর্ম্মক্ষেত্রে নানারূপে দেখতে পাওয়া যায়। কর্ম্মক্ষেত্রে এখন যিনি কাছে নাই, কিংবা পৃথিবীতে এখন যিনি দেহে নাই, এমন বন্ধুর এমন গুরুজনের প্রভাবও মানুষের আত্মার উপরে আশ্চর্য্য রূপে কাজ করে। হোরেশিও নেল্‌সনের বাল্যকালে এক বার বড়দিনের ছুটির পর স্কুলে ফিরে যাবার দিনে এমন তুষারপাত হল যে, হোরেশিও এবং তার বড় ভাই অর্দ্ধেক পথ থেকে বাড়ী ফিরে আসতে

বাধ্য হল। বাবা তাদের বললেন, "আর একবার চেষ্টা করে দেখ। নিতান্ত অসম্ভব হলে ফিরে এসো; but I leave it to your honour"। এই কথা শুনে দ্বিতীয় বার ছেলেরা রওনা হল। ক্রমে পথ এত সঙ্কটময় হয়ে উঠল যে বড় ভাই বলল, "আর যাওয়া অসম্ভব; চল ফিরে যাই।" হোরেশিও বলল, "আরও চেষ্টা করা যাক। বাবা যখন কাছে নাই, এবং তিনি যখন আমাদেরই honourএর উপর ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমরা স্কুলে পৌছুতে প্রাণপণে চেষ্টা করব।" অবশেষে সে-চেষ্টার ফলে তারা স্কুলে পৌছে গেল।

সাধনাশ্রমের কর্ম্মক্ষেত্রে এক এক সময়ে আমাদিগকে কত সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সে সময়ে যেন আমরা আমাদের বীর-হৃদয় অশরীরী অগ্রণীদের বাণী, আচার্য্য শিবনাথের বাণী অন্তরে শুনতে পাই! যেন শুনতে পাই, আমাদেব কঠিন কর্ত্তব্য পূর্ণ ভাবে ও আদর্শসম্মত ভাবে সমাপন করা বিষয়ে তাঁরা আমাদের বলছেন, "We leave it to your honour!"

কর্ম্মক্ষেত্রে সম্বন্ধ-সাধনের আর একটি শুভ ফল এই যে, যে-মানুষ প্রাণ দিয়ে খাটে, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাবার জন্য একটুও চেষ্টা করে না, তারও দেহে বা মনে কখনও ক্লান্ত ভাব বা শ্রমের অনুভূতি তিলমাত্র জাগে না। মন্ত্রপূত ফুৎকারে যেন তার সব শ্রান্তি উড়ে যায়; শ্রান্ত মস্তিষ্ক ক্লান্ত বাহু যেন নিমেষে সব শ্রান্তি ভুলে যায়। সেই মায়া-মন্ত্রটি কি? সেই মন্ত্র,—গুরুজনদের স্নেহ-বাক্য, তাঁদের স্নেহ-মিশ্রিত আদর। আমার জীবনে এ বস্তু আমি এত লাভ করেছি যে, তার সাক্ষ্য না দিয়ে পৃথিবী থেকে চলে গেলে আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী হব। আমার জীবনে আমাকে অনেক দুরন্ত শ্রম করতে হয়েছে। কিন্তু আমার সেই শ্রমের উপরে আমি পিতৃতুল্য, মাতৃতুল্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,

জ্যেষ্ঠা ভগিনীতুল্য মানুষদের স্নেহদৃষ্টি লাভ করে ধন্য হয়েছি। এরূপ সময়ে নিমেষের একটি নির্ব্বাক স্নেহ-দৃষ্টি লাভ করে আমার মনে হয়েছে, "আমি ধন্য হলাম! এই অমূল্য বস্তু পাবার যোগ্য কাজ কি-ই বা আমি করেছি? যদি আমার দশখানি হাত থাকত, তবে দশগুণ সেবা দান করে আমি আরও কৃতার্থ হতাম!" সম্বন্ধ-সাধনের এই আর একটি অমৃতময় ফল কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা সর্ব্বদা আস্বাদন করতে পাই।

সম্বন্ধ-সাধন ও বৈরাগ্য

সম্বন্ধ-সাধনের উচ্চতম ভূমিতে বিহার করতে হলে মনকে দৈহিক আরাম ও দৈহিক সুখের উর্দ্ধে উত্তোলন করা প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের সাক্ষ্য এই যে, তপস্যার ভাব অন্তরে না থাকলে জ্ঞানের সাধনা হয় না। গীতা ও তৎপরবর্ত্তী সমুদয় ভক্তিশাস্ত্রের সাক্ষ্য এই যে, বৈরাগ্য ও তপস্যা বিনা প্রেমভক্তির সাধনা হয় না। সাধনাশ্রমে আচার্য্য শিবনাথ শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যে, বৈরাগ্য বিনা সেবক হবার অধিকার লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মসমাজে প্রেম-মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সাধক প্রকাশচন্দ্র ব্রহ্মপ্রেম দাম্পত্যপ্রেম ও বন্ধুপ্রীতি—তিনেরই সাধনা করেছিলেন তপস্যার পথ দিয়ে। বিধবা নারী যেমন দেহরাজ্যের কোন সুখকে অস্বীকার করেন না, পৃথিবী যে আনন্দময় তা তিনি অনুভব করেন, কিন্তু তথাপি তাঁর চিত্ত স্থাপিত থাকে সেই উন্নত অতীন্দ্রিয় ক্ষেত্রে, যেথানে তাঁর পতির আত্মা বিরাজিত, সেই অতীন্দ্রিয় ভূমিতে বিহার করবার অভ্যাস যেমন তাঁর প্রতিদিনের সাধনা,—তেমনি ব্রহ্মসাধককেও যেন এক প্রকার বৈধব্যের সাধন সযত্নে শিক্ষা করতে হয়। তাঁর পক্ষে জড়জগতের সৌন্দর্য্য, জড়জগতের স্বাদ গন্ধ তৃপ্তি সবই সত্য; সবই তাঁর হৃদয়কে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ করে,

তা-ও সত্য। কিন্তু তথাপি তিনি অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের, অতীন্দ্রিয় ভক্তগণের সঙ্গ ছাড়া থাকতে ভালবাসেন না; তাঁদের সঙ্গ ছাড়া জগৎ দেখতে ভালবাসেন না; তাঁর চিত্ত সেই অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে বিহার করেই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। ভক্ত প্রকাশচন্দ্র ও সাধ্বী অঘোরকামিনী উভয়ে দেহে থাকতেই যখন একের দেহ থাকবে না, তখন অপর জন কেমন ক'রে তাঁর আত্মার সাহচর্য্যের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে সংসারে বিচরণ করবেন, সেই সাধনা করেছিলেন। তারই ফলে তাঁদের প্রেমসম্বন্ধ এমন পবিত্র ও এমন মধুময় হয়েছিল। এই ইচ্ছাকৃত বৈরাগ্য বিনা, এই ইচ্ছাকৃত বৈধব্য বিনা, সম্বন্ধ-সাধনের উচ্চ স্তরে আরোহণ করা সম্ভব নয়।

ভক্তদের সাধন-ঘরের দরজায় কাণ পাতা

প্রেমপরিবারের সাধকেরা সব দেশের সব যুগের ভক্তদের ভক্তি-অমৃত আস্বাদন করতে এবং শিক্ষা করতে ব্যাকুল হন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা হয় যে, "সব ভক্তদের ভাব, সব ভক্তদের ভাষা, সব ভক্তদের নিবেদন আমরা আমাদের সাধন-গৃহের অন্তঃপুরে নিয়ে যাব; প্রাণেশ্বরের কাছে আমাদের নিবেদনকে আমরা সে সকলের দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলব।" সংসারে প্রেম-নিবেদনের ভাষা ভাব ও ইঙ্গিতগুলি এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ীতে সহজেই সংক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমার ছোটবেলায় আমি একদিন আমাদের পাড়ার আর এক বাড়ীতে গিয়ে শুনে এলাম, সে বাড়ীর মা তাঁর ছেলেকে 'আমার যাদুমণি' বলে আদর করচেন। সেদিন বাড়ী এসেই আমি মাকে বলেছিলাম, 'মা, তুমিও আমাকে 'আমার যাদুমণি' বলে আদর করো।" সংসারে যে-সকল বাড়ীতে ভালবাসার ধারাগুলি সতেজ আছে, শুকিয়ে যায় নি, সেখানে নিত্য নিত্য এমনি করে নব নব প্রেম-নিবেদন শিক্ষার ব্যাপারটি চলে।

ধর্ম্মের অন্তঃপুরেও এই কথা। ভক্তবাণীতে মগ্ন হতে আমাদের কত ভাল লাগে! আমরা কবীরের মীরাবাঈর দাদূর রজ্জবের চৈতন্যের চণ্ডীদাসের সাধন-ঘরের দরজায় কাণ পেতে শুনব, তাঁরা কেমন করে প্রাণেশ্বরকে প্রেম-নিবেদন করেন। আমাদের অন্তরে এই গূঢ় আশা থাকে যে, আমরাও এক দিন তাঁদের মতন করে প্রাণেশ্বরকে প্রেম-নিবেদন করতে শিক্ষা করব; শিক্ষা করে আমাদের প্রেমভক্তির দৈন্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে দূর করব; আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধকে ও মানুষদের সঙ্গে সম্বন্ধকে নব নব অমৃতময় স্বাদে স্বাদযুক্ত করে তুলব।

১২ই মাঘ, ১৩৪৫

"অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ"

ঈশ্বরের উপাসনার লক্ষ্য কি, সার্থকতা কি? এ প্রশ্নের নানা উত্তরের মধ্যে একটি উত্তর এই যে, উপাসনা সাধনের ফলে এক দিন আমরা নিত্য ব্রহ্মসঙ্গের অধিকার লাভ করে ধন্য হই। ঈশ্বরের উপাসনার দুই ভূমি—মননের ভূমি ও প্রেমের ভূমি। উভয় ভূমিতে উপাসকের মনে ঐ লক্ষ্যটি বর্ত্তমান থাকে।

ভগবদ্‌গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন, যোগযুক্ত মানুষ অতি সহজ ভাবে সর্ব্বদা আনন্দময় ব্রহ্মসংস্পর্শ আস্বাদন ক'রে "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ মত্যন্তসুখ মশ্নুতে।" অর্জ্জুন তাতে উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "আমার মন যে বড চঞ্চল, এমন মনকে আমি কেমন করে বাঁধি?" শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "অসংশয়ং মহাবাহো, মনো দুর্নিগ্রহং চলম্; অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" হে অর্জ্জুন, সত্য বটে মানুষের মন অতি চঞ্চল, তাকে বাঁধা অতি কঠিন। কিন্তু সেই মনকেও অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা বাঁধা যায়।

যে-ভূমিতে দণ্ডায়মান হয়ে এই প্রশ্ন করা ও তার উত্তর প্রদান করা হয়েছিল, তা মননের ভূমি। এখানে মনন সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দুটি সঙ্কেত বলে দিলেন,—অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

গীতাকার বলছেন, মনকে তুমি বাঁধতে চাও? তোমার মন যাতে পরব্রহ্মে নিত্যযুক্ত থাকবে, এমন অবস্থা লাভ করতে চাও? তবে প্রথমতঃ, ব্রহ্ম ব্যতীত আর যত কিছু মন চায়, তা হতে মনকে নিবৃত্ত

কর। এখানে বৈরাগ্য অর্থ কৃচ্ছ্রসাধন নয়; কিন্তু মনকে অন্য কিছুতে আসক্ত হতে না দেওয়া; শারীরিক কি সাংসারিক যে-সকল ক্ষুদ্র সুখের আসক্তি মনে লেগে রয়েছে, তা হতে মনকে অপসৃত করা। উদ্দেশ্য এই যে, মনের সম্মুখে যেন ব্রহ্ম বিনা অন্য কোন অভীপ্সিত বস্তু না থাকে; মন যেন একলা হয়।

মনের এই একাকিত্ব, এই একাগ্রতা, বিষয়ান্তর হতে মনের এই অপসরণ (isolative activity of the mind), মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ নিয়ম। মনোবিজ্ঞান বলেন, কোনও বিষয়ে মনকে একাগ্র করতে হলেই তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল বিষয় হতে মনকে অপসৃত করতে হয়, (all concentration involves isolation)। যে-মানুষ মনকে একলা ক'রে (isolate) অভীষ্ট বিষয়ে বসাতে শেখে নাই, মননের পথে চলে সে-মানুষ সে বিষয়ে কোনও তত্ত্বে উপনীত হতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এই একাকী-করণের নিয়মটি দু ভাবে প্রয়োগ করতে হয়। প্রথমতঃ, ধর্ম্মসাধকের ন্যায় বৈজ্ঞানিককেও নিজের মনটিকে একাগ্র করতে হয়, বিষয়ান্তর হতে অপসারিত করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে-বস্তুটি নিয়ে অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তাকেও অবান্তর বস্তু হতে সযত্নে স্বতন্ত্র করতে হয়। তিনি হয়তো একটি ধাতুর (element) অথবা একটি রোগবীজের (bacteria), অথবা শরীরের একটি বিশেষ গ্রন্থি (gland) বিষয়ে অনুসন্ধানে নিযুক্ত। তাঁকে বিপুল ধৈর্য্যের সঙ্গে এবং সহস্র সহস্র পর্য্যবেক্ষণ ও সহস্র সহস্র পরীক্ষার (observation and experiment) দ্বারা সে বস্তুটিকে তার আনুষঙ্গিক সমুদয় বস্তুর ক্রিয়া হতে পৃথক করতে হয়।

দ্বিতীয় নিয়ম, অভ্যাস। মনোবিজ্ঞান বলেন, অনুশীলনের দ্বারাই

শক্তির বৃদ্ধি হয় (exercise strengthens faculty) ; এবং অভ্যাসের দ্বারা সমুদয় কার্য্য সহজ হয়ে ওঠে (habit makes activity easy)। এই নিয়মের ক্রিয়া আমরা সাংসারিক ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই দর্শন করি। চতুষ্পদ প্রাণী জন্মেই দাঁড়াতে পারে, কারণ তার শরীরের ভারকেন্দ্র তার চারি পায়ের মধ্যগত স্থানে পড়ে। মানুষ দ্বিপদ, মানুষকে দাঁড়াতে শিখতে হয়। বিজ্ঞান বলেন, মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো একটি great balancing feat, অর্থাৎ ভারকেন্দ্র স্থির রাখবার একটি দুঃসাধ্য ব্যায়ামস্বরূপ। বয়স্ক মানুষ যখন সাইকেল চড়তে শেখে, তখন তাকে ভারকেন্দ্র স্থির রাখা বিষয়ে পদে পদে কত সতর্ক হতে হয়। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ দাঁড়ানো ও হাঁটা আমাদের পক্ষে এখন এমন সহজ হয়ে গেছে যে, আমাদের আর মনেই পড়ে না যে কোনও দিন ঐ কার্যাটি শিক্ষা করতে হয়েছিল।

এই অভ্যাসের নিয়ম ধর্ম্মসাধনেও প্রয়োগ করতে হয়। Brother Lawrenceএর একখানি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম "Practice of the Presence of God।" বইখানির নামকরণই যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ। ঐ নাম হতেই পাঠকের মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে ঈশ্বর-সহবাসও 'অভ্যাসের' বিষয়। এ বিষয়ে গীতাকার যেন আমাদের ভরসা দিয়ে বলছেন, "আজ তুমি শিশুর ন্যায় ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছ, তথাপি ভয় করো না ; অভ্যাস কর ; অভ্যাস করতে করতেই তোমার মন ব্রহ্মচরণে একেবারে বাঁধা হয়ে যাবে।"

এই দুটি চমৎকার সঙ্কেত, অর্থাৎ বৈরাগ্য ও অভ্যাস, উপাসনার দ্বিতীয় ভূমিতে অর্থাৎ প্রেমের ভূমিতে প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়।

উপাসনা-সাধনের লক্ষ্য কি, তা আবার স্মরণ করি। গীতাকারের অপেক্ষা আর বেশী ভাল করে কি কেউ তা বলতে পারবেন ?

"আনন্দময় ব্রহ্মসংস্পর্শ নিত্য হয়ে যাওয়া ও সহজ হয়ে যাওয়া,"—এর অধিক আমরা আর কি বলতে পারি? বরং, অনেক সময়ে আমাদের মনে এই আশঙ্কা হয় যে, সত্য সত্যই কি মানব-ভাগ্যে এ সৌভাগ্য আছে? সংসারে বাস করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকলে বেষ্টিত থেকে মানুষ কি সেই অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে চোখে-দেখা, হাতে-ছোঁয়া মানুষ প্রিয়জনদের মতই প্রত্যক্ষ করতে পারবে, এবং কখনও তাঁর প্রেমানন্দময় সঙ্গ হতে চ্যুত না হয়ে সমুদয় সংসারকর্ম্ম করতে পারবে?—আমাদের দুর্ব্বল মন যেন এতটা সাহস করতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমাদের ধর্ম্মাচার্য্যগণ বলে দিচ্ছেন, "বৈরাগ্য এবং অভ্যাসের পথ দিয়ে চলে যাও, তোমাদের এ সৌভাগ্য লাভ হবে।"

প্রেমমূলক উপাসনার সাধনে, বৈরাগ্য ও অভ্যাস, এই নিয়ম দুটির ক্রিয়া অতি চমৎকার। প্রথমতঃ দেখা যায়, মানব-মনে প্রেম যেরূপ isolative activity সৃষ্টি করতে সমর্থ, এরূপ আর অতি অল্প বস্তুই করতে পারে। প্রেমিকের চিত্ত এক জনেতে এমন লগ্ন, এমন মগ্ন (absorbed) যে, তার জন্য আর সমুদয় সংসার যেন থেকেও নাই। প্রেমিকের মন কত সহজে নিজ প্রেমাস্পদ ভিন্ন অন্য সকল বস্তু হতে সরে আসে, কত সহজে একলা হয়! এই একলা হওয়াই প্রেমের বৈরাগ্য। ভক্তি-সাহিত্যে "প্রেম-বৈরাগিণীর" রূপকের সাহায্যে প্রেমের এই একাকিত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রেমিকের চিত্ত যেন বিরহিণীর ন্যায়। তিনি সংসারের কাজ করছেন; কিন্তু তাঁর মনটি প্রেমাস্পদের স্মৃতি নিয়ে নিজের চারিদিকে যেন একটি বেড়া দিয়ে নিয়েছে। তার মধ্যে তিনি একাকিনী।

দ্বিতীয়তঃ, প্রেমিকের অন্তরাত্মা নিরন্তর কি কাজ করে? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বলতে হয়, সে মনের গোপনে 'সঙ্গ অভ্যাস'

করে। প্রিয়জন সশরীরে কাছে থাকলে তো কথাই নাই; তিনি সশরীরে কাছে না থাকলেও প্রেমিকের মন নিরন্তর তাঁরই কাছে পড়ে থাকে, মনের গোপনে তাঁরই সঙ্গ সাধন করে।

আমি আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট করে তুলবার জন্য প্রথমতঃ দুইটি সাংসারিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি। আমার কল্পিত উভয় দৃষ্টান্তই পতি-বিরহিণী নারীর দৃষ্টান্ত।

প্রথমতঃ, প্রাচীন একান্নবর্ত্তী প্রথায় পরিচালিত কোন বৃহৎ পরিবারের বালিকা-বধূর বিষয় কল্পনা করুন। যখন তার স্বামী বাড়ীতে থাকেন, তখন নানা অসুবিধার মধ্যেও তারা দুজনে তাদের মিলিত জীবন একটু আস্বাদন করতে পায়। কিন্তু স্বামী বিদেশে গেলেই বধূটির পক্ষে, স্বামীর সঙ্গে আস্বাদিত সেই মিলিত জীবনের স্মৃতিটুকু অথবা অনুভূতিটুকু উজ্জ্বল ভাবে রক্ষা করা কঠিন হয়। কেন কঠিন হয়? মেয়েটি সারাদিন একলা হতে পায় না বলে। বাড়ীতে নানা লোক; তন্মধ্যে অনেকেই সেই বধূর উপরে কর্ত্তা। বহুবিধ প্রয়োজনের ও নানা বিভিন্ন আদেশের তাড়নায় তাকে সারাদিন চলতে হয়। এ সকলের মধ্যে পড়ে সে বালিকা আর মনে মনে পতির সঙ্গে যাপিত জীবনের ধারাটি অনুভব করতে পারে না। তার পক্ষে পতির বিরহটা একান্তই বিচ্ছেদের অবস্থা।

আমার কল্পিত দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, আধুনিক এমন কোনও গৃহের গৃহিণী, যে গৃহে পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেমে মিলিত একটি মাত্র দম্পতি বাস করেন। এ ক্ষেত্রে স্বামী যখন বিদেশে যান, তখন গৃহিণী তাঁকে স্মরণ করে করে সমুদয় গৃহকর্ম্ম করেন। স্বামী নিকটে না থাকলেও, “আমি তাঁরই কাজ করছি” এ অনুভবের তৃপ্তি পত্নীর অন্তরকে পূর্ণ করে রাখে। স্বামী দূরে থাকলেও তাঁর মনের আদর্শ কিরূপ, তিনি তাঁর সংসারকে কেমন দেখতে ভালবাসেন, তার ছবিটি পত্নীর মনে উজ্জ্বল

হয়ে জেগে থাকে ; সেই ভাবে সংসার পরিচালিত করবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা তাঁর দৈনিক জীবনে বর্ত্তমান থাকে। এ ক্ষেত্রে বিরহ একান্ত বিচ্ছেদ নয় ; বিরহের মধ্যেও যেন নিরন্তর সঙ্গ-অনুভূতি বিদ্যমান থাকে।

'বিরহ' ও 'বিচ্ছেদের' এই পার্থক্য ভক্তেরাও বলে গিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন, "সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো, ন সঙ্গমস্তস্য। একঃ স এব সঙ্গে, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।" অর্থাৎ সঙ্গ ও বিরহ এই দুয়ের মধ্যে বিরহই এক অর্থে অধিক ভাল। সঙ্গলাভে একা তাঁকে পাই ; বিরহে ত্রিভুবনকে তাঁর দ্বারা পূর্ণ দেখি।—কিন্তু এ ভাবে অনুভব কে করে ? প্রেমিকের হৃদয়ই করে।

এখন ভেবে দেখা যাক, আমাদের উপাসনার সাধন বিষয়ে আমরা এই দুই দৃষ্টান্ত হতে কি উপদেশ লাভ করি। পতির দৈহিক সান্নিধ্য হতে বঞ্চিতা নারীদের অবস্থা উপরে চিত্রিত হয়েছে ; মনে হয়, এ বিষয়ে আমাদের অবস্থা যেন ঐ নারীদের অনুরূপ। জড়রাজ্যে বাস করে আমরা আমাদের পরম স্বামীকে অনেই সময়ই ভাল করে অনুভব করতে পারি না।

প্রথমা নারী সারাদিনের মধ্যে একলা থাকতে পায় না। সে তো ভাল কাজই করে ; সেবার কার্য্যেই সারাদিন নিযুক্ত থাকে। কিন্তু পতির সান্নিধ্য অনুভূতির জন্য যেটুকু একলা হওয়া দরকার, তার সুযোগ সে সারাদিনে পায় না। হোক্ না তার সব কাজ অতি ভাল কাজ, কিন্তু যাকে আমি প্রেমের বৈরাগ্য বলছি, প্রেমের isolative activity বলছি, প্রেমের দ্বারা একলা হওয়া বলছি, তা যে তার ভাগ্যে নাই ! রাত্রিতে যদি সে একা হতে পায়, তখন তার মনে পতি-সঙ্গ-অনুভূতি খেদমিশ্রিত হয়ে জাগে। স্বামীকে মনে ক'রে তখন তার কত চোখের জল পড়ে। মনে মনে স্বামীকে ডেকে সে বলে, হায়, তোমাকে হারিয়ে

আমি কি ভাবে দিন যাপন করি, একবার এসে দেখ! জনপূর্ণ কোলাহলময় বাড়ীর মধ্যে যেন তার বনবাস ; রাত্রিতে নিজ কক্ষটি যেন তার তপোবন হয়।

তেমনি, ঈশ্বরের উপাসক যদি সারাদিনের মধ্যে ক্ষণকাল ঈশ্বরকে নিয়ে একা থাকতে অবসর না পান, যদি তাঁর মন পরমেশ্বরের সঙ্গরসে ডুবতে একটুও অবসর না পায়, তবে তিনি সারাদিনে যত ভাল কাজই করুন না কেন, সেই কর্ম্মময় জীবন যেন তাঁর পক্ষে বনবাস। ব্রাহ্মের পক্ষে প্রিয়জনে পূর্ণ সংসার বনবাস, ধর্ম্মবন্ধুগণে পরিপূর্ণ মণ্ডলী বনবাস, নানা সৎকার্য্যে পূর্ণ ব্রাহ্মসমাজ বনবাস যদি না তিনি প্রতিদিন ভাল করে একান্তে সেই পরমস্বামীর কাছে বসতে পারেন। এমন কি, উৎসব-মন্দিরও বনবাস হয়ে ওঠে, যদি সেই প্রেমময় জীবন স্বামীর সঙ্গে একা বসবার ধারাটি সে সময়ে কর্ম্মব্যস্ততা হেতু শুষ্ক হয়ে যায়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে রূপ গোস্বামী রচিত একটি শ্লোকে এই সত্যটি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের মহা সমারোহের মধ্যে কৃষ্ণের কাছে কাছে থেকেও রাধা বড় অতৃপ্ত। তিনি সখীকে বলছেন,

> প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ, সহচরি, কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ,
> তথাহং সা রাধা, তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ;
> তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
> মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।

হে সখি, এই কুরুক্ষেত্রের মহাসমারোহের মধ্যেও তো আমি সে রাধাই, তিনি সেই কৃষ্ণই, আমরা দুজনই মিলিতই আছি এবং এই মিলনের আনন্দও আমাদের মনে রয়েছে। কিন্তু তথাপি আমার মন বার বার সেই কালিন্দীতটের বনকে চাচ্ছে, যার অভ্যন্তরে নিভৃতে তাঁর মধুর বংশীর পঞ্চম ধ্বনি আমি শ্রবণ করতাম।

এই যে পরম স্বামীকে নিয়ে একলা হওয়া, তাঁর প্রেমময় সঙ্গ-

অনুভূতিতে মগ্ন হতে পাওয়া, এর অভাব ঘট্‌লে আমাদের উৎসবও যেন রাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের মত হয়ে পড়ে; শূন্য মনকে শূন্যই রাখে। এই জন্য কত সময়ে নানা সৎকার্য্যের ভিড়ের মধ্যে থেকেও আমাদের 'মনের অবস্থা সেই প্রথমা নারীর মত' হয়; কাজ কর্ম্ম সেরে নির্জ্জনে ঈশ্বরের কাছে বসতে পেলে চোখের জলে ভেসে তাঁকে বলতে হয়, "তোমা হারা হ'য়ে, দেব, এই ভাবে কত দিন রহিব আর, জীবনেশ, সহে না যে আর!"

হে ব্রাহ্ম সাধক, মনে রেখ, মনঃসংযমের বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে সংসার হতে আলগা করা, এবং প্রেমের একাকিত্বের দ্বারা সেই পরম স্বামীকে নিয়ে একলা হওয়া,—ধর্ম্মরাজ্যে এই উভয়বিধ বৈরাগ্যের বড়ই প্রয়োজন।

এখন দ্বিতীয়া নারীর কথা ভাবা যাক। কিসের বলে, কোন সাধনার ফলে, তিনি পতির দূরতার মধ্যেও দূরতা ভুলে যান? এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আমরা দেখতে পাব যে অভ্যাসের নিয়মের মূল্য কত।

প্রেমের ভূমিতে দাঁড়িয়ে যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁর জীবনে ক্রমে চারটি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথম, নিয়মিত উপাসনার তৃপ্তি ও শান্তি। দ্বিতীয়, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে ঈশ্বরের প্রতি চিত্তের নির্ভর। তৃতীয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন। চতুর্থ, ঈশ্বরের সঙ্গে নিরন্তর আলাপ।

দ্বিতীয়া নারীর পতি যখন বিদেশে না গিয়ে গৃহেই থাকেন, তখনও যে তিনি সারাদিনই পতিসঙ্গ লাভ করেন, তা তো নয়। কারণ, পতিকে কর্ম্মস্থলে যেতে হয়; কিন্তু তা হলেও এই নারী প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বামীর নিশ্চিত সঙ্গলাভ করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। এই 'নির্দ্দিষ্ট' ও 'নিশ্চিত' কথা দুটির উপরে মনোযোগ আকর্ষণ করি।

স্বামী যখন আফিসে তখনও পত্নীর মন নিশ্চিন্ত, কারণ নিশ্চিত জানা আছে, দিবারাত্রির মধ্যে অমুক অমুক সময়ে তাঁকে পাব, তাঁর কাছে বসব! এই যে অভ্যাসজনিত নিশ্চিন্ততা, এই যে মনের বিশ্রাম (repose),—সম্বন্ধের জীবনে এর মূল্য অতি গভীর।

হয়তো এই নারী পতির তুলনায় অতি অল্প শিক্ষিতা, হয়তো তিনি স্বামীর বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার কাছে ঘেঁষতেও পারেন না। কিন্তু যদি তাঁর অন্তরে পতির প্রতি প্রেম উজ্জ্বল থাকে এবং যদি তাঁর দৈনিক জীবনে পতির অভ্যস্ত সঙ্গলাভটি বজায় থাকে, তবে অন্তরে ঐ নিশ্চিন্ত ও বিশ্রান্ত ভাবটি, ঐ mental reposeটি উৎপন্ন হবার পক্ষে জ্ঞানের অসামঞ্জস্য হেতু কোন বাধা হয় না।

ঈশ্বর-প্রেমিকের দৈনিক উপাসনা সম্বন্ধে ঠিক এই কথাগুলি খাটে। ঐ নারীর ন্যায়, দৈনিক ঈশ্বর-সঙ্গলাভই ঈশ্বর-প্রেমিকের সারাদিনের জীবনে তাঁর সমুদয় শক্তির বুদ্ধির ও তৃপ্তির উৎস হয়। ঐ নারীর ন্যায় ঈশ্বর প্রেমিকের দৈনিক জীবনের অন্যান্য মুহূর্ত্তগুলিও সরস থাকে; কারণ, অভ্যস্ত সঙ্গলাভের প্রতীক্ষায় সে সময়ও তার অন্তর স্পন্দিত হতে থাকে। এমন কি, যদি দৈনিক নিয়মিত উপাসনাতে মননের পথ দিয়ে তাঁর বিশেষ কিছু লাভ না হয়, তথাপি তিনি বঞ্চিত নন; তথাপি তাঁর উপাসনা অমূল্য। যদি তিনি ভাল করে প্রতিদিন অর্চ্চনা বন্দনা করতে পারেন, তবে তিনি ধন্য, তাঁর সৌভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু যদি তা না পারেন, তথাপি প্রতিদিন নিয়মপূর্ব্বক প্রেমভরে ঈশ্বরের কাছে বসে বসে ঐ নারীর ন্যায় তাঁর জীবনে একটি নিশ্চিন্ত ও বিশ্রান্ত ভাব উৎপন্ন হয়। তাঁর জীবন তৃপ্ত ও শান্ত। তাঁর জীবনের নীরসতম মুহূর্ত্তগুলিও একান্ত নীরস নয়। নিয়মিত উপাসনাজনিত এই নিশ্চিন্ত ও বিশ্রান্ত ভাবটি মানব-প্রকৃতিতে অভ্যাসের নিয়মেব এক অপূর্ব্ব ফল।

প্রেমের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের যে-উপাসনা করা যায়, সুখে দুঃখে ঈশ্বরে নির্ভর তার দ্বিতীয় অঙ্গ। অভ্যাসের নিয়মের দ্বারাই মানুষ নির্ভরশীল হয়। ঐ নারীর সারা জীবনে ছোট বড় কত প্রশ্ন উপস্থিত হয়েছিল; কত অতর্কিত অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল। একটি একটি করে সেই সমুদয় প্রশ্নে ও সে সমুদয় অবস্থায় তিনি স্বামীর হাতে আপনার সমুদয় ভার অর্পণ করে দেখলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর অন্তরে এই অনুভূতি উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে, পতি আমার প্রেমে বাঁধা, তাঁর হাতে আমার জীবনের সমুদয় বিষয় নিরাপদ। প্রেমের সাধকও তেমনি, সারা জীবনে ছোট বড় নানা অতর্কিত অভাবিত ব্যাপারে ঈশ্বরের হাতে আপনার সব ভার অর্পণ করে করে ক্রমে ক্রমে নির্ভরে অভ্যস্ত হন। এই নির্ভরজনিত নিশ্চিন্ততা সমুদয় সংসারভয়কে দূর করে দেয়; পতি নিকটে না থাকলেও এবং তাঁর ব্যবস্থার মর্ম্ম তৎক্ষণাৎ বুঝতে না পারলেও পত্নীর মনকে স্থির রাখে। ঈশ্বর-প্রেমিকের জীবনেও এইরূপে নির্ভরের নিশ্চিন্ত অবস্থাটি অভ্যস্ত হয়ে যায়: 'তোমার ইচ্ছা বুঝলাম না' বলে আর তাঁর মন চঞ্চল হয় না।

প্রেমের ভূমিতে ঈশ্বরের যে উপাসনা হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে ইচ্ছা মিলিত করা তার তৃতীয় অঙ্গ। এ সাধনাতে অভ্যাসের নিয়মের ক্রিয়া আরও গভীর। প্রতিদিন পতিব্রতা পত্নী পতির ইচ্ছার সঙ্গে নিজ ইচ্ছাকে মিলিত করবার অভ্যাসটি সাধন করেন। ছোট খাট সব বিষয়ে ইচ্ছা মিলাতে মিলাতে শেষে এমন হয়ে যায় যে, পতি কাছে না থাকলেও তৎক্ষণাৎ মনে উদয় হয় যে, এ বিষয়ে তিনি কি পছন্দ করবেন। প্রশ্ন করা ও তার উত্তর পাওয়া, এ উভয়ের মধ্যে যে-কালক্ষেপটুকু, যে-অপেক্ষাটুকু ঘটবার কথা, প্রেমের এই অপূর্ব্ব সাধনার ফলে তা যেন লুপ্ত হয়ে যায়; প্রেমিকের চিত্তে যেন তড়িদ্বেগে প্রেমাস্পদের ইচ্ছাটি স্ফুরিত হয়।

এমনি করেই মানুষ পরলোকগত আত্মাকে প্রশ্ন ক'রে ক'রে সংসারে চলবার শক্তি লাভ করে। শুধু পতিব্রতা পত্নিগণেরই কি ইহা সাধনীয়? তা নয়। এমনি করেই পত্নীব্রত স্বামী সাধু প্রকাশচন্দ্র পরলোকগত পত্নী-আত্মাকে প্রশ্ন করে উত্তর লাভ করতেন।

এমনি করেই ভক্তগণ ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করেন। ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ কি হঠাৎ কিছু শোনার মত? তা নয়। জীবনে কোন কোন সময়ে অতর্কিত ভাবে ঈশ্বরবাণী আসতে পারে না, আমি তা বলি না। কিন্তু তা তো সাধনার বিষয় হতে পারে না; তা তাঁর কৃপার আকস্মিক স্ফুরণ, তার উপরে কোন দাবী নাই। কিন্তু হে সাধক, তুমি কি জীবনে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণের সাধন করতে চাও? তবে দৈনিক উপাসনার সময়ে জীবনের সর্ব্ব বিষয়ে সেই পরম স্বামীকে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে চলবার অভ্যাসটি গঠন কর। এ বিষয়েও ঐ একই নিয়ম,— অভ্যাস, অভ্যাস, অভ্যাস! ইচ্ছা মিলাবার অভ্যাসের ফলেই সহজে নিরন্তর ব্রহ্ম-ইচ্ছা জানবার ও সেই ইচ্ছায় চলবার শক্তিটি মানব-অন্তরে আসে।

প্রেমের ভূমিতে ঈশ্বরের যে-উপাসনা হয়, তার চতুর্থ ও সর্ব্বাপেক্ষা অমৃতময় ফল, ঈশ্বরের সঙ্গে সাধকের অফুরন্ত আলাপ। প্রেমের স্বভাবই এই যে, সে প্রেমাস্পদের সঙ্গে একত্র হয়ে জীবনের সমুদয় কাজ করতে চায়; কখনও তাঁর সঙ্গছাড়া হতে চায় না। এই জন্য দেখা যায়, যেখানে সংসারে দুই জন মানুষের মধ্যে প্রেম আছে, সেখানেই তাদের পরস্পরকে বলবার অনেক কথা জমে। দুই বন্ধু একত্র হয়ে বেড়াতে গেলে যা কিছু সুন্দর দ্রষ্টব্য বস্তু সম্মুখে পড়ে, তা দেখে আপনা-আপনি তাঁরা পরস্পরকে বলে ওঠেন, "দেখ ভাই, কি চমৎকার!" এটুকু না বললে কি সৌন্দর্য্যের দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়? অসম্পূর্ণই থাকে বটে!

এটুকু বলাতে সংসারের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বটে! কিন্তু প্রেমের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কারণ প্রেমের প্রয়োজন, নিরন্তর সঙ্গদান ও সঙ্গ আস্বাদন। দুই প্রেমিক পরস্পরকে নিরন্তর নানা কথা ব'লে ব'লে, জীবনের সব মুহূর্ত্ত,—সব দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ স্বাদ স্পর্শ,—সব চিন্তা আকাঙ্খা আনন্দ,—যেন পরস্পরের সঙ্গচর্চ্চায় পরিণত করে ফেলেন। প্রেমজীবনের এ অপূর্ব্ব পরিণতিও অভ্যাসের ফল।

যেমন দুটি মানুষে, তেমনি জীবাত্মা ও পরমাত্মায়। ভক্তের পরিণত জীবনে উপাসনা আর উপাসনার ঘরে আবদ্ধ থাকে না। তিনি চান, প্রিয় পরমেশ্বরের সঙ্গে অফুরন্ত আলাপ। এ অমৃতময় বস্তু লাভের জন্যও তাঁকে অভ্যাসের পথ দিয়েই চলতে হয়। তাঁর মন হতে, কখনও বা তাঁর মুখ হতে, নিরন্তর নানা নিবেদন ঈশ্বরের দিকে নিঃসৃত হতে থাকে। জগৎ শোভা দেখে তিনি বলেন, "আহা, কি চমৎকার করেছ! আহা, আমায় আজ কি মুগ্ধ করলে!" দিবসের প্রারম্ভে অতর্কিত ঘটনা অনেক ঘটতে থাকলে বলেন, "আজ আমায় তুমি এ কি করছ? আজ আমাকে দিয়ে অনেক কাজ করাবে বুঝি? নির্জ্জনে বসার আশা পূর্ণ হল না দেখে বলেন, "আজ বুঝি তুমি আমাকে অনেক ভাই বোনের মধ্যে রাখবে?"

এ আমার কল্পনা নয়। ব্রাহ্মসমাজেই আমরা এমন ভক্ত মানুষ দেখেছি, যাঁদের উপাসনা এমনি করে জীবনের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁদের অফুরন্ত আলাপ চলত, যাঁদের সম্বন্ধে গীতার বাক্য "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ মত্যন্তসুখ মশ্নুতে" সত্য হয়ে গিয়েছিল। এরূপ মানুষ দেখে আমরাও আশান্বিত হই।

১০ই মার্চ্চ, ১৯৩৫